কালপরিক্রমা

শশাঙ্কমোহন চৌধুরী

১৪৫বি, সাউথ সিঁথি রোড, কলিকাতা-

প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র, ১৩৬৩
প্রকাশক : গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ন্যাশনাল পাবলিশার্স
১৪৫বি, সাউথ সিঁথি রোড
কলিকাতা—২
মুদ্রাকর : শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণীশ্রী প্রেস
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা—৬
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা—শ্রীপূর্ণেন্দু পত্রী
প্রচ্ছদ মুদ্রণ ও ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং লিঃ
বাঁধাই—দত্ত বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০১, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯
বিক্রয় কেন্দ্র : পুথিঘর
২২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

চার টাকা

উৎসর্গ

বাঙ্‌লার ক্ষাত্রশক্তির প্রমূর্ত প্রতীক, সর্বভারতের

চিত্তজয়কারী নির্ভীক সৈনিক সুভাষচন্দ্র বসু

রহস্যাবৃতেষু—

ভূমিকা

এককালে সাংবাদিক ছিলাম। সে অনেক দিনের কথা। আমাদের সাংবাদিক জীবনের বহু অভিজ্ঞতা ছিল স্মৃতিতে সঞ্চিত; এই রচনাটিতে সেইগুলিই প্রকাশ পেয়েছে। আমি ইতিহাস লিখিনি কিংবা লেখবার চেষ্টাও করিনি। যে-সব ব্যক্তির সংস্পর্শে একদিন এসেছি এবং যে-সব ঘটনা আমার চোখের সামনে ঘটে গেছে সে-সবেরই আলেখ্য আমি এঁকে দেখাবার চেষ্টা করেছি। তাই চিত্রগুলি হয়েছে প্রধানত কাহিনীবহুল। এ-যুগের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস হয়তো একদিন লেখা হবে, হয়তো কোন ঐতিহাসিক তখন এগুলির মধ্যে পাবেন কথঞ্চিৎ মাল-মসলা। কিন্তু সাহিত্য-রসপিপাসুর কাছে এগুলির মূল্য হয়তো অন্যরূপ।

একটা কথা এখানে পরিষ্কার করে বলা দরকার যে, এই রচনাটির অধিকাংশই স্মৃতি থেকে নেওয়া, সুতরাং ঘটনার পারম্পর্যে ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, পাঠকের কাছে এ জন্যে আমি গোড়াতেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

রচনাটির গোড়ার দিকের কিছুটা অংশ প্রবোধকুমার সান্যাল সম্পাদিত (অধুনা লুপ্ত) 'পদাতিক' সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বাকি অংশ প্রকাশিত হয়েছিল 'মন্দিরা' মাসিক পত্রিকায়।

তারপর বছর তিনেক কেটে গেছে। আমার পরম স্নেহভাজন গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে ও আনুকূল্যে এই রচনাটি এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হলো।

এই গ্রন্থে শরৎ-সম্বর্ধনা অংশে কিছু কিছু উদ্ধৃতির জন্যে আমি প্রিয় বন্ধু অবিনাশ ঘোষালের কাছে ঋণী।

গ্রন্থকার

১৫ই আগস্ট, ১৯৫৬।

বিপুল বিশ্বে বিচিত্র সৃষ্টির অনন্ত প্রাণশক্তির বিকাশে বিবর্তনের ধারাটি চলেছে অব্যাহত। স্থূল দৃষ্টিতে নয়, সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে যখন জাগতিক সব-কিছুর দিকে তাকাই, তখন উত্থান-পতনের ভিতর দিয়েও এমন একটি সত্যকে প্রত্যক্ষ করি, যা কালপ্রবাহে অগণিত ঘাত-প্রতিঘাতেও ভাস্বর, অপরিম্লান। সে-সত্যটি মানুষের চেতনায় যেমন প্রতিভাত তেমনি প্রচ্ছন্ন জড় প্রকৃতিতে। মানুষ কিন্তু দেখেছে জড়েরও রূপান্তর এই সত্যের আলোকে। সত্য আবিষ্কারের পথে চেতনার যে আরোহ ও অবরোহ তাতে এসে মিশেছে জড়, জড়ে এসেছে চেতনা। এই দু'য়ের একীভূত সত্তায় মাঝে মাঝে তমসা নেমে এলেও সেই তমসা ভেদ করে আবার দেখা দিয়েছে নতুন সম্ভাবনার আলোক।

ইতিহাসের পাতায় যা বাঁধা পড়লো তারও আগে স্মৃতি ও শ্রুতির যুগের দিকে চেয়ে অবাক হই। হাজার হাজার বছর আগে মানুষ যে সমাজ সৃষ্টি করেছিল তাতে দেহ-প্রাণ-মনের বিশালতা অপরিমেয়; তখনকার যুগের আলোক-সম্পাত উত্তরকালের তমসাচ্ছন্ন যুগযুগান্ত উজ্জ্বল করে ধরেছে। এক দিক দিয়ে মানুষ ছোট হয়েছে, সঙ্কীর্ণ হয়েছে; কিন্তু আর এক দিক দিয়ে বেড়ে গেছে তার পরিসর। অধ্যাত্ম-জ্ঞানের সূক্ষ্ম দৃষ্টি পড়েছে নিম্নে স্থূল জড়ের দিকে—সেখানে সৃষ্টি করেছে বিস্ময় জড়বিজ্ঞান। এক দিকে হারিয়েছি যে-সম্পদ, তারই রূপান্তর হয়েছে অন্য দিকে। এই আরোহ ও অবরোহের আবর্তে পৃথিবীর উন্নতি কিন্তু রুদ্ধ হয়নি। হয়তো এমনও দিন আসবে যখন এই দু'য়ের সুষম সংযোগে প্রস্ফুটিত হবে এক নতুন সমাজ যার আভাস এসেছে, কিন্তু হয়নি এখনও বিকাশ।

আমি সেই নবীন সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টিপাত করবার আগে একবার পিছন ফিরে চাই। যেখানে ছিলাম সেখান থেকে বহু দূরের পথ অতিক্রম করে এসেছি। কত দিনের কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা। আমিও তো এই বিশ্বশৃঙ্খলার ব্যতিক্রম নই। আমিও তো এই আরোহ ও অবরোহের আবর্তে পাক খেতে খেতে চলেছি, কিন্তু কোথায়? কার নির্দেশে? যেখানেই হোক, আর আমার সঞ্চয় যত তুচ্ছই হোক, আমি এই বিশ্বের সুষমার একটি ক্ষুদ্র অংশও তো পরিপূরণ করেছি। এমনি আর সব। তুচ্ছাতিতুচ্ছের মধ্যেও গাঁথা হয়ে যাচ্ছে সুসঙ্গতি।

ছিলাম একদিন সাংবাদিক জগতে। সেখান থেকে সরে এসেছি আর এক স্থানে। কিন্তু সেখানকার সঞ্চয় আমার তুচ্ছ হয়নি। যা কুড়িয়ে পেয়েছি তাকে সাজিয়ে রেখেছি অমূল্য সম্পদরূপে। যাঁদের জীবনের ধারা এসে মিশেছিল আমার জীবনের ধারায় তাঁরা আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে গেছেন, হয়তো আবার কোথাও মিলবো কোন্ অতলগর্ভ সমুদ্রে; কিন্তু তার আগে একবার থমকে দাঁড়াই, স্মরণ করি সেই বিগত দিনের বিচিত্র সঙ্গমের কথা।

আমি সাংবাদিক ছিলাম কিছুকাল। কে আমায় টেনে আনলে সংবাদ-জগতে এবং কোন্ সূত্র ধরে এসে পড়লাম সেখানে, তা বলছি।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে এসে বসেছি। পরীক্ষা ভালোই দিয়েছিলাম, তাতে মনে ছিল আনন্দ আর হাতে প্রচুর সময়। এমন সময় এসে পড়লো আমার ছেলেবেলার অন্তরঙ্গ বন্ধু হাবু (পোষাকি নাম অমরেন্দ্রনাথ বসু)। আমাদের গ্রামে তার মামার বাড়ি। ইস্কুলে পড়বার সময় লম্বা লম্বা ছুটিগুলো সে কাটাতো মামার বাড়িতে এসে। শহরে তাদের বাড়ি, সেখানে বড় ইংরেজী ইস্কুলে সে পড়তো; আর আমরা ছিলাম গ্রাম্য। সে এলেই মনে হতো যেন সে আমাদের চেয়ে অনেক বড়, অনেক তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা। শহুরে ছেলে হলেই তাকে ইংরেজীনবীশ মনে করে আমরা

সঙ্কুচিত হয়ে যেতাম। তাকে সম্ভ্রম করাটা যেন রীতি হয়ে গিয়েছিল তখনকার কালে। শহুরে ছেলের পক্ষে তাই আমাদের মধ্যে বাহাদুরি করাটা সহজসাধ্য হয়ে গিয়েছিল। হাবুকে এমনি ভাবে দেখলেও কিন্তু আমাদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা হতে বাধা হয়নি এবং ধীরে ধীরে তা গভীর হয়ে উঠেছিল। বয়সে সমান সমান হলেও শহুরে ছেলে বলেই বোধ হয় লেখাপড়ায় সে আমাকে ছাড়িয়ে এক ধাপ উপরে উঠে গিয়েছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর যখন অফুরন্ত অবসর পেয়েছি, সেই সময় এলো সে আমাদের গ্রামে কলেজের ছুটিতে।

তাসের আড্ডা বসতো আমাদের খেলার সাথীদের কারো না কারো বাড়িতে। বেশির ভাগ দিনই সবাই এসে জুটতো আমারই পড়বার ঘরে। হাবুকে দেখতাম বগলে তার একখানা-না-একখানা বই আছেই—হয় রবি ঠাকুরের, নয় অন্য কোন কবির, নয়তো শরৎ চাটুজ্যের। বড় হয়েছি, আগেকার মতো অতখানি সম্ভ্রম তাকে না করলেও তাকে এখন দেখতাম অন্য ভাবে। কলেজে-পড়া হিসেবে আভিজাত্যের কৌলিন্য সে লাভ করলেও দু'দিন বাদে আমিও যে তার কাছাকাছি যাচ্ছি, এই মনে করে কিছু সাহস সঞ্চয় করেছিলাম। তাসের আড্ডা ভেঙে গেলেও সে প্রায়ই রয়ে যেতো আমার ওখানে। 'রামের সুমতি'র রামের কপালে পেয়ারা ঠুকে গোঁয়ারতুমি করার রসটা হয়তো আমরা উপভোগ করতাম উভয়ে অথবা সুর করে সে পড়তো কবিতা :

> "পিঙ্গল্ বিহ্বল্ ব্যথিত নভতল, কইগো কই মেঘ ! উদয় হও,
> সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি মেঘ ! মন্দ্র-মন্থর বচন কও ;
> সূর্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ ! দাওহে কজ্জল, পাড়াও ঘুম,
> বৃষ্টির চুম্বন বিথারি চলে যাও—অঙ্গে হর্ষের পড়ুক ধূম !"

সমস্ত ঘরটিতে যেন কি এক শান্ত অবলেপ ! কবিতার ছন্দ ও সঙ্গীত আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতো কোন্ এক কল্পলোকে—অজানা, অচেনা সে দেশ, তবু মনে হতো পাই যেন সেখানকার এক গন্ধবহ বায়ুর স্পর্শ !

তাসের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গেলো। তার চেয়ে এ-খেলা যে অনেক ভালো—কেমন যেন নেশা লাগে।

তারপর হঠাৎ এক দিন হাবু আমায় শুধু অবাক করলে না, একেবারে মাটিতে বসিয়ে দিলে। তার নিজের লেখা একটা কবিতা পড়ে সে আমায় শোনালে। একটা মাসিক পত্রে তা ছাপা হয়েছিল। সে কি! হাবু কবি এবং তার কবিতা ছাপার অক্ষরে বেরোয়!

কলেজে ঢুকতে যাচ্ছি এই সম্ভাবনায় কিছুটা সমকক্ষতা কল্পনা করে যেটুকু সাহস সঞ্চয় করেছিলাম, তা অতঃপর এই ঘটনার পর একদম উবে গেলো। আমাদেরই মতো হাত-পা-বিশিষ্ট জীব হলেও মনে হতো হাবুকে বুঝি শুধু ভালোবাসলে চলে না, তাকে শ্রদ্ধাও করতে হয়।

আরও বিস্মিত হবার কারণ ছিল। আমাদের তরুণ কবি ইতিমধ্যে একবার কলকাতায় ঢুঁ মেরে কেমন করে জানি সমালোচক অমরেন্দ্রনাথ রায় এবং কবি শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহার সঙ্গে পরিচিত হয়ে এসেছিল। হাবুর সহপাঠীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক আর কবি কালিদাস রায়ের ছাত্র; তাঁদের কাছে ঐ কবিদ্বয়ের কত গল্পই না শুনেছিল হাবু, আমায় যখন শুনাতো সে সব, আমি সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে শুনে যেতাম। মাসিক পত্রের পাতায় যাঁদের নাম দুর্জ্ঞেয় রহস্য বহন করতো তাঁদের দলে হাবুও! নিজের দৈন্যে নিজেই অবনত হয়ে পড়তাম।

কেমন করে জানি ঐ রহস্যলোকে প্রবেশ করবার নেশা আমায় পাগল করে তুললো।

ছন্দোবদ্ধ কথার রাশি কি করে এসে মিলে মিলে একটা পরিপূর্ণ ভাবকে গেঁথে তোলে? আমি ধারণায় আনতে পারি না। আমার কাব্য-জিজ্ঞাসায় নতুন কোন তীর্থপথের পথিকের ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়।

হাবু বলে—ভাবটাই আসল। চিত্তে যদি ভাবের বন্যা আসে তবে তা আপনিই পথ কেটে নেয়। পথ-চলার বেগটাই তার ওঠে ছন্দে দুলে।

সুর করে সে শুনায়—

"ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া,
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।"

অবাক হয়ে শুনি।

হাবু আমায় বলে—বাঁধা ধরা কোন নিয়ম নেই। ভাবকে ছন্দে গাঁথার সময় কান রাখতে হয় সজাগ। তাল কাটে কিনা, বেসুর বাজে কিনা কানে, তাই খেয়াল রাখতে হবে। অর্থাৎ ছন্দের কান তৈরী হওয়া চাই।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি শুনতাম তার কথা। একটা মাদকতা আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতো।

এর পর কোন্ দিন অলক্ষ্যে আমার কাব্য-সাধনা শুরু হয়ে গেলো। নিজেকে একান্তে গুটিয়ে নিয়ে এসে এই রহস্যলোকে প্রবেশ করে বিভোর হয়ে যাই।

হাবু ছাড়া আর এক জন আমার কাব্যের প্রেরণা জুগিয়েছিলেন। অতি সূক্ষ্ম ও কোমল তাঁর চিত্ত ও মনের দলগুলি, বাইরের কল-কোলাহলের ক্ষীণ স্পন্দনেও সেগুলি নিমীলিত হয় লজ্জাবতী লতার ন্যায়; তাই তাঁকে রেখেছি আমার কাব্যলোকেই আড়াল করে। হাবু দিয়েছিল বীজ আর ইনি করেছিলেন তাকে অঙ্কুরিত প্রাণের রসে, সঞ্জীবিত হৃদয়ের উত্তাপে।

কলেজে ঢুকে হাবুকে আমার এই দুঃসাহসিক প্রয়াস দেখিয়েছিলাম এক দিন। সে উৎসাহিত করলে। পথের সঙ্গীকে পেয়ে সে উল্লসিত হয়ে উঠলো। দু'জনের নিবিড় অন্তরঙ্গতা হলো এমনি করে।

তারপর অকস্মাৎ একদিন হাবুর উত্তরসাধক কবিরও নাম বেরিয়ে গেলো 'নারায়ণ' মাসিকপত্রে। কাঁচা বয়সের কাচা হৃদয়ের সে আনন্দ প্রকাশ করবার ভাষা আমার নেই। প্রথম ছাপার অক্ষরে নামের মোহে পাগল হয় নি এমন লেখক কেউ আছে কিনা আমার জানা নেই। সেই প্রথম দিনে আমি পৃথিবীর সব-কিছুকে ভালোবেসেছি—আমার উদ্বেল হৃদয়ে সকলকে

করেছি সেদিন আলিঙ্গন। সেদিন যারা ছিল দূরে তারা এসেছে একান্ত কাছে; যারা ছিল শত্রু তারা হয়ে গেছে পরমাত্মীয়; কণ্ঠ যাদের ছিল বিরস, কর্কশ তাদের কথায় সেদিন ধ্বনিত হয়েছে সুমধুর সঙ্গীত। হৃদয়ের নিভৃত কন্দরের এই অভূতপূর্ব অনাবিল অনুভূতিতে ছিল যেন কোন্ অপরিজ্ঞেয় দিব্যস্পর্শ!

অতঃপর কল্পনার জাল বুনতে থাকি। কবি হবার, সাহিত্যিক হবার দুর্দমনীয় আশা আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে। আশা ছিল অনেক কিন্তু ভেসে গেলাম অন্যত্র। জীবনের পথে অনেক দূর এগিয়ে এসে পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় নিজেকে বিচার করে দেখি আমি না-ঘরকা না-ঘাটকা। তবু এক দিন যে-সাধনায় আমার লাভ হয়েছিল কিছুটা, তাই সম্বল নিয়ে আমি লাভ করলাম সংবাদ-জগতে প্রবেশাধিকার। এই অধিকার লাভের সুযোগ আমাকে দিয়েছিলেন বোমার যুগের বিখ্যাত বিপ্লবী, শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মহলে উপেন্দ্রনাথ ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয়, তাঁর প্রভূত খ্যাতি ছিল ক্ষুরধার বুদ্ধি ও সূক্ষ্মরসের। তাঁর হৃদয়ের মাধুর্য ছিল এমনি চুম্বক-ধর্মী যে, তা সহজেই অপরকে আকর্ষণ করে কাছে টেনে আনতো। স্বল্প পরিচয়েই তিনি হয়ে উঠতেন পরম আত্মীয়। তাঁর স্নেহভাজন সকলের কাছেই তিনি পরিচিত ছিলেন 'উপেনদা' হিসাবে।

উপেনদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় পত্র-পথে। সে প্রায় বছর তিরিশ আগেকার কথা। তখন আমি কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। এক দিন হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে একখানা দু'লাইনের চিঠি এলো :—

ভায়া,

তোমার কবিতাটী ফাল্গুনের সংখ্যায় যাচ্ছে। বারীন এখানে নেই। আশা করি ভাল আছ। ইতি, শুভার্থী—

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের লুপ্ত "নারায়ণ" মাসিক পত্রের পুনরাবির্ভাব হয়েছিল বোমার আসামী বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সম্পাদনায়। ১৯২০ অব্দে বোমার আসামীরা যখন মুক্তি পেলেন, তখন দেশবন্ধু তাঁদের স্বাধীন জীবিকার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এই "নারায়ণ" পরিচালনার ভার বারীন্দ্রকুমারকে দিয়ে। এই জন্যে তিনি টাকাও খরচ করেছিলেন প্রচুর। অফিস সাজিয়ে দিয়ে সেখানে পুরা এক বৎসরের কাগজ তিনি মজুত করিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে কাগজ অভাবে যথাসময়ে "নারায়ণ" প্রকাশে বারীন্দ্রকুমারকে কোন অসুবিধা ভোগ না করতে হয়। সে যাই হোক, ইতিপূর্বে নারায়ণে আমার গুটিকয়েক কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। 'নির্বাসিতের আত্মকথা' তখন ঐ পত্রেই ধারাবাহিক বা'র হচ্ছে। কি অসীম আগ্রহ নিয়েই তা পাঠ করতাম। পরের মাসের অংশটুকুর জন্যে কত না ব্যাকুল প্রতীক্ষায় কাটিয়েছি। দিনগুলো যেন সব সুদীর্ঘ হয়ে পীড়া দিতো, মনে হতো মাস শেষ হতে চায় না কেন। কোন মাসে অল্প কয়েকখানা পাতায় কাহিনীর একাংশ প্রকাশিত হলে অতৃপ্তি হতো গভীর—লেখকের কার্পণ্যের জন্য তার প্রতি রুষ্টও হয়েছি মনে মনে। ঐ অপূর্ব কাহিনীর লেখক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং আমাকে চিঠি লিখেছেন! সেদিনকার বিস্ময় ও পুলকের চিত্র দেওয়ার শক্তি আমার নেই। সেদিন ধন্য হয়েছিলাম।

সেদিনকার সে পুলক ও বিস্ময়ের জাত ছিল আলাদা। আমার মনে হয়েছিল এ জাত যেন আমার চেনা। শুধু শৈশব থেকে তারুণ্যে তার রূপান্তর ছাড়া তো আর কিছু নয়। আমাকে ছুটতে হলো তাই আমাদের গ্রামের নদীর ধারে বাঁড়ুজ্যেদের বাঁশবাগানে।

তখনো প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়নি। বয়স তখন আমার বছর দশেক হবে। এক দিন আমাদের গ্রামে এলেন এক কানুনগো এবং তাঁর দলবল। লোক-লস্কর, তাঁবু-তাঁবেদার মিলে সে এক এলাহি ব্যাপার। আমাদের গ্রামটি ছোট হলেও এখানে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না, আর জীবন-যাত্রায়ও ছিল মার্জিত সৌষ্ঠব। আর ছিল আলোচালের চূড়ায় সন্দেশের নৈবেদ্যের মতো একঘর জমিদারও। কাজেই আমাদের

গ্রামটিই হলো কানুনগো মশায়ের কর্মকেন্দ্র, আশ্রয়ও হলো তাঁর জমিদার বাড়িতেই।

বিকাল বেলায় ইস্কুলের ছুটি হয়ে গেলে এক দিন আমার সহপাঠী শিবু এসে বললে—এই লাঠি খেলা দেখতে যাবি ?

কোথায় রে ?

বাঁড়ুজ্যেদের নতুন বাঁশবাগানে।

সে আবার কোথায় ?

—কেন, জানিস্ না ? ঐ যে নদীর ধারে দত্তদের আমবাগানের ওধারটায় শ্মশান, আর এদিকে ঘোষেদের বুড়ো বটগাছ, তার মধ্যিখানে বাঁশবাগান দেখিস নি ?

গেলাম শিবুর সঙ্গে লাঠিখেলা দেখতে। ঘোষেদের বটগাছতলায় বসে বেশ দেখা যায়। আরে, ও যে অশ্বিনীবাবু, সারাদিন মাঠে মাঠে কুলিদের সঙ্গে শিকল টেনে টেনে উনি যে জরিফ করে বেড়ান আর সন্ধ্যাবেলায় এই কাণ্ড! লোকটা বোধ হয় সাত ফুটেরও উপর লম্বা। পুষ্ট, বলিষ্ঠ দেহে বাহু দু'টি আজানুলম্বিত। বুকের ছাতিটা পরিমাপ করা কঠিন। উনিই লাঠি-চালনার শিক্ষক। গুটি কয়েক ছাত্র ইতিমধ্যে তিনি যোগাড় করেছেন—তাদের মধ্যে আছেন আমাদের গ্রামের তারকদা ও উপেনদা, দুইটিই ছাত্র হবার যোগ্য বটে। কতদিন ধরে এই বনাশ্রমে তপস্যাটা চলছিল জানি না, তবে অশ্বিনীবাবুর শিষ্যরা ইতিমধ্যে যেটুকু কসরৎ আয়ত্ত করছিলেন তা দেখবার মতো। শিষ্যদের দলের ছুটি হলো যখন, তখন সূর্য সবে পশ্চিমে ঢলেছে। এইবার ওস্তাদজী তাঁর লাঠি ধরলেন। বাপ রে! সে কি লাঠি-চালনা! লাঠি দেখা যায় না। শুধু একটা বৃত্তের রেখা বন্ বন্ করে মাথার উপরে, বগলের তলায়, দু'পায়ের মাঝ দিয়ে, বুকে পিঠের উপর দিয়ে কি করে বিদ্যুৎ গতিতে যে চলে যায় দেখলে অবাক হতে হয়। অত বড় একটা ভারি লাঠি অশ্বিনীবাবুর কাছে ছিল যেন পাখির পালক !

শিবু বললে—দেখলি তো।

—হুঁ বলে আমি চুপ করে গেলাম। আমাদের মধ্যে আর কোন কথা

হয়নি। হতবাক বিস্ময়ে সে-দিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেছিলাম। তারপর প্রতিদিন ইস্কুলের ছুটির পর আমরা ঘোষেদের বটতলায় আশ্রয় নিয়েছি। লাঠি খেলা দেখবার নেশা আমাদের পাগল করেছিল।

অশ্বিনীবাবু এ অঞ্চলে ছিলেন অনেক দিন। অবাধে তিনি তাঁর এই আখড়াটি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন, তার কারণ এই জমিদার পরিবার। এই জমিদার পরিবারেই বাঘা যতীনের এক ভগ্নীর বিবাহ হয়েছিল। বাঘা যতীন এবং তাঁর ভাই সরোজ মাঝে মাঝে এ বাড়িতে আসতেন। অশ্বিনীবাবুর বোধ হয় সে সব জানা ছিল। তিনি উপরন্তু এই বাড়িরই ছেলে আমাদের বঙ্কিনাথদাকেও তাঁর আখড়ায় ঢুকিয়ে নিয়েছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের কাজ তখন কেমন সূক্ষ্ম ভাবে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে যেতো তার কোন ধারণাই আমাদের বাল্যকালে ছিল না, পরে অশ্বিনীবাবুর এই জরিফতত্ত্ব বুঝতে পেরে তাঁর প্রগাঢ় দেশপ্রীতির জন্যে তাঁকে দূর থেকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানিয়েছি। শুনেছি আমাদের ওখান থেকে যাওয়ার বহু দিন পরে তিনি একজন মারাত্মক বিপ্লবী বলে ধরা পড়েছিলেন।

আমাদের ওখানকার জমিদার বাড়িতে বোধ করি বিবাহ উৎসবে একবার বাঘা যতীনের ভাই সরোজ বাবু উপস্থিত ছিলেন। সুন্দর, সুশ্রী, সুদীর্ঘ, সুঠাম দেহ এই সরোজবাবুর। এমন সুপুরুষ খুব কমই দেখা যায়। তাঁর আয়ত দু'টি সুন্দর চোখ অনেক সুন্দরী নারীর ঈর্ষার উদ্রেক করতো। উৎসবের পরের দিন কাছারী বাড়ির প্রাঙ্গণে সরোজবাবু যখন তাঁর চম্পক অঙ্গুলের মুঠিতে একগাছি সুদীর্ঘ লাঠি নিয়ে দাঁড়ালেন তখন ভাবতেও পারিনি যে, যে-হাত চিত্রশিল্পের জন্যে বিধাতা সৃষ্টি করেছেন তাতে ঐ কঠিন বস্তুটি কি করে ঘুরবে। কিন্তু ঘুরেছিল অবলীলায়। সানাই ও ঢোলের মধুর বাদ্যের সঙ্গে সে দিন যে লাঠিখেলা দেখেছি তা আজও ভুলতে পারিনি। দোতলার ছাদ ও অলিন্দ থেকে সে দিন বহু নারী মূল্যবান শাড়ী, মোহর ও টাকা কেন যে তাঁকে পেলা দিয়েছিলেন সে আজও বুঝতে পারিনি—কারণ তিনি তো পেশাদার লাঠিয়াল ছিলেন না।

তারপর একদিন দেখলাম বাঘা যতীনকে। প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে তখন।

আমারও বয়স কিছু বেড়েছে—অন্তত কিছু বুঝবার বয়স হয়েছে তখন। বাঘা যতীন সম্বন্ধে বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ি থেকে কানাঘুষায় যা কিছু শুনতাম তাতে রোমাঞ্চ হতো। দুপুর বেলা তিনি মধ্যাহ্ন আহারে বসেছিলেন —ভাঙা ঠ্যাংটি আসন থেকে ছড়ানো এবং একটু উঁচু করে রাখা। হাস্য পরিহাসে বেশ জমিয়ে আহার্য শেষ করে তিনি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করেন নি। হঠাৎ বলে উঠলেন—আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে, বিশেষ কাজ।

একখানা সাইকেল হাতে করে তিনি বাইরে বেরিয়ে এলেন। কাছেই আমার এক ছোট জেঠতুতো ভাই দাঁড়িয়েছিল, তাকে বললেন—খোকা, ভাঙবেড়ের ঘাটটা আমাকে দেখিয়ে দিতে পারো? সেখানে পার হতে হবে। চলো তোমাকে সাইকেলে চড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

সাইকেল চড়ার লোভে ভায়া আমার তাঁকে পারঘাটা দেখিয়ে দিয়ে এসেছিল।

এই ঘটনার দু'ঘণ্টা বাদে পুলিশ দারোগা তাঁর খোঁজে এসেছিলেন এই জমিদার বাড়িতে কিন্তু তাঁদের ব্যর্থ হতে হলো, কারণ পাখি উড়ে গেছে ততক্ষণ, কোথায় কে জানে। ঐ ভাঙা পা নিয়ে শুনেছি ঘণ্টায় ৪০ মাইল বেগে তিনি সাইকেল চালিয়ে যেতে পারতেন। সহজে বিশ্বাস হয় না, তবে বাঘা যতীনের অসাধ্য কিছুই ছিল না।

অতঃপর বাঘা যতীনের দুঃসাহসিকতার অনেক গল্প শুনা গেছে জমিদার বাড়ির উপেনবাবুর মুখে। তিনি সোৎসাহে এই সব গল্প যখন শুনাতেন তখন মনে হতো উপেনবাবু যেন চাক্ষুষ বাঘা যতীনের এই সব কাণ্ডকারখানা প্রত্যক্ষ করে এসেছেন। উপেনবাবু মানে উপেন চাটুজ্যে ছিলেন জমিদার বাড়ির নায়েব বলতে নায়েব আর ম্যানেজার বলতে ম্যানেজার। কালো যমদূতের মতো চেহারা। দেখতে খর্বাকার হলেও তাঁর পেশীবহুল, লোমশ দেহটা দশজনের বল ধরতো। নেশা তিনি করতেন না তবু ভাঁটার মত গোল বড় বড় দু'টি চোখ তাঁর সব সময় থাকতো রক্তজবার মতো লাল হয়ে। তাঁর কর্কশ কণ্ঠের আওয়াজ ছিল ত্রাস-সঞ্চারী।

প্রজাশাসন ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। বাঘ ও গরুকে এক ঘাটে তিনি জল খাওয়াতে পারতেন, এটা শুধু বিশ্বাস করতাম না, চোখেও দেখেছি। আর একটা সুবিধা ছিল তাঁর ; তিনি জমিদারবংশের আত্মীয়। ঘোরতর একটা গর্হিত কাজ করে ফেললেও তাঁর ছিল সাতখুন মাফ, কেন না তাঁর দেহের বলে মানসিক বলের জোগান দিত জমিদারের ঐশ্বর্য।

বাংলাদেশের জমিদারদের বীরত্ব নামক প্রজাপীড়নের কাহিনী অনেক শুনেছি। এই ক্ষুদে জমিদার পরিবারে উপেন চাটুজ্যের বীরত্ব থেকে তার কিছু নমুনা পেতাম। ভীত, বেদনাতুর লোকেরা অনুচ্চকণ্ঠে "কালো বামুন আর কটা শূদ্দুর"-এর প্রবাদ বাক্যটা শুনিয়ে দিয়ে ব্যথার কথঞ্চিৎ লাঘব করতো। এ হেন দুর্ধর্ষ ব্যক্তির দুর্নামের পিছনেও সুনাম ছিল। গ্রামের প্রবীণরা বলতেন—উপেনবাবু আছেন তাই গ্রামে শান্তি আছে। তা ঠিক, দুষ্টপ্রকৃতির লোকেরা তাঁর কাছে ঢিট্ হয়ে থাকতো।

বাঁড়ুজ্যেদের বাড়ির সড়কের রাস্তাটা যেখানটায় এসে সর্বসাধারণের চলার পথে মিশেছিল, ঠিক সেখানটায় ছিল আমাদের দুগ্‌গো মাস্টারের বাড়ি। ঐখানে হতো নিত্য প্রবীণদের জটলা বিকেলের দিকে। বড় হয়ে আমরা ঐ বৈকালিক আড্ডার নাম দিয়েছিলাম 'পার্লামেণ্ট'। এই পার্লামেণ্টে উপেনবাবুর উপস্থিতি হলে সেদিনকার আসর হতো সরগরম। পালাটা সেদিন তাঁরই, আর সকলে সেদিন হয়ে যেতো নিষ্প্রভ। তাঁর উচ্চকণ্ঠের অনর্গলতার সঙ্গে নিরন্তর বাহু সঞ্চালনের দৃশ্যটা হতো পরম উপভোগ্য। ভয়ে আমরা কাছে যেতে সাহস করতাম না বটে, তবু বিস্মিত, ব্যাকুলচিত্তে আড়ালে ওঁত পেতে থাকতাম তাঁর কাহিনী শুনবার জন্যে। বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী বর্ণনায় তিনি রস পেতেন বেশি, তাঁর তখনকার চেহারা দেখলে মনে হতো এঁকে ভয় করে লোকে দূরে সরে যায় কেন, শ্রদ্ধা করে এঁর কাছেও বুঝি বা আসা চলে। এই উপেনবাবুর মুখেই শুনা দু'টি গল্প আমাকে বিশেষ করে বিস্ময়-বিহ্বল করেছিল। গল্প

হ্'টি এই : এক দিন সন্ধ্যাবেলা বাঘা যতীন ফিরছিলেন শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেণ ধরবার জন্যে। আমহার্ষ্ট স্ট্রীট ও মির্জাপুর স্ট্রীটের মোড়ে একটা মুসলমানের বিড়ির দোকানে গান শুনে সেখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যান। মিষ্টি মধুর স্বরে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

দোকানের ভিতর থেকে এক জন বলে উঠলো—আইয়ে বাবুজি ! অন্দর আ যাইয়ে।

বাঘা যতীনের হাতে ছিল একটি চামড়ার ব্যাগ। তাতে ছিল বহু টাকা মূল্যের অলঙ্কার। এ সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গীতরসপিপাসু চিত্তে কোন ভয়ের সঞ্চার হয়নি। তিনি দোকানের ভিতর প্রবেশ করে গান শুনছিলেন। কিছুক্ষণ বাদেই তিনি হঠাৎ আক্রান্ত হন। বুঝতে পারলেন গুণ্ডাদের হাতে তিনি পড়েছেন। তিনি একক ছয় সাত জন গুণ্ডার সঙ্গে লড়াই করে তাদের সকলের রক্তাক্ত দেহ ধরাশায়ী করে রেখে অলঙ্কারের ব্যাগটি হাতে নিয়ে অক্ষত দেহে ট্রেনে উঠেছিলেন।

দুই নম্বর কাহিনী। বাঘা যতীন একবার ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর কামরায় ভ্রমণ করছিলেন। সেই কামরায় ছিলেন তিন জন সাহেব। তাঁদের কামরায় এক জন নেটিভের এ ভাবে যাওয়ার ঔদ্ধত্য তাঁরা বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। বচসা শুরু হলো, ক্রমে তা রূপান্তরিত হলো মারামারিতে -- এমন প্রচণ্ড মারামারি তিন জন বলিষ্ঠ সাহেবের সঙ্গে এক জন বাঙালীর; তাও আবার বদ্ধ কামরার মধ্যে, কিরূপ দুঃসাধ্য তা ভাবতেও ভয় করে। কিন্তু বাঘা যতীনের মনে ভয় বলে নাকি কোন বস্তু ছিল না। তিনি তিন জনের এক জনকে পেটে লাথি মেরে অজ্ঞান করেছিলেন, আর এক জনের নাকে ঘুঁষি মেরে তার নাসারন্ধ্র থেকে রক্ত ঝরিয়েছিলেন; বাকি সাহেব পুঙ্গবটির ছিল এক জোড়া বড় গোঁফ, সেই গোঁফের একাংশ মাংস সমেত উপ্‌ড়ে নিয়েছিলেন। উপেনবাবু বলতেন বাঘা যতীন ঐ গোঁফ পকেটে করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তা রেখে দিয়েছিলেন যত্ন করে একটি কাঁচের শিশিতে তাঁর স্মৃতিকে সঞ্জীবিত রাখবার জন্যে। সেই অমূল্য বস্তুটি আজও লালবাগে আছে কিনা তা বলতে পারি না।

উপেনদার কথা বলতে গিয়ে এতখানি অবান্তর প্রসঙ্গ কেন এলো তার হেতু আছে, তার আভাস আগেই দিয়েছি। অশ্বিনীবাবুর ঐ আখড়া থেকেই 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি শুনেছি, সেই সময়েই হাতে রাখীবন্ধন পড়েছে, বিদেশী বর্জনের সঙ্গে দেশের মাটির মায়ার টান অনুভব করেছি। অশ্বিনী-বাবু, সরোজবাবু ও বাঘা যতীন ধীরে ধীরে আমার আত্মাকে অধিকার করে আমার কল্পনায় এক অপরূপ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে, বিপ্লব কি, বিপ্লবীদের জীবনযাত্রা কেমন, তা জানবার আগ্রহ আমাকে আকুল করেছে। ওপথে যাবার শক্তি বা সাহস আমি সঞ্চয় করতে পারিনি, তবু ঐ পথের পথিকদের প্রতি আমার আত্মিক টান এত প্রবল ছিল যে, অনেক সময় আমি নিজেকে কল্পিত বিপ্লবীর আসনে বসিয়ে একটা অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভ করতাম। আমি কর্মী নই অথচ কর্মের কল্পনা আমার ভিতরে কি এক উন্মাদনা সৃষ্টি করতো। বন্দুক কখনো হাতে ধরিনি, তবু মনে হতো বন্দুক-হাতে বেরিয়ে পড়ে সুচতুর কোন গুপ্তচরের চোখে ধুলো দিয়ে অসংখ্য বাধাসঙ্কুল পথ পেরিয়ে যেতে পারতাম যদি কোন এক রহস্যময় বিপ্লবীদের আখড়ায়! কল্পনায় অনেক সময় পুলিশের হাতে ধরাও দিয়েছি—দিয়ে নিজেকে দেশপ্রেমিক ভেবে গর্বও বোধ করেছি।

কল্পনা ও বাস্তবে পূর্ণ যোগাযোগ না থাকলেও আমার জীবনে বিপ্লবীদের কর্মস্রোত তটে এসে আঘাত করে গেছে। তাতে হয়েছে আমার মানসিক সমৃদ্ধি। বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ও বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসার সুবিধা তাই যেদিন হলো, সেদিনকার উল্লাস ভাষায় ব্যক্ত করবার নয়। মনে হয়েছে এঁরা আমার আত্মার আত্মীয়।

উপেনদার প্রথম চিঠি পেয়ে অন্তর উল্লাসে যে উদ্বেল হয়ে উঠলো তার কারণ খুঁজতে তাই আমাকে যেতে হলো—দূর এক গ্রামে অশ্বিনীবাবুর বাঁশবনের আখড়ায়।

কবিতা ছাপার সংবাদটি সেদিন আমার কাছে তুচ্ছ। আমার সেদিনকার গৌরব ছিল বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ যে কাগজের লেখক সেই কাগজে আমারও একটু লেখা আছে। এই লেখার যোগাযোগে মানুষ

উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে এক দিন আমার যোগাযোগ হবে—এই কল্পনা আমাকে তখন অভিভূত করেছিল। তখন থেকে আমার মনে উপেন্দ্রনাথের ছবি আঁকা শুরু হলো। এই ছবি এক দিন জীবন্ত হয়ে আমার সম্মুখে দেখা দেবে—কবে কোন্ দিন ?—আমি শুধু তারই প্রতীক্ষায় রইলাম।

বি-এ পরীক্ষা দিয়ে আমাদের ছোট্ট গ্রামে গিয়ে ফলাফলের অপেক্ষায় আছি। ইতিমধ্যে বারীন ঘোষ ও উপেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চিঠির মারফৎ ঘন হয়ে উঠেছে। এঁদের সঙ্গে তখনো আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি, তবু মনে হতো এঁরা যেন আমার একান্ত আপন। এঁদের কীর্তিকলাপের কথাও কিছু কিছু পড়ে ফেলেছিলাম। এঁরা যে-রাজ্যের লোক সে-রাজ্য আমার সম্পূর্ণ অজানা থাকলেও তা আমার মনে রূপকথার জাল বুনতো। সে-রাজ্যের আনাচে কানাচে সঙ্গোপনে ঘুরে বেড়াবার অধিকার কি আমার নেই ? কিন্তু এঁদের সে অভিযান তো শেষ হয়ে গেছে ! নতুন কর্মক্ষেত্রে আবার কোন্ নতুন পর্ব শুরু হবে ? তার একটু স্পর্শ, একটু গন্ধ কি আমি পাবো না ? আমার সৃষ্ট কল্পনার মদির আবেশে আমার চিত্ত তখন মাতাল হয়ে উঠেছে !

গরীবের ছেলে। যে-টুকু বিদ্যাভ্যাস করেছি, সে তো অর্থকরী। ততঃ কিম্ ? বারীন ঘোষের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'বিজলী'ও তখন বা'র হতো। তাতেও কালোপযোগী গরম গরম গুটিকয়েক কবিতা লিখে ফেলেছিলাম। সেইটুকু সম্বল নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পাড়ি দেবো কেমন করে ? কিন্তু সে চিন্তা আমাকে তখন আকুল করতে পারেনি। ভাবতাম ঐ সব অসাধারণ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসবার সুবিধা যখন আমার হয়েছে তখন একটা কিছু হিল্লে আমার হয়ে যাবে। যা হোক করে তাঁদের সঙ্গে জড়িত হয়ে যাবার আগ্রহই তখন আমার মধ্যে প্রবল। এমন সময় একদিন উপেনদার চিঠি এলো :

১২, রামরতন বসু লেন,
শ্যামবাজার,
১৯-৫-২৩

স্নেহাস্পদেষু,

বারীন ১১নং রায় স্ট্রীট, ভবানীপুর এই ঠিকানায় থাকে।

তুমি এখানে এলে অতি অবশ্য আমার সঙ্গে আত্মশক্তি অফিসে দেখা করবে। (৯৩।১এ, বৌবাজার স্ট্রীট)।

আত্মশক্তির জন্যে কবিতা বা article পাঠিয়ো। তোমার ঠিকানায় কাগজ পাঠাতে বলে দেবো। বোধ হয় শীঘ্রই একবার Bombay যাবো। এ মাসের শেষাশেষি ফিরবো। সেই সময় দেখা হবে। ইতি

শুভার্থী—উপেনদা

ছাড়পত্র পাওয়া গেলো। এইবার চাক্ষুষ পরিচয়ের পথ প্রশস্ত। সংসার-যাত্রার কঠিন দায়িত্ব তখন ধীরে ধীরে চিত্তে আলোড়ন আনছে অথচ মনোরাজ্যের মণিকোঠায় চাকচিক্যও আমাকে বিহ্বল করে দিচ্ছে। এই সময়ই ডি, এল, রায়ের একটা কবিতার প্যারডি লিখেছিলাম—"প্রথম যখন বি, এ, হলাম ভাবলাম বাহা বাহারে।" উপেনদা তাঁর 'আত্মশক্তি'তে এই কবিতাটি প্রকাশ করেছিলেন।

তারপর সত্যই একদিন বৌবাজার স্ট্রীটের চেরী প্রেসে সশরীরে হাজির হলাম। আত্মশক্তি ঐখান থেকেই প্রকাশিত হতো।

অনেক ক্ষণ বসে আছি। অফিসের লোকেরা বললে, সম্পাদকের আসতে একটু দেরি হবে। প্রায় দুপুরের দিকে একটি বলিষ্ঠ, বেঁটে লোক ঘরে প্রবেশ করলেন। সৌম্যকান্তি, হাতে কয়েকখানা কাগজ। এই ব্যক্তিই কি উপেনদা? তাঁর দিকে চেয়ে সাহস সঞ্চয় করে বললাম—উপেনদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

কে উপেনদা? আপনার নাম?

উপেন বাঁড়ুজ্যেকে চাই। আমার নাম শশাঙ্ক—

বাকিটা শেষ না হতেই তিনি এমন একটা মুখভঙ্গি করলেন যে, তার তুলনা হয় না.।

আজ্ঞে, আমারই নাম উপেন বাঁড়ুজ্যে। বসো বসো ভায়া,—আরে ! বলেই তিনি আমার দিকে সহাস্য মুখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। বিস্ময় তাতে কিছু ছিল, কিন্তু তার চেয়েও যা আমাকে চিরদিনের জন্যে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে রেখেছিল তা হচ্ছে তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ-প্রীতির অনাবিল নির্ঝর। অমন মুহূর্তে-আপন-করা হাসি আর কোথাও দেখিনি। আমি বাঁধা পড়লাম তাঁর স্নেহে।

অতঃপর শুরু হলো আমার মক্ষিকাবৃত্তি ! মেসের ভাত খেয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি বাইরের রাজ্যে। জীবিকার সমস্যা ক্রমেই কঠিন হতে কঠিনতর হয়ে উঠতে লাগলো। অর্থ কোথায় ? কোন্ পথে গেলে তার সন্ধান মিলবে সে চিন্তা তবু আমাকে তখন আকুল করতে পারেনি। বাইরের জগৎ বলতে তখন আমি কেবল 'চেরী প্রেস' বুঝতাম। ওরি ভিতরে গিয়ে গুন্ গুন্ করে ফিরতাম। 'বিজলী' 'আত্মশক্তি' 'বৈকালী' সব কাগজেরই জন্মস্থান ছিল ঐখানে। বারীন ঘোষ, উপেন বাঁড়ুজ্যে, নলিনীকান্ত সরকার, শচীন সেনগুপ্ত--এঁরা ছিলেন লেখক। আমার মধুলোভী মন কেবলই ঐখানে আমাকে টেনে নিয়ে যেতো। সে অপূর্ব দিনগুলির স্মৃতি ভুলবার নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে সে দিনগুলি ছিল মূল্যহীন কিন্তু মানসক্ষেত্রে সে দিনগুলি ফুটাতো অগণিত ফুল—বেল-গোলাপ-গন্ধরাজ-রজনীগন্ধা। দূর স্মৃতির দূরাগত সুবাসে আজও আমার চিত্তলোকে চাঞ্চল্য আসে।

আত্মশক্তি অফিসে একদিন দেখলাম আসবাবপত্র সব সরে গেছে অন্যত্র, শুধু এক কোণে উপেনদার টেবিলটা আর তার পাশে একটা ছোট্ট তক্তপোষ পড়ে আছে। মেঝেতে মাদুর বিছানো। শুনলাম সেখানে স্বরাজ পার্টির সভা হবে সেদিন। সি, আর, দাশ আসছেন। ঐ সভাতেই স্বরাজীদের কর্মপদ্ধতি স্থির হবে। সি, আর, দাশ ! এর আগে আর কখনো তো তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমার ভাগ্য কি সুপ্রসন্ন। অধীর প্রতীক্ষায় তাঁর পথ চেয়ে রইলাম।

উপেনদা বললেন—কি রে, দাশ মশায়কে দেখবি বুঝি? সে প্রশ্নের জবাব দিলাম শুধু হেসে।

মনে মনে বললাম—দেখবো না? বোমা-বারুদের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে প্রচণ্ড এক রাজশক্তিকে উড়িয়ে দিবার স্বপ্ন যে-সব বাঙালী যুবককে এককালে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল, যাঁদের চরম নিগ্রহ হয়েছিল ইংরেজের কাছে সি, আর, দাশ দাঁড়িয়েছিলেন তাঁদেরই পাশে। তারপর এক যুগ কেটে গেছে। সঙ্কীর্ণ দেশাত্মবোধের মধ্যে যে চেতনা সংক্ষুব্ধ হয়ে ব্যর্থ হলো তা-ই আবার বৃহত্তর, ব্যাপকতর চেতনায় এসে ভারতের মুক্তির পথ খুঁজলো অসহযোগ আন্দোলনে। এর নায়ক গান্ধীজী আশ্বাস দিলেন তাঁর নির্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা অনুসৃত হলে এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ!

কিন্তু এক-দুই করে দেখতে দেখতে বছর তিনেক কেটে গেলো তথাপি স্বরাজের নাম-গন্ধ নেই! আপামর সাধারণের মনে যে উৎসাহ, উদ্দীপনা এসেছিল তা স্তিমিত হয়ে এলো, ক্রমে দেখা দিল নৈরাশ্য ও অসাড়তা। সি, আর, দাশ শঙ্কিত হলেন। তিনি দেখলেন এই আন্দোলনের ধারাকে উজানে বইয়ে দিতে না পারলে দেশের কর্ম্মশক্তি রুদ্ধ হয়ে যাবে; তাই তিনি দাঁড়ালেন গান্ধীজীর বিরুদ্ধে সোজা হয়ে তাঁর নতুন মতবাদ নিয়ে।

দেখবো না তাঁকে?

ক্রমে দলের লোকের ভিড় জমতে লাগলো। দলের মধ্য থেকে হঠাৎ এক সময় চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম! সবার দৃষ্টি পড়েছে দরজার দিকে। দেখি দু'টি যুবক প্রবেশ করছেন—একজন অপূর্ব গৌরকান্তি। সুভাষবাবু, সুভাষবাবু বলে কয়েকজন আনন্দধ্বনি করে উঠলো। সুভাষবাবুর সঙ্গী যিনি ছিলেন তিনি খ্যাতনামা কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ধীর, স্থির সুভাষকে সেদিন সুহাসও দেখেছিলাম। এমন শান্তপ্রকৃতির মধ্যে ঝড়ের উদ্দাম বেগ কোথায় ছিল জানি না, কিন্তু লক্ষ্য করেছি সমবেত ব্যক্তিদের মধ্যে যেন তিনি প্রাণসঞ্চার করলেন ঝড়েরই বেগে।

সুভাষবাবুর কিন্তু অন্যদিকে লক্ষ্য ছিল না। তিনি সরাসরি এলেন

উপেনদার কাছে। হাস্যরসের অবতারণার মধ্যে উপেনদা মিনিট কয়েকের মধ্যে এমন আসর জমিয়ে তুললেন যে, সেটা একটা রাজনৈতিক সভা এমন মনে করে কার বাপের সাধ্যি। সুভাষবাবু একটু আড়ষ্ট, লজ্জিত হয়ে উঠছেন, এমন সভার আসরে গাম্ভীর্য রক্ষা করা উপেন বাঁড়ুজ্যে থাকতে সহজ নয়। যা হোক দাশ মশায়—সি, আর, দাশ—এলেন সর্বশেষে। খদ্দরের ধুতি পরে এবং খদ্দরের একটা চীনা কোট গায়ে দিয়ে ঈষৎ কৃষ্ণকায় ব্যক্তিটি এসেই মেঝের উপরে বিছানো মাদুরে বসে পড়লেন। এই সি—আর—দাশ! আলিপুর বোমার মামলার বিশ্ববিখ্যাত ব্যারিষ্টার, বিত্তশালী চরমভোগীর এ কি পরমত্যাগের বেশ! শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে গেল।

কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গিয়েছিল। দাশ মশায় আসবার আগে আমি উপেনদার টেবিলটির পাশে ছোট্ট এক তক্তপোষের উপর বসে ছিলাম। ঐ সভায় সেদিন খদ্দরের লাল শাড়ী পরিহিতা একটি মহিলাও এসেছিলেন। তিনি টেবিলের উপর থেকে উপেনদার 'নির্বাসিতের আত্মকথা' বইখানি তুলে নিয়ে বললেন--এটা বুঝি আপনার লেখা উপেন বাবু? বইখানা আমার বেশ লাগে।

—আজ্ঞে, অধমেরই বটে। বলেই উপেনদা কিন্তু অত্যন্ত চকিত ও সজাগ দৃষ্টি তাঁর দিকে দিয়ে রাখলেন। মহিলাটি অতঃপর আর এক ব্যক্তির সঙ্গে কি যেন কথাবার্তা বলবার সময় বইখানি হাত থেকে যেমনি টেবিলের উপর নামিয়ে রেখেছেন, উপেনদা যেন চিলের মতো ছোঁ মেরে সেখানি তুলে নিয়ে একেবারে সটান তাঁর টানার মধ্যে পুরে ফেলে টুপ্ করে তাতে চাবি মেরে দিলেন!

আমি তাঁর ব্যস্ততা ও এই অশোভনতা লক্ষ্য করেছিলাম।

—ব্যাপারটা কি?—জিজ্ঞেস করলাম উপেনদাকে একটু বিস্মিত হয়ে।

—ব্যাপার আবার কি, বুঝ্তে পারছো না? বইখানি উনি গেঁড়া দিতে চান। তাই চাবি মারলাম টানায়। এখন লাও।

আহা! ভদ্রমহিলা আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছিলেন।

—বিনি পয়সায় শ্রদ্ধা-ট্রদ্ধা বুঝিনা, বাবা। ভদ্রমহিলা বইখানা কোনদিন

পড়েছেন বলে তোমার মনে হয়? হয়তো কোথাও নাম শুনে থাকবেন। আর, দিলেও পড়বেন না, শুধু ঘর সাজাবেন।

উপেনদা তাঁর বিশ্বাসে অটল। বললেন—সুভাষ অবিশ্যি বলে 'না জাগিলে সব বঙ্গ ললনা এ ভারত বুঝি জাগেনা জাগেনা। হয়তো ভারতমাতা একটু জেগেছেন। কিন্তু আমি যে এরকম বঙ্গ ললনার মুখ দেখলেই চিনতে পারি ভাই।

উক্ত ভদ্রমহিলার কিছু জনপ্রিয়তা পরে দেখেছি রাজনীতি ক্ষেত্রে। কিন্তু উপেনদা যে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তা মিথ্যা, একথা বলতে পারি না।

দাশ মশায় সভার কার্য আরম্ভ করার আগেই সেদিন 'বৈকালী'র ঘরে শচীন সেনগুপ্তের কাছে উঠে গেছি।

তখনকার দিনে কাজী নজরুল যুবকদের কাছে এক আদর্শ কবি। এই প্রতিভাবান কবি তখন 'বিদ্রোহী' কবিতা লিখে শক্তি-পূজারী বাঙালীর চিত্তে এক নবশক্তির সঞ্চার করেছিলেন। তিনিও মাঝে মাঝে আসতেন চেরী প্রেসে সম্পাদকদের আড্ডায়। এইখানেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সৌভাগ্য হয়েছিল। সুবিখ্যাত গায়ক-কবি নলিনীকান্ত সরকার ছিলেন আমাদের উভয়ের পরিচয়ের সূত্র। নজরুলের মতো সদা আনন্দ-বিহ্বল ও সদা-চঞ্চল লোক খুব কমই দেখেছি। ঝড়ের বেগে এসে হাস্যে-লাস্যে একটা আসর সপ্তমে চড়িয়ে দিয়ে তিনি ঝড়ের বেগেই হঠাৎ আবার কোথায় উধাও হয়ে যেতেন।

দাশ মশায় এই কবিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর কবিপ্রতিভার সঙ্গে অসীম দেশপ্রীতি মিশে তাঁকে খুবই জনপ্রিয় করেছিল। দেশের মুক্তির জন্য কারাবরণের দুঃখকে তিনি তুচ্ছ করে নিজের চরিত্রে মাধুর্য ফুটিয়েছিলেন —সেই মাধুর্যই ছিল দুর্বার আকর্ষণ। সি, আর, দাশ ইতিমধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন হয়েছেন। গান্ধীজীর সঙ্গে মত-বিরোধ হওয়ায় তিনি কংগ্রেসে নতুন দল তৈরী করেছিলেন মতিলাল নেহেরুর সহায়তায়। এই দলের নাম হয়েছিল স্বরাজ্য দল। স্বরাজ দলকে নানা ভাবে শক্তিশালী করে তুলবার জন্য দেশবন্ধু বাংলার সর্বত্র সকলের সহযোগিতা ভিক্ষা করে ফিরেছিলেন। কবি, সাহিত্যিক, ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী সকলের

সাহায্যের প্রত্যাশী তিনি ছিলেন। শক্তি সংগ্রহের জন্য সকল উৎস খুঁজে বার করতে তাঁকে অপরিসীম পরিশ্রম করতে হয়েছিল। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎ চাটুজ্যেকে তিনি তাঁর দলে টেনে নানাস্থানে ঘুরিয়েছিলেন, একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন। কাজী নজরুলকেও তাঁর প্রয়োজন হয়েছিল। তাঁর দল গঠনের সময় নজরুলের কয়েকখানা গান খুব উন্মাদনা স্বষ্টি করেছিল। তার মধ্যে যে গানখানি দেশবন্ধুকে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল, তা আমি নজরুলের মুখে একদিন শুনেছিলাম আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের এক কবরেজের বাড়িতে। নজরুল প্রায়ই তখন এই কবরেজের বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় আড্ডা দিতে আসতেন। কবরেজকে ডাকতেন কবরেজদা বলে। নলিনীকান্ত সরকার আমাকে সেদিনকার সন্ধ্যার আসরে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। মোহিতলাল মজুমদারও ছিলেন সেই আসরে। মোহিতলালের সঙ্গে নজরুলের তখন খুব ভাব। নজরুল গান ধরলেন—তার কয়েকটা ছাড়া-ছাড়া লাইন আজো কানে বাজে :

ভিক্ষা দাও ভিক্ষা দাও ফিরে চাও ওগো পুরবাসী,
সন্তান দ্বারে উপবাসী,
ভিক্ষা দাও।

*　　*　　*　　*

জাগোরে জাগোরে,
পুরুষসিংহ জাগোরে,
সত্য মানব জাগোরে,
বাধাবন্ধনভয়হারা হও
সত্য-মুক্তিমন্ত্র গাও।

*　　*　　*　　*

অত্যাচার! অত্যাচার!
নর-নারায়ণে হানে পদাঘাত
জেনেছে হত্যা সত্য সার।

মঙ্গলঘট ভেঙ্গে ফেলো,
সব গেলো মাগো, সব গেলো,
দীপ নিবাও—

সেদিনকার সন্ধ্যার আসরে অপূর্ব আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল নজরুল। এই গানের শক্তি যে কতখানি তা সত্যই সে দিন উপলব্ধি করেছিলাম। নজরুলের মুখেই শুনেছি দেশবন্ধু বার বার এই গানখানা শুনেছিলেন নজরুলকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে। কয়েকটা সভাতে এবং রাজপথেও মিছিল করে এই গান গাওয়া হয়েছিল দেশবন্ধুর নির্দেশক্রমে।

দেশবন্ধু দেখলেন তাঁর দলকে শক্তিশালী করতে হলে দলের একখানি মুখপত্র অবশ্য প্রয়োজন। কারণ, তাঁর মতবাদ প্রচারিত না হলে লোকে তাঁর কর্মপন্থা গ্রহণ করবে কি করে? তাই ইংরাজী দৈনিক "ফরওয়ার্ড" প্রকাশের আয়োজন চলতে লাগলো। উপেনদার লেখনী ক্ষুরধার, একথা তখন বাংলাদেশে কে না জানে। কিন্তু সে তো তাঁর বাংলা রচনাশক্তির পরিচয়। তিনি যে ইংরাজী ভাষাতেও সমান দক্ষ সে কথা অনেকেরই অজ্ঞাত ছিল। তিনি যে সময় আত্মশক্তির সম্পাদক ছিলেন সেই সময় ইংরাজী দৈনিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'তেও সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রবন্ধ লিখে পাঠাতেন। আমি আত্মশক্তি অফিসে বসে তাঁর ইংরেজী প্রবন্ধের প্রুফ সংশোধন করতে তাঁকে দেখেছি। পত্রিকা অফিসের পিওন এসে প্রুফ দিয়ে আবার নিয়ে চলে যেতো। এ জন্য বোধ হয় মাসিক একশো টাকা করে তখন তিনি দক্ষিণা পেতেন।

বিখ্যাত অভিনেতা নরেশ মিত্রের ভাই হৃষীকেশ মিত্র আমাদের বন্ধু ছিলেন। তাঁর মুখে শুনেছি প্রসিদ্ধ সাংবাদিক মৃণালকান্তি বসু উপেনদাকে দিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকায় লিখাবার চেষ্টা করছিলেন। হৃষীকেশ মিত্রই নাকি একদিন মৃণালবাবুর প্রস্তাব নিয়ে যান। উপেনদার ইংরেজী লেখার হাত বহুদিন আগেই বন্ধ হয়েছিল। এজন্য প্রথমে তিনি একটু আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু তখন যে তাঁর অর্থের প্রয়োজন খুবই বেশী। আবার শুরু করলেন ইংরেজী লিখতে। ও-হাত যে বহুদিন আগে পাকা, শুধু একটু

শানিয়ে নিলেই হলো। অবিদার (অবিনাশ ভট্টাচার্য) কাছে শুনেছি উপেনদা ছিলেন শ্রীঅরবিন্দের সহকারী—'বন্দেমাতরম্' পত্রের সাব-এডিটর। একদিন ডাকযোগে তাঁর ইংরাজী প্রবন্ধ পেয়ে মুগ্ধ হয়ে শ্রীঅরবিন্দ নাকি তাঁকে ডেকে এনে 'বন্দেমাতরম্' অফিসে বসিয়েছিলেন।

দেশবন্ধুর দলীয় কাগজের প্রকাশনার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এলো। চারিদিকে বিজ্ঞপ্তি হলো মৃণালকান্তি বসু হবেন সম্পাদক আর তাঁর সহযোগী হবেন উপেন বাঁড়ুজ্যে। উপেনদা তাঁর লেখনী ও চরিত্র-মাধুর্যের বলে দেশবন্ধুর কাছে হয়ে উঠেছিলেন কেষ্ট-বিষ্টু—তাঁর কাগজ পরিচালনায় উপেন বাঁড়ুজ্যেকে তাঁর চাই-ই। দেশবন্ধুর কাগজ, মৃণালকান্তি সম্পাদক এবং উপেন বাঁড়ুজ্যে তাঁর সহযোগী। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। লোকে অধীর প্রতীক্ষায় রইলো প্রথম কাগজখানির জন্য।

প্রথম কাগজ বার হলো। কিন্তু সে কাগজের অফিসে উপেন বাঁড়ুজ্যেকে সেদিন দেখা যায়নি। তিনি তখন কারার অন্তরালে। সরকার বাহাদুর দয়া করে আগেই তাঁকে সরিয়ে ফেলেছিলেন।

গ্রাম্য আবহাওয়া ছেড়ে বাঙালীর শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরাট কেন্দ্র এই কলকাতা শহরে এসে আমি এক অনাস্বাদিত রসের সন্ধান পেয়েছিলাম এই চেরী প্রেসে। কিছুদিন থেকে ছোট, বড়, মাঝারি রকমের নেতা বা কর্মীদের জটলা হতো উপেনদার টেবিলের চারপাশে। এটা একটা সম্পাদকের অফিস, না আড্ডা-খানা তা সহসা ঠাহর করা শক্ত ছিল। সাহিত্য, রাজনীতি, জাতিতত্ত্ব কিংবা দুর্বোধ্য অধ্যাত্মবাদ নিয়ে যে-সব আলোচনা হতো তা জারক রসে রসিয়ে তুলতেন উপেনদা। তীক্ষ্ণ ভাষণে অমন অনাবিল অম্ল-মধুর রসের নির্ঝর যেন নীলধারার মতো অবলীলায় তরতর করে বয়ে যেতো। সে আকর্ষণ ছেড়ে যাবার শক্তি কারো ছিল বলে তো মনে হতো না। কতদিন সন্ধ্যা গড়িয়ে বেশ একটু রাতও হয়ে গেছে; কিন্তু ঐ লোভনীয় ব্যক্তিটি চোখের আড়াল না-হওয়া পর্যন্ত কাউকে উঠতে

দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। তাই যেদিন তিনি তিন আইনের রাজবন্দী রূপে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেদিন হঠাৎ যেন কলকাতা শহরটা আমার কাছে এক বিরাট বন্দিশালা হয়ে উঠলো। আমার মেসের সঙ্কীর্ণ কোণ থেকে বহির্জগতে যাওয়ার পথ আর কোনটি তা আমার জানা নেই তখন। ব্যথিত হয়েছিলাম দারুণ।

কিন্তু আমার চেয়েও ঢের বেশি ব্যথিত হয়েছিলেন যিনি তাঁর কথা কি তখন ভেবেছি? তিনি ছিলেন দেশবন্ধু। আমার টান ছিল স্বার্থের আর দেশবন্ধু ছিলেন নিঃস্বার্থ—দেশ ও দশের কল্যাণে যিনি নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে নিঃস্ব হয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল তাঁর দলের মুখপত্র শক্তিশালী হবে উপেন বাঁড়ুজ্যের লেখনীতে কিন্তু প্রথমেই তিনি ঘা খেলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের নেতা যে-সব কর্মপন্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন সেগুলি উপেন বাঁড়ুজ্যের কাছে অজানা বা নতুন বলে মনে হয়নি; তাঁর মনে হতো ও যেন নতুন বোতলে পুরোনো মদ। যে বীজ ছড়ানো হয়েছিল তা অঙ্কুরিত হয়েছে, হয়তো বা শাখা-প্রশাখার বিস্তারও হবে—তা যে অবশ্যম্ভাবী। সর্বসাধারণের চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়েছে গান্ধীজীরই কর্মশক্তির প্রভাবে ও তাঁর অসামান্য ত্যাগে সন্দেহ নেই। অঙ্কুরে জলসিঞ্চনের কাজ অবশ্যই তিনি করেছেন। স্বাধীনতা লাভের যে চেতনা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল তাকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন গান্ধীজী। তাঁর মন্ত্র ছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে অহিংস সংগ্রাম—হতে হবে সকলকে অহিংস 'কায়েনমনসা-বাচা'। এই অহিংস হওয়ার সম্ভাব্যতা উপেনদার কাছে ছিল একেবারে দুর্বোধ্য। আন্দোলনের শুরু থেকেই এই নীতির বিরুদ্ধে তিনি তাঁর লেখনী চালনা করতে থাকেন। বিজলীর পৃষ্ঠায় 'উনপঞ্চাশী'র অকাট্য ও সারবান যুক্তি খণ্ডন করা সম্ভব ছিল না। তাঁর লেখনীর তীব্রতায় অনেকে চকিত হয়ে ভাবতো তারা কি বিভ্রান্ত হয়ে ছুটেছে সব। ভাবপ্রবাহে যারা ভাসমান, বুদ্ধি যাদের ভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন তারা চঞ্চল হয়ে উঠতো। তারাই করলে একদিন 'বিজলী' কাগজকে বয়কট করার আন্দোলন; করলে প্রকাশ্য রাজপথে পুঞ্জীভূত বিজলী পত্রিকার বহ্ন্যুৎসব!

উপেনদা শুনে বললেন—অহিংস ভাবে করেছে তো ?

গান্ধীজীর সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় দেশবন্ধু নতুন দল গঠন করলেন। গান্ধীজী সরে দাঁড়ালেন কিছুকালের জন্য রাজনীতি থেকে। দেশবন্ধু বললেন সরকারী শাসনযন্ত্র ও সব সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে থেকে নয়, তাদের ভিতরে ঢুকে আয়ত্তে এনে অচল করে দেওয়াই হবে তাঁর নীতি। গান্ধীজী প্রমাদ গণলেন, বললেন তথাস্তু। দেশবন্ধুর এই নীতিকে সর্বসাধারণের কাছে বোধগম্য করে দেওয়া উপেন বাঁড়ুজ্যের পক্ষে অতি সহজ দেশবন্ধু তা বুঝেছিলেন। দ্বীপান্তরের আগেই তাঁর এই মক্কেলকে তিনি চিনে-ছিলেন। দ্বীপান্তরের উত্তরকালে এ মক্কেলের লেখা তাঁকে অধিকতর আকৃষ্ট করেছিল। তাই 'ফরওয়ার্ড' প্রকাশের প্রাক্কালেই উপেনদাকে সরকার বাহাদুর যখন অপসারিত করলেন তখন বিশেষ করে বেদনাহত হলেন দেশবন্ধু।

অহিংসার অপব্যাখ্যা যে ক্ষেত্রে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে, শয়তানের বীভৎস অত্যাচারের বিরুদ্ধে শক্তির স্বয়ং প্রকাশকে যেখানে রুদ্ধ করবে ক্লীবত্ব, সেইখানে উপেনদার কষাঘাত ছিল নির্মম। অসহযোগের কালে অহিংসার কর্মঠ ব্রতের কঠোর সমালোচক উপেন বাঁড়ুজ্যের ঊনপঞ্চাশী, শুনেছি শ্রীঅরবিন্দও তারিফ করতেন।

এই সময়ে উপেনদা কিছুকালের জন্য পণ্ডিচেরীতে চলে যান শ্রীঅরবিন্দের কাছে। স্বাধীনতা যজ্ঞের যাজ্ঞিক যিনি, যাঁর কাছে নিয়েছিলেন 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র তিনি সুদূর দক্ষিণ ভারতে সমুদ্রের উপকূলে কি করছেন, কিসের আশায় কার পথ চেয়ে বসে আছেন, তা দেখবার আকুলতা হওয়া স্বাভাবিক—বিশেষ করে বারো বছর দ্বীপান্তর বাসের পর। যে কর্মযোগীর আদর্শে তিনি কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন একদিন, সেই কর্মযোগীর আবার নতুন কোন্ নির্দেশ আছে তাঁর যে তা জানা চাই।

উপেনদা দেখলেন শ্রীঅরবিন্দ আছেন, আর আছেন মীরা রিসার নামে একজন ফরাসী মহিলা এবং উপেনদারই সহকর্মী ও বন্ধু জনকয়েক। শ্রীঅরবিন্দ সবারই সঙ্গে মেশেন, নানা আলাপ আলোচনা হয়, ঠাট্টাবিদ্রূপও

চলে বেশ। বিকালের দিকটায় একটা পাঠচক্রে বেদপাঠ হয় এবং তিনি তার ব্যাখ্যা করে সকলকে বুঝিয়ে দেন।

শ্রীঅরবিন্দের মুখে বেদের সে অপূর্ব ব্যাখ্যার সম্মোহনী শক্তি ছিল অসাধারণ, তা এনে দিত এক অদ্ভুত তন্ময়তা। ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমের পূজারী ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষগণ; তাঁরা পূজা করতেন আকাশকে, ঊষার আকাশে উদিত অরুণকে, বেগবতী প্রবাহিনী স্রোতস্বতীকে—যেন বিস্মিত শিশুর সে মুগ্ধ ভাব-বিহ্বলতা! এমনি একটা কঠিন নিরেট ব্যাখ্যায় আমরা অভ্যস্ত হয়েছি পশ্চিমের পণ্ডিতদের বিকৃত অপভাষণে! উপায় নেই, কেন না সেই বেদের যুগের ভাষা যে আমাদের অজ্ঞাত, ভুলেছি তাই সে যুগের অন্তর্লোকের গূঢ় রহস্য!

শ্রীঅরবিন্দ উদ্ঘাটিত করে ধরতেন তাঁর প্রিয় শ্রোতাদের সম্মুখে সেই সে-যুগের রহস্য! যে সম্পদকে নিজের কাছে ধরে রাখবার, অপরকে সেই অমৃতের একটু কণিকা বিলিয়ে দেবার লোভ কার না হয়? যাঁরা শুনতেন তাঁদের মধ্যে দেখা যেতো নলিনীকান্ত গুপ্ত, প্রবর্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা মতিলাল রায় এবং আরও কয়েকজনকে।

আশ্রমে বৈকালিক-বৈঠকে তখন শ্রীঅরবিন্দ শুধু বেদব্যাখ্যাই করতেন না, রঙ্গরসিকতাও চলতো তাঁর শ্রোতাদের সঙ্গে। কারণ, তখনও তিনি গভীরতর যোগসাধনার জন্যে মৌনী হয়ে অন্তরালে যাননি। শ্রোতাদের মধ্যে নলিনীকান্ত গুপ্তের হাতে পরে এই অপূর্ব বেদব্যাখ্যার কিছুটা 'ঋষি মধুচ্ছন্দার মন্ত্রমালা' হয়ে বেরিয়ে এসেছে। শ্রীঅরবিন্দের অনুপ্রেরণায় তাঁরই ব্যাখ্যাসম্বলিত এই বই।

কিন্তু এ যে এক সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ। স্বদেশী যুগের অরবিন্দ ঘোষকে তো আর চেনা যায় না—তিনি শ্রীঅরবিন্দে রূপান্তরিত হচ্ছেন সুতরাং সেই পরিবেশও লুপ্ত হয়েছে।

এখানে শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা, হাসি-তামাসা করলেও অন্তর্জীবনের গভীর স্তরে ডুবে থাকেন। তাঁর কাছে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা নয়। জগৎও তেমনি সত্য, তেমনি প্রোজ্জ্বল। ভগবান ইয়ারকি মারবার

জন্য এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন নি। আমরা যা কিছু প্রত্যক্ষ করি সবই ব্রহ্মময়—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তাঁর অনন্ত কোটি সৃষ্টির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন তিনি। তিনি করে চলেছেন লীলা তাঁর নিজেরই প্রয়োজনে, নিজের লীলামৃত পান করে আসছেন নিজেই আদিকাল থেকে বর্তমানে, পান করবেন অনাগত কালেও। চেতনাসম্পন্ন যা, আর যা অচেতন সবেতেই যখন তিনি তখন আমিও তিনিই। আমার মধ্যে তিনিই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছেন, আমাকে শুধু তাই জানতে হবে। ঋষিরা একথা জেনেছিলেন তাই তাঁরা বলেছিলেন—'আত্মানং বিদ্ধি'।

স্বাধীনতা চাই? নিশ্চয়ই। শুধু ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কেন? সর্বদেশের সর্বমানবের স্বাধীনতা চাই। কিন্তু তারও আগে যে নিজেকে স্বাধীন হতে হবে। কে স্বাধীন? যে নিজের অধীন। আর, নিজ অর্থ জীবাত্মা—যিনি পরমাত্মার অংশ মাত্র। এই জীবাত্মা কি শুধুই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যেই আছে? আমরা অজ্ঞান, তাই পঞ্চেন্দ্রিয়ের বন্ধনে বাঁধা পড়ে 'আমি' বলে একটা স্বতন্ত্র সত্তা মেনে নিই। সে তো শুধু মায়া। সেই মায়া থেকে মুক্তি পেতে হবে। তারি জন্য চাই জ্ঞান এবং এই জ্ঞানের জন্যই করতে হবে সাধনা, তপশ্চর্যা। জ্ঞানের দ্বারা যখন উপলব্ধি করবো জীবাত্মা সেই পরমাত্মাই—পরমজ্যোতি, তখন তো আর আমি নেই। আমি যুক্ত হয়ে গেছি তখন পরমাত্মায়; আমি হয়েছি 'স্ব'-এর অধীন অর্থাৎ পরমাত্মার অধীন। তখন আমার করণীয় আর কিছু নেই, করেন তিনিই—আমি শুধু তাঁর যন্ত্র মাত্র। প্রকৃত স্বাধীনতা বলতে এই বুঝতে হবে।

স্বাধীনতার জন্য তাহলে কঠোর সাধনার প্রয়োজন? শ্রীঅরবিন্দের জীবনে কি সেই পরীক্ষাই চলছে এখন? জেলের ভিতরও তিনি নাকি যোগসাধনা করতেন। সেই স্বদেশী-যুগে উপেন বাঁড়ুজ্যে একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তেল না মেখেও কেমন করে তাঁর মাথার চুল তেল চকচকে হয়; তার উত্তরে তিনি ঐ যোগ-টোগ ধরণের কি একটা কথাই তখন বলেছিলেন। উপেন বাঁড়ুজ্যে তা কখনো গ্রাহ্য করেন নি। ইংরেজকে

বোমা মেরে তাড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারেও কই তাঁকে তো কোন তিরস্কার শুনতে হয়নি। বরং চুরি-করা বিস্কুটের কয়েকটা টুকরো রাত্রির অন্ধকারে তাঁর হাতের মধ্যে গুঁজে দিতে তিনি খুশিই হয়েছেন। সে অরবিন্দ ঘোষ এখন কোথায়? তাঁর এ অধ্যাত্মতত্ত্বের অনুশীলন কতদিন চলবে? তাঁকেও বসে থাকতে হবে এইখানে অনিশ্চিত সিদ্ধির আশায়? উপেনদা অধৈর্য হয়ে পড়েন।

জিজ্ঞেস করেন শ্রীঅরবিন্দকে—আর কতদিন?

উত্তর আসে—তা কি করে বলবো! আগে নিজেকে জানো তবেই জানতে পারবে সেই জ্যোতির্ময়কে, তখন তাঁরই হাতে ছেড়ে দাও নিজেকে, কারণ তিনি যে নিত্যই আমাদেরকে ডেকে বলছেন—'মামেকং শরণং ব্রজ'। ফলের কামনা করো না, কারণ ফল তো দেবেন তিনিই, তাঁরই প্রয়োজনে—কবে কখন তা তিনিই জানেন।

—ওরে বাপ্‌রে! ও আমার পোষাবে না, কর্তা! যোগ-বিয়োগ যা কিছু করা দরকার, তা আপনিই বরং আমার হয়ে করুন। আমার ধাতে ও-সব সইবে না; শুধু আমার মাথায় তিনটি টোকা মেরে একটু আশীর্বাদ করে ছেড়ে দিন কর্তা, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাই। সময় বুঝলে দয়া করে একখানা টেলিগ্রাম ছেড়ে দেবেন, আবার আস্‌বো ছুটে—অবিশ্যি যদি বেঁচে থাকি তখন।

কর্তা শুধু হেসেছিলেন। এ দুর্মুখকে তিনি চিনতেন, কোন বাধা দেন নি।

ইংরাজশাসনজর্জর ভারতের মুক্তির জন্য তাঁর চিত্তে যে চাঞ্চল্য ছিল, তা কখন কি ভাবে প্রকাশ পাবে কে বলতে পারে? অহিংস-অসহযোগে ঘোর অবিশ্বাসী এই ব্যক্তিটি আবার কোন্ মতলব আঁটছে কে জানে! অহিংসার শান্ত পরিবেশের মধ্যে আত্মরক্ষা সহজ, কিন্তু দুর্বার বিপ্লবীর মারাত্মক অপসৃষ্টির মধ্যে বিপন্ন ও বিভ্রান্ত হতে কে চায়? রাজশক্তি তাই উপেনদাকে দেশবন্ধুর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

দেশবন্ধু মার খেয়ে গেলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি নগণ্য যুবকও

যে সেদিন মার খেয়ে দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো, তার খবর কে রাখতো ?

উপেনদাকে হারিয়ে নিতান্ত নিঃসহায় অবস্থায় আমাকে দিনগুলি কাটাতে হচ্ছিল। চেরী প্রেসের দিকে পা দু'টো এগিয়ে দিই, কিন্তু মন কেউ টানে না। সেখানে শচীনদা (শচীন সেনগুপ্ত) তখনো 'বৈকালী' সম্পাদন করেন, ভাবি তাঁর কাছে গেলেও বিকালের দিকটা তো কাটতে পারে। তাঁর সঙ্গেও ভাব জমে উঠেছিল! হৃদয়টা তাঁর স্নেহময় হলেও লোকটা ছিলেন একটু রগ-চটা গোছের, তাই তাঁর কাছে যেতে কেমন যেন ভয় করতো। অতুল সেন (দেশবন্ধুর স্বরাজ পার্টির সভ্য) নামক এক ভদ্রলোক আসতেন শচীনদা'র কাছে আড্ডা দিতে। লম্বা-চওড়া দেহের সঙ্গে তাঁর চাকা-চাকা ভারি ভারি মুখখানাও বেশ সঙ্গতি রেখেছিল। চমৎকার ক্যারিকেচার করতেন তিনি। বোধ করি ঢাকা অঞ্চলের লোক, নইলে ঢাকার কথা অমন সুন্দর করে গুছিয়ে বলতেন কি করে? তাঁর মুখের হাঁ-টা ঈষৎ বড়ো থাকায় মুখভঙ্গির সময় ইয়া গর্দানের দু'পাশের দু'টো রগ এমনি ফুলে উঠতো যে, তাতেই তিনি মেরে দিতেন অর্ধেক; অর্থাৎ তাঁর রসিকতার অর্ধেক কৃতিত্ব মিলতো গলায় ও মুখের হাঁ-তে—যেন গানের সঙ্গে সঙ্গত। কিন্তু মাঝে মাঝে যে আসর যেতো বিগ্‌ড়ে শচীনদার দোষে!

হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন ছিলেন শচীনদার সহকর্মী। বৈকালী দৈনিক কাগজ। সব কাজ চলে ঘড়ির কাঁটা ধরে। একটু এদিক-ওদিক হলেই সব গুলিয়ে যায়। হরেকৃষ্ণ বৈষ্ণব-সাহিত্যসেবী। কোথাও কোন বৈষ্ণব-সাহিত্য সভায় হাজিরা দিয়েছেন কিংবা হয়তো সাহিত্য-পরিষদে কোন্ পুরানো পুঁথি ঘেঁটে ঘেঁটে কিছু অনুশীলনের খোরাক যোগাড় করতে সময় গেছে পেরিয়ে, সুতরাং বৈকালী অফিসে আসতেও তাঁর হয়ে গেছে দেরি। এমনি একদিন হয়েছিল। আমি বসে আছি, অতুল সেনও ছিলেন সেদিন। শচীনদা লেখা প্রায় শেষ করে এনেছেন, একটু পরেই হয়তো অতুল সেন শুরু

করবেন তাঁর কোন এডভোকেট বন্ধুর ইংরেজী বলার ভঙ্গির নকল, এমন সময় এলেন হরেকৃষ্ণ। বেচারী যেন চোরের মতো ঘরে ঢুকলেন। আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় তাঁর মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। একপাশে একখানা চেয়ারে তিনি চুপ করে বসে পড়লেন—শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন! শচীনদা দেখেও সেদিকে যেন ভ্রূক্ষেপ করলেন না। অতুল সেনের দিকে চেয়ে তিনি বললেন—হ্যাঁ, তারপর?

ওরই মধ্যে এক ফাঁকে হরেকৃষ্ণ টেবিলের উপর থেকে একখানা বই কোলের দিকে টেনে নিয়ে তাঁর বীরভূমী কথার টানে বলে উঠলেন--এ-ট্রা কি বই বটে?

প্রশ্নটা হলো শচীনদাকে লক্ষ্য করেই। দেবতা যদি প্রসন্ন হন। বাস্, আর যাই কোথা। দেবতা প্রসন্ন হওয়া তো দূরের কথা, একেবারে তেলে আগুনে জ্বলে উঠলেন। চীৎকার করে হরেকৃষ্ণর হাত থেকে বইখানা ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিকৃত কণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—তোমার মাথা! রাগের ঝাঁজটা বোধ করি পুরামাত্রায় প্রকাশ পায়নি, তাই একটু সংস্কৃত করে আবার বললেন—তোমার মস্তক! এবং তারপরেই একবারে সপ্তমে চড়ে রাজভাষায় নির্দেশ দিলেন—Get out! তারপর আরো গোটাকতক গরম গরম মর্মস্পর্শী বাণী। আমরা তো স্তম্ভিত! মুহূর্তে এমন প্রলয় কাণ্ড হবে কে জানতো? লজ্জায় ও বেদনায় হরেকৃষ্ণর সারা মুখখানায় রক্তের ঝলক দেখা দিল। ঘোর অপরাধীর মতো হরেকৃষ্ণ একেবারে নীরব, দারুভূতো মুরারির ন্যায় তিনি একাসনে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। সবশেষে অবিশ্যি মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়েছিল, এবং সেটা শচীনদারই পয়সায়। রসগোল্লা এলে বেঁকে বসলেন তিনি, খাবেন না আর শচীনদাও ছাড়বেন না। অর্থাৎ অতঃপর মানভঞ্জনের পালা।

এ-হেন লোকের কাছে যাওয়ায় বিপদ ছিল বৈকি।

উপেনদা বলতেন—দেখিস বেতালা হসনি, তালে তাল দিয়ে চলতে পারলেই ও ঠিক আছে।

শচীনদাকে তিনি ভালোই বাসতেন।

অগত্যা কাজী নজরুলকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করি। কোথায় কখন যে তার দেখা মিলবে, তা বোঝা যায় না। সন্ধ্যেবেলায় না হয় কবরেজদার ওখানে যাওয়া যাবে, কিন্তু বিকেল বেলাটা কাটে কি করে? গেলাম হয় ত আরপুলি লেনে কবি যতীন বাগচীর ওখানে। সেখানটায়ও আড্ডা জমতো মাঝে মাঝে বেশ। নজরুলকে নিয়ে নজরুলের অগ্রগণ্যদের মধ্যে তখন বেশ একটু প্রতিযোগিতা চলতো। কার স্নেহ বেশী প্রবল তাই দেখাবার জন্যে কিংবা কেউবা ভালবাসতেন তার উপর মুরুব্বিয়ানা করতে। যতীন বাগচীর বোধ করি দ্বিতীয় ভাবটি তখন প্রবল। একদিন তাঁর ওখানে গেছি নলিনীকান্ত সরকারের সঙ্গে। নজরুলের দেখা পেলাম না। যতীন বাগচী বললেন—নজরুল কি আরম্ভ করলে হে, বলো তো! এটা কি একটা কবিতা হয়েছে? বলেই তিনি 'প্রবাসী'র একটা পাতা খুলে আমাদের দেখালেন এবং সে কবিতার প্রকৃত অর্থ কি তা আবিষ্কার করার দুশ্চেষ্টা আর করবেন না, একথাও বললেন। তিনি বিফল হয়েছেন, আমরা যদি এবার তাঁকে সাহায্য করি তবে খুশি হবেন তিনি—এইরকম একটা ভাব।

আলোচ্য কবিতাটির নাম 'বদন-চন্দ্রমা'। পুরুষের চাঁদমুখ অবিশ্যি নয়, নারীর চাঁদমুখ দেখেই কবি মুগ্ধ, বিহ্বল হয়ে কবুতরের মতন বকম্-বকম্ করেছেন। যেমন—

নাসায় তিলফুল
হাসায় বিলকুল,
            নয়ান ছলছল উদাস
দৃষ্টি চোর-চোর
মিষ্টি ঘোর-ঘোর,
            বয়ান ঢল ঢল হুতাশ।

ঝঙ্কারটি বেশ। ছত্রে ছত্রে বর্ণে বর্ণে মিলের বাহার! বহিরঙ্গের এমন নিখুঁত চাকচিক্য, এমন পালিশ চাট্টিখানি কথা নয়! কিন্তু ঐ পর্যন্তই। ওর অন্তরালের বস্তুটি যে কি তা আবিষ্কার করা সত্যই দুঃসাধ্য। যতীন বাগচী ব্যথিত হয়েছিলেন, তাঁর ব্যথার কারণ ছিল নিশ্চয়। নজরুলের মোহ যদি

মিলের দিকে বেশি করে যায়, তবে তার প্রতিভা ক্ষুণ্ণ হতে পারে, যতীন বাগচীর এ আশঙ্কা অমূলক ছিল না।

উপেনদার অভাবে এখানে-ওখানে ঘোরা-ঘুরি করে একটু যে আনন্দ সংগ্রহ করবো, সে পথও আমার ক্রমে রুদ্ধ হয়ে এলো। তাই তো বারীনদা সুদূর পণ্ডিচেরীতে গিয়ে যোগসাধনায় বসেছেন; উপেনদা আবার বন্দি-শালায়; অবিদা কাগজ পরিচালনার উৎসাহে যাঁদের নিয়ে গিন্নিপনা করতেন তাঁদের আশা ছেড়ে দিয়ে ঘরকন্নার দিকে একটু বেশি করে মনোযোগ দিয়েছেন। খানকতক রিক্সা ভাড়া খাটিয়ে আপাতত অন্ন সংস্থানের জন্যে তিনি রীতিমত ছুটাছুটি করছেন, শুনলাম। অখিল মিস্ত্রী লেন থেকে উঠে গিয়ে তিনি আর একটা জায়গায় বাসা বেঁধেছেন এবং সেইখানেই আমার দুর্দিনের একমাত্র 'অবলম্বন'কেও তিনি ঠাঁই দিয়েছেন, জানতে পারলাম। আমহার্স্ট স্ট্রীট কিংবা আরপুলি লেনের দিকে যিনি ছিলেন আমার প্রিয় সঙ্গী—একমাত্র সহায় ও সম্বল তিনি ধীরে ধীরে নিজেকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে শেষে একেবারে আত্মগোপন করলেন। কেন তার কারণ আমার জানা চাই। তাই ছুটলাম অবিদার নতুন বাসায়। দেখলাম অবিদা স্বয়ং একটি গিন্নির মালিক হলেও নিজের গিন্নীপনা হাতছাড়া করেন নি। একখানা শাড়ী সাবান-কাচা করে প্রায় শেষ করে এনেছেন তিনি, এমন সময় আমি গিয়ে হাজির। বেলা তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। বোধ করি জ্যৈষ্ঠ মাস। প্রখর রৌদ্রে গলদঘর্ম হয়ে গেছি। আমার অবলম্বনকে আমার চাই-ই।

এসো—বলে অবিদা তাঁর ঘরের ভিতরে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একখানা তক্তপোশে বসালেন। বৌদি ছিলেন তার একপাশে শুয়ে একেবারে অসাড় হয়ে। মোটা-সোটা ভারি গড়ন তাঁর, আর অতি মিষ্টি কোমল স্বভাব।

কি হলো বৌদির ?—জিজ্ঞেস করলাম অবিদাকে।

—আরে ভাই, অসুখ করেছে ওঁর আজ দু'দিন হলো। রান্নাবান্না সবই করতে হচ্ছে আমায়। ঝি-চাকর-রাঁধুনী তো আমরা পুষতে পারি না, ভাই, কি করি বলো!

—তাতো দেখছি। কিন্তু অমুক কোথায়?

—চুপ। একটু আস্তে কথা বলো। পাশের ঘরেই আছে, শুনতে পাবে সে। ভয়ানক কাণ্ড ভাই, সে রীতিমত নাটক। বলছি সব কিন্তু তার আগে তার চেহারাটা একবার দেখে নাও। ঘরের দরজা তার বন্ধ। এই এ-পাশটায় একটা ঘুলঘুলি আছে, তাই দিয়েই দেখতে পাবে বেশ।

ব্যাপারটা কি! সব যে হেঁয়ালি বলে বোধ হচ্ছে! ঘুলঘুলি দিয়ে চোখ মেলে দেখি অমুকচন্দ্র একেবারে গুম্ হয়ে বসে আছেন। মাথার ঝাঁকড়া চুলগুলি তৈলাভাবাৎ রুক্ষ। হৃদয়-বেদনার তাপ শরীরকে শীর্ণ, শুষ্ক করেছে। মর্মাহত হয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছেন। শুনলাম আজ দু'দিন তাঁর আহার-নিদ্রা নেই।

তাঁকে দেখে আমার সত্যই দুঃখ হলো এবং আরো দুঃখ হলো যখন অবিদার মুখে শুনলাম তাঁর এই মর্মবেদনার আনুপূর্বিক ইতিহাস।

বন্ধুটি প্রেমে পড়েছিলেন এবং সে এক মারাত্মক রকমের প্রেম। তাঁর প্রেমাস্পদাকে না পেলে অনাহারে তিনি তনুত্যাগ করবেন, এই রকম ভাব তাঁর আচরণে প্রকাশ পাচ্ছিল।

অবিদা আমার কানে ফিস্-ফিস্ করে বললেন—আগেকার বৌ খবর পেয়ে বাড়ি থেকে ছুটে এইখানে এসে সে কি কান্নাকাটি! ভাই চোখে দেখা যায় না। দুদিন কি বিশ্রীই কেটেছে। পারলে না হতভাগা পাগলটাকে টলাতে। ফিরে গেছে। আমার মনে হয় সে বাঁচবে না; আহা! লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে সহ্য করতে পারবে না।

ওই যেখানে একটি মেয়েকে গান শিখাতো হে, জানো না বুঝি? সেইখানেই গজিয়েছে এই লভ্।—বলেই অবিদা খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আবার বললেন, সবই করা গেল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মরুক গে হতভাগা, কি করবো?

শেষকালে কর্তাকে (অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দকে) নাকি অবিদার দলের লোকেরা জানালেন সব ব্যাপারটা। দিশে-বিশে না পেয়ে ভাবলেন

তাঁরা এই পাশুপত অস্ত্র-প্রয়োগে কাজ হবে। কিন্তু কর্তা নিষ্ঠুর, নির্মম। জবাব এলো—

"It's too late now. Inform me when he marries for the third time."

কর্তার এই রসিকতার মধ্যে তাঁর গভীর দূরদৃষ্টির ইঙ্গিত পেয়ে অবিদার দলের লোকেরা প্রমাদ গণলেন। বললেন—তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

এখানে বলা প্রয়োজন প্রেমার্ত বন্ধুটি দ্বীপান্তরে বারো বছর না কাটালেও তাঁর গায়ে ছিল স্বদেশী গন্ধ। কাজেই কর্তার জানিত লোক বলে হয়তো বা তাঁর ভয়ে কিংবা তাঁর প্রতি ভক্তিবশত প্রেমচর্চা হতে বিরত হবেন, এইরকম দৃঢ় বিশ্বাস অবিদাদের ছিল। কিন্তু বন্ধুটির বরাত ভালো, তাই সব ষড়যন্ত্র গেল ভেস্তে! নবীনা, সঙ্গীত-মুখরা, বিলোলকটাক্ষ-বিভূষণাকে হৃদয়াসনে বসিয়ে তিনি ধন্য হলেন!

আমারও জীবনের এক অধ্যায় শেষ হলো। আমার দুর্দিনের অবলম্বন আর রইলো না।

বাস্তব জীবনের সমস্যা কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে আসে। মনে হয় একটা লঘু চিত্তবিলাসের চাঞ্চল্যে কাঠিন্য দানা বাঁধছে। সাহিত্যের বাতিক কিংবা সাহিত্যিকের প্রীতিতে তো আর পেট ভরবে না। আর শুধু নিজের পেট ভরালে হবে না, আরো পাঁচ জনের শূন্য পেট ভরাবার দায়িত্ব যে আমারই। কাজেই চিন্তারেখা ঘনায় ললাটে!

দু'একটি টিউশনি ইতিমধ্যে জুটিয়ে কোন প্রকারে দিনাতিপাত করতে করতে বছর খানেক কেটে গেছে, এমন সময় একদিন আমার মেসের মধ্যে এলেন এক ভদ্রলোক আমারি খোঁজে। কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি। একটি সুপাত্র তাঁর চাই। তাঁর কন্যার ভরণ-পোষণের ভার নেওয়ার পক্ষে এ-হেন যোগ্য পাত্রটির সন্ধান তিনি কোথায় পেয়েছিলেন কে জানে! সব দিক

দিয়ে বিচার করে দেখলে এই পাত্রটির পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দেওয়া একটা লাঙ্গুল ছাড়া আর কিছুই ছিল না; তৎসত্ত্বেও তিনি বোধ হয় ঐ লাঙ্গুলটির মধ্যেই ভবিষ্যতের অনন্ত সম্ভাবনা লুক্কায়িত আছে মনে করেছিলেন। তাই তিনি কোন বাধা মানলেন না, আর যিনি বাধা দেবেন তিনিও হঠাৎ এমন পিতৃমাতৃভক্ত হয়ে উঠলেন যে, দেখলে মনে হয় না এই কলিযুগে এমনটি সম্ভব। মা-বাবা বলেছেন যখন, তখন আমার আর কি বলবার আছে—এমন সুবোধ বালকের উক্তি বোধ হয় শতকরা নিরানব্বই জনের মুখেই শুনা যায় এই রকম বিশেষ ক্ষেত্রে! আমি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হতে পারিনি।

বাঙালীর ছেলের শুধু জন্মে পার পাওয়া যায় না, বিবাহ না করে পার নেই। সুতরাং এই বিবাহ নামক পুণ্য কার্যটি সেরে ফেললাম। একটা অনাস্বাদিত জীবন, কল্পনার কত রঙিন স্বপ্ন দিয়ে তাকে গেঁথে গেঁথে তুলি; বাস্তবের দুর্বার খরস্রোতকে দূরে ঠেলে দিই পাছে আমার গাঁথা স্বপ্নগুলি ধ্বসে যায়।

দুঃসহ নিঃসঙ্গতার মাঝে নতুনের প্রতি আকুলতা হয়ে ওঠে উগ্র। হোক সে নিষ্ঠুর, নির্মম; তবু যে নতুন। নতুন পরিবেষ্টনীর মাঝে ধরা দিয়ে দেখাই যাক্ না কি সে নতুন অভিজ্ঞতা—যুক্তি দিয়ে এ মনোভাবকে রোধ করতে পারিনি।

জীবনপ্রবাহ আমার কল্পিত সৃষ্টির পথ ধরে চলেনি। আমার বিবাহের পর দু'মাসের মধ্যেই দেশবন্ধু এ-ধরাধাম ত্যাগ করে গেলেন। তাঁর জন্যে চোখের জলে বুক ভাসিয়েছি। আমার সে চোখের জলে সত্যই আন্তরিকতা ছিল। দেশবন্ধুর আশা ছিল উপেন বাঁড়ুজ্যেকে তিনি আবার পাবেন শীঘ্রই সখা ও সহকর্মী হিসাবে। তাঁর সে আশা সফল হবার আগেই তিনি চিরদিনের জন্যে চোখ বুজলেন।

দেহটাকে ধরে রাখতে না পারলে মনটা পীড়িত হয়ে পড়ে। কাজেই দেহ সচল রাখবার জন্যে অর্থোপার্জনের চেষ্টায় নেমে গেলাম। যে দিকে আপ্রাণ চেষ্টা করেছি সে দিক থেকে নৈরাশ্য ছাড়া আর কিছু পাইনি।

যেখানকার কথা কখনো মনে করিনি, মনে করবার হেতুও কিছু ছিল না সেইখান থেকে ডাক পড়লো। কি করে সম্ভব হলো এবং কে এই যোগাযোগের সূত্র তা ভেবে লাভ নেই। তবে সে ডাক যে সত্য, তা বুঝতে পারলাম। আর্য পাবলিশিং হাউসের ম্যানেজারির ভার আমাকে নিতে হবে। তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলাম। যা হোক একটা হিল্লে তো হলো।

আর্য পাবলিশিং হাউস একটা বইয়ের দোকান। এইখান থেকে প্রধানত শ্রীঅরবিন্দের বই প্রকাশিত হয়ে থাকে; সেই সঙ্গে প্রকাশনার কাজ আরো কিছু আছে। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের উপর ছিল এই দোকানটি। আমার জীবনের উত্তরকালের একটা নূতন দিকের পত্তন এইখানে যে কোন্ অদৃশ্য শক্তি করলেন, তা তখন কিছুই টের পাইনি। জীবনের অনেকটা পথ এগিয়ে এসে এখন পিছন ফিরে সেই দিকে তাকিয়ে অবাক্ হই। কত মহারথীর পায়ের ধূলো যে আমার আর্য পাবলিশিং হাউসের আস্তানায় পড়েছে এবং কত বিচিত্র ইতিহাস এইখানে তৈরী হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই। সে প্রসঙ্গ থাক। কারণ, সে প্রসঙ্গ তুলে ধরার ক্ষেত্র এটা নয়।

একদিন বসে আছি এই দোকানে। দুপুর গড়িয়ে গেছে, দেখি হঠাৎ উপেনদার প্রবেশ। একেবারে অপ্রত্যাশিত নাটকীয় ঘটনা। সেটা ইং ১৯২৭ সাল।

ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন—এই, চাকরি করবি?

—চাকরি! কোথায়?

—ফরওয়ার্ড অফিসে রে, যে চুলোয় আমি আছি।—করবি তো আয় আমার সঙ্গে। বাংলা কাগজ শীগ্‌গিরই বেরুবে।

কিছুকাল আগে যখন তিনি জেল থেকে বার হয়ে আসেন তখন একবার দেখা করেছিলাম তাঁর সঙ্গে। তারপর দেখা হয়নি অনেক দিন। তিনি ফরওয়ার্ড অফিসে যোগ দিয়েছেন এবং রীতিমত কলম চালাচ্ছেন এইটুকুই জানতাম। ইতিমধ্যে অবিশ্যি কানে ভেসে এসেছিল যে ফরওয়ার্ড

অফিস থেকে একখানা বাংলা দৈনিক কাগজও বার হবে। বার হবে—হবে; সেখানে আমরা পাত্তা পাবো কি করে? কল্পনাও করিনি সেখানে সাহস করে যাওয়া যায়! আর কেনই বা যাবো? দৈনিক কাগজে কাজ করার মতো অভিজ্ঞতা আমার কোথায়? সুতরাং উপেনদার কথাও মনে আসেনি কখনো।

উল্লসিত হয়ে উচ্ছ্বাস করবো কি, আমার কেমন যেন ভয় হলো। সঙ্কুচিত হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম।

তিনি আমার মনের ভাব বুঝে আশ্বাস দিলেন—ভাবতে হবে না রে ছোঁড়া, করবি কিনা বল্?

চোখে-মুখে তাঁর স্নেহের হাসি। আবার সে দরদী বন্ধু ও শুভার্থী উপেনদাকে পেয়ে কৃতজ্ঞতায় আমার প্রাণ ভরে গেল, সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমি সেদিন পাইনি। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আমি তাঁর অনুসরণ করলাম। তিনি আমাকে নিয়ে গিয়ে সরাসরি সত্যরঞ্জন বক্সীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বসিয়ে দিলেন। সত্যরঞ্জন বক্সীই তখন সম্পাদক।

আমরা যে সময়ে খবরের কাগজে ঢুকি সেই সময় বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে পঞ্চপাণ্ডবের (Big Five) রাজত্ব চলছে, কিন্তু তাঁদের সারথি নেই। সারথি দেশবন্ধু বছর দুয়েকের মধ্যে সারা ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলায়, একটা তোলপাড় সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রচণ্ড আঘাতের ফলে ইংরাজ শাসনের ইমারতটার নানা স্থানে ফাটল ধরলো। ইংরাজ আবার নতুন করে ভাবতে শুরু করলে কি করা যায়।

দেশবন্ধু স্বরাজ দল গঠন করে বাংলার ব্যবস্থা-পরিষদ দখল করেছিলেন। মন্ত্রী সুরেন বাঁড়ুজ্যের নতুন ছাঁচে-ঢালা কলিকাতা কর্পোরেশনও এলো তাঁর আয়ত্তে। সুভাষচন্দ্রকে কর্পোরেশনের প্রধান কর্মসচিব করে তিনি বসিয়ে দিলেন—ইং ১৯২৪ (এপ্রিল) সালে। সুভাষের কর্মশক্তি ছিল অদম্য, অনন্যসাধারণ। গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের আদর্শ তাঁর জীবনে

প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল, কিন্তু সে বেশি দিনের জন্য নয়। ইংরাজ শাসনের জৌলুস ম্লান হয়ে আসছিল, সে কি সহ্য করা যায়? তাই ইংরাজ তাঁকে মাস সাতেক পরেই চালান করে দিলে একেবারে বঙ্গোপসাগরের ওপারে বর্মা অঞ্চলে মান্দালয়ে। দেশবন্ধুর একজন যোগ্য সেনাপতিকে এইভাবে ঘায়েল করে ইংরাজ খানিকটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লে। দেশবন্ধু মর্মান্তিক ব্যথা পেলেন, কিন্তু দমেন নি। তখনকার দিনে রাজনীতির খেলা ছিল—যদি একজন বসে ডালে তবে আর একজন বেড়ায় পাতায় পাতায়। দেশবন্ধু কর্মের আবর্তের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে ইংরাজকে নাজেহাল করার জন্যে প্রাণপণে পরিশ্রম করতে লাগলেন। অমানুষিক পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য গেল ভেঙে; ফলে ইং ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন তাঁর দেহ গেল পঞ্চভূতে মিলিয়ে। সুভাষচন্দ্র তখনো মান্দালয়ে।

সুভাষচন্দ্র যখন কর্পোরেশনে তখন দৈনিক ফরওয়ার্ড কাগজের বহুল প্রচার। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাংলা দৈনিক কাগজের প্রয়োজনীয়তা তিনিই অনুভব করেন, কেননা বাংলার আপামর সাধারণের মধ্যে তাঁদের কর্মপন্থা চালু করতে হলে ও-ছাড়া গত্যন্তর নেই, ইংরেজী জানা লোকের সংখ্যা তো মুষ্টিমেয়। মান্দালয় জেলে বসেও সুভাষ তাঁর এ পরিকল্পনার কথা ভাবছিলেন। ভাবছিলেন দেশে ফিরলেই এবার তিনি তাঁর এ পরিকল্পনাকে রূপ দেবেন। কিন্তু তাঁর সেদিন আসে কই? এই সময় তাঁর দেশে ফিরবার আকুলতা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর কোন বন্ধুকে লেখা একখানি চিঠিতে:—

প্রাতে অথবা অপরাহ্নে খণ্ড খণ্ড শুভ্র মেঘ যখন চোখের সামনে ভাসতে ভাসতে চলে যায়, তখন ক্ষণকালের জন্য মনে হয় মেঘদূতের বিরহী যক্ষের মত তাদের মারফৎ অন্তরের কথা কয়টি বঙ্গ-জননীর চরণপ্রান্তে পাঠিয়ে দিই। অন্তত বলে পাঠাই—বৈষ্ণবের ভাষায়—

"তোমারই লাগিয়া কলঙ্কের বোঝা
বহিতে আমার সুখ।"

উপেনদা ইং ১৯২৬ সালে মুক্ত হয়ে এলে যেন নতুন করে কর্মে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দিল। সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল তিনি তাঁর বাংলা দৈনিক

চালাবেন স্রেফ তরুণদের দ্বারা। সংবাদপত্র চালনার অভিজ্ঞতা না থাকলেও চলবে, কিন্তু থাকা চাই লিখবার শক্তি। একটা তরুণ সাংবাদিক দল তৈরী করবার ইচ্ছা তাঁর হয়েছিল প্রবল। ১৯২৭ সালের মাঝামাঝি সুভাষ এলেন মান্দালয় থেকে মুক্ত হয়ে। অতঃপর তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা চলতে লাগলো বাংলা দৈনিক প্রকাশের আয়োজনে। তাঁকে সাহায্য করলেন পঞ্চপাণ্ডব (শরৎ বোস—বিধান রায়—নলিনী সরকার—নির্মল চন্দ্র—তুলসী গোঁসাই)। শীঘ্রই এই কাগজ প্রকাশিত হবে এবং সেই সঙ্গে চালু হবে উপেন বাঁড়ুজ্যের সাপ্তাহিক কাগজ 'আত্মশক্তি' এই ফরওয়ার্ড অফিস থেকেই। সুভাষের ইচ্ছানুযায়ীই এই কাগজখানার স্বত্ব ফরওয়ার্ড কোং কিনে নিয়েছিলেন।

বাংলা দৈনিকের নাম ঠিক হয়েছিল 'বাংলার কথা'। উপেনদা আমাকে নিয়ে গিয়ে বসালেন এই কাগজেই। ফরওয়ার্ড-সম্পাদক সত্য বক্সীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেলে চেয়ে দেখি ঘরের এক কোণে একটা চেয়ারে বসে প্রেমেন্দ্র মিত্র আমার দিকে কুৎকুৎ করে তাকাচ্ছে। শক্তিশালী গল্পলেখক। বেঁটে-খাটো বলে একেবারেই ছোকরা মনে হয়। মাথায় ঘন কালো কোঁকড়ানো চুল। কালো ফ্রেমের চশমার উপর দিকটা ছাপিয়ে ছোট দু'টি চোখ উঁকি মারছিল।

আর একটু দূরে দেখি সরোজ রায়চৌধুরী ঘোরাঘুরি করছে। এ-ও তা হলে এখানে! আমার কলেজ হষ্টেলেরই পুরোনো বন্ধু। বি-এ পড়বার সময় নন্-কো-অপারেশন করে পালিয়ে এসেছিল কলকাতায়। ইংরাজের গোলামখানায় গোলাম সৃষ্টিতে আর সাহায্য করবে না, এই প্রতিজ্ঞা করে ঢুকে পড়েছিল ন্যাশনাল কলেজে উপাধিটা সেইখানেই নেবে বলে। সুভাষচন্দ্র ছিলেন এই কলেজের অধ্যক্ষ আর অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন কিরণশঙ্কর রায়, কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ও। স্বল্পায়ু এই কলেজ থেকে সরোজ বোধ করি বি-এ (ন্যাট) হয়ে এইখানে শেষ পর্যন্ত গ্যাঁট হয়ে বসলো। সরোজ কলেজ থেকে পালিয়ে আসবার পর তার শিক্ষার বিশেষ কোন রূপান্তর যদিও হয়নি তবে সে শিক্ষার আগে একটা গাল-ভরা

বিশেষণ যুক্ত হয়েছিল, সেটা হলো 'ন্যাশনাল' অর্থাৎ জাতীয়। পরে গোলামির বাজারে ন্যাশনালের কেউ পাত্তা দেয়নি, কিন্তু তাতে সরোজের কি? সে তো আর কোথাও গোলামি করতে যাচ্ছে না; সে এখানে এসেছে দেশসেবক হিসাবে।

তারপর দেখলাম গোপাল সান্যালকে। এঁকে আমি আগে আরো অনেকবার দেখেছি উপেনদার কাছে এবং শচীন সেনগুপ্তের ওখানেও। উপেনদা জেলে গেলে প্রথমে শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে সহযোগিতায় এবং শেষে বোধ হয় একাই ইনি কোনপ্রকারে 'আত্মশক্তি'টা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন।

আমার জানা-চেনার মধ্যে বিশেষ করে তখন এই তিনজনই। আমরা প্রায় সমবয়সী।

আমাদের সম্পাদকীয় দল সব যে দিন মিলিত হলাম সে দিন আট দশ জনের মধ্যে বয়সে একটু বেশির মধ্যে দেখলাম পঞ্চশিখ ভট্টাচার্য, রজনী মুখোপাধ্যায় আর ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে। পঞ্চশিখ ভট্টাচার্যের নিজের একটা প্রেস ছিল এবং একখানা কাগজও তিনি চালাতেন, কিন্তু সে সব ডুবিয়ে দিয়ে শেষে এইখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন।

আমাদের মধ্যে দৈনিক কাগজ চালাবার অভিজ্ঞতা ছিল ফণীন্দ্রনাথের। ইনি ছিলেন 'বসুমতী' কাগজের সংবাদ-বিভাগের সম্পাদক। একটা পাকা পোক্ত লোক এখানে বসালে তবে ছোকরাদের সকলকে গড়িয়ে পিটিয়ে নেওয়া সহজ হবে।

ফণীন্দ্রনাথ ছাড়া আরো দু'এক ব্যক্তি এসেছিলেন যাঁদের দৈনিক কাগজ চালাবার স্বল্প অভিজ্ঞতা ছিল।

তবে ফণীন্দ্রনাথের কাছেই হলো আমাদের অধিকাংশের হাতে-খড়ি। মোটা-সোটা মিষ্ট প্রকৃতির লোক, সদা সহাস্যমুখ। ইংরেজী সংবাদের কি ভাবে অনুবাদ করতে হয়, হেডিং কি রকম হওয়া উচিত, সংবাদের গুরুত্ব বুঝে তাকে ফলাও করতে হয় কি ভাবে, সংবাদ সাজাবার রীতি কি রকম ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় তিনি প্রথমে আমাদের অনেককেই হাতে ধরে শিখিয়েছিলেন।

থিয়েটারের আগে যেমন রিহার্সেল তেমনি 'বাংলার কথা' বার হবার আগে দিন পনেরো ধরে রিহার্সেল চলেছিল। আচার্য ছিলেন ফণীন্দ্রনাথ। আর তাঁরও উপরে ছিলেন সত্য বক্সী এবং উপেন বাঁড়ুজ্যে। আমাদের কাগজ বার হয়ে গেল। মন্দ হলো না; তবে একটু আধটু ত্রুটি যে হয়নি তা নয়, তার জন্যে উপেনদার মৃদু তিরস্কার সইতে হয়েছে; বলে দিয়েছেন সাবধান হতে। সংবাদপত্রে কাজ করতে হলে হাত চলবে দ্রুত, কিন্তু সেই সঙ্গে মনটা থাকবে সব সময় সচেতন, তবেই ভুলচুকের সম্ভাবনা হবে কম।

সত্য বক্সী কোন দিন বাংলায় কিছু লিখেছেন কি না জানি না, তবু আমাদের কাগজে তাঁরই নাম প্রকাশিত হলো সম্পাদক হিসাবে। ছোট্ট বেঁটে লোকটি। দাঁড়ালে বোধ করি প্রেমেনকে ছাড়িয়ে উঠতে পারতেন না। ভিতরে আগুন থাকলেও বাহিরটা দেখে একেবারেই ধরবার উপায় নেই; সরল, অনাড়ম্বর চেহারা। দুর্দান্ত ফরওয়ার্ড কাগজের সম্পাদক হিসাবে যেন মোটেই মানাতো না। আমার যেন কেমন লাগতো। ভাবতাম সম্পাদক হিসাবে উপেনদার নাম থাকলেই বোধ হয় মানান-সই হয়। একদিন জিজ্ঞেস করলাম উপেনদা'কে—কেমন লেখেন উনি? উপেনদা বললেন—চমৎকার। বেশ লেখে রে! দেখলাম এ জন্যে উপেনদার কোন আত্মক্ষোভ নেই; সত্য বক্সীর প্রতি তাঁর প্রীতি গভীর।

সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'র ভার নিয়ে কিছুদিন পরে শচীন সেনগুপ্ত এসে যোগ দিলেন আমাদের দলে। বলা বাহুল্য, উপেনদাই তাঁকে আনিয়েছিলেন।

১৯নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের পুরানো বাড়িটায় দু'খানা দৈনিক আর একখানা সাপ্তাহিক কাগজ তখন বার হতে লাগলো। নীচে রোটারি মেসিনের গম্‌গম্‌ আওয়াজে বাড়িটা যেন কাঁপতো, কেউ কেউ বলতো বাড়িটা সিপাহী বিদ্রোহের আমলের। সে যাই হোক, বাড়িটার বয়েস যে অনেক সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। বাড়ির মালিক বাঙালী হলেও বাঙালীর বাসের উপযোগী করে এটা তৈরী হয় নি। ঘর-দোরের যা ব্যবস্থা তা ছিল বিলাতী ছাঁচের। হয়তো সাহেব পাড়ায় বাড়ি বলেই সাহেব পোষার জন্যে

এটা তৈরী হয়েছিল। গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল তো একেবারে এর সামনে বললেই হয়।

দোতলায় পাশাপাশি তিনখানা ঘরে আমরা বসি। একখানা ঘরে 'বাঙ্গলার কথা'র সম্পাদকীয় বিভাগ; মাঝখানে প্রকাণ্ড হলঘরটায় ফরওয়ার্ডের সহ-সম্পাদক দল; তারপরে সত্য বক্সী, উপেনদা এবং সত্য বক্সীর আরো দুইজন সহযোগী। উপরে তেতলার একটা ঘরে আত্মশক্তি-সম্পাদক শচীনদা। ধীরেন সেন (অধুনা ডাঃ) ফরওয়ার্ডের বাণিজ্য-সম্পাদক ছিলেন, ইনি দোতলায় ঐ হলঘরটার একপাশেই বসতেন।

ফরওয়ার্ড অফিসে ঢুকে অতঃপর আমি দুকূল রক্ষা করার ব্যবস্থা করে ফেলেছি। আর্য পাবলিশিং হাউসের দোকান ঘরের পিছন দিকে আর একটা গোল ঘরে আমার থাকবার ঘর। ঐখানেই থাকি। বেলা দশটা থেকে দুইটা পর্যন্ত ম্যানেজারি করি, তারপর যাই কাগজের অফিসে। নতুন বন্ধু-বান্ধবকে নিয়ে নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে মত্ত হয়ে উঠেছি।

ঘড়িতে দুইটা বাজতে না বাজতেই মনটা চঞ্চল হয়ে উঠে। কাগজের অফিসে ছুটে যেতে চাই। কাগজের অফিসের মজা এই যে, এখানে কাজ ও আড্ডা বিশেষ করে সম্পাদক মণ্ডলীতে এমন অদ্ভুতভাবে সামঞ্জস্য রেখে চলে যে, দেখলে অবাক হতে হয়। আড্ডাটা বিকেল বেলার দিকটায় জমে বেশি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা চলে, বেলা চারটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত প্রায়ই একটানা আড্ডা। সে আড্ডার প্রধান পাণ্ডা উপেনদা। গোড়ার দিকটায় কিছু লঘু রকমের কাজ সেরে নিয়ে ঐ সময়টায় যাতে একেবারে গা ঢেলে দিতে পারি তার জন্যে আকুলতা ছিল অতিমাত্রায়। এতবড় একটা কাগজের অফিসে ঐ একটি লোক ছিল যেন সকলের আকর্ষণ। একঘেয়ে একটানা কাজের মধ্যে অফুরন্ত হাস্যরসের ফোয়ারা ছেড়ে দিয়ে তিনি সকলের মধ্যে প্রাণশক্তি সঞ্চার করতেন।

যৌবনটা পথে ঘাটে আর দ্বীপান্তরে কাটিয়ে দিয়ে লোকটি যদিও বা মুক্তি পেয়ে একটু ঘরকন্নায় মন দিলেন, অমনি আবার ইংরাজ তাঁকে বছর তিনেকের জন্যে দিল আটকে জেলে। কিন্তু তাঁর মুখের হাসি তো কই

ম্লান হয়নি! এই অদ্ভুত বস্তুটি তাঁর সাধনালব্ধ। হয়তো আবারও যেতে হবে তাঁকে জেলে; কিন্তু তাঁর হাসি কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। উপেনদা বলতেন—বিধাতা ঐ বস্তুটি তাঁকে কেন জানি ভুল করে দিয়ে ফেলে বিপদে পড়ে গেছেন; বলতেন—ভাই, ঐটুকু আছে বলেই তো বেঁচে আছি; নইলে বাঁচার কোন অর্থ পাইনে।

ধীরে ধীরে বেশ জমে উঠছে। এ-ঘর ও-ঘরের ব্যবধান দূরে সরে গিয়ে একাকার হতে চললো। শুধু তাই নয়, কে যেন ঢেউ দিয়ে দিয়েছে, আর সে-ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠে উপরতলায় ঘা মেরেছে, আবার গড়িয়ে গিয়ে ছল্‌কে উঠেছে নীচের তলায়। এ ঢেউ দিয়েছিলেন উপেনদা। তিনি তাঁর চিত্তের মাধুর্য দিয়ে এই বিরাট সংবাদপত্রের অফিসটা রসে ভরিয়ে তুলছিলেন। চোখের সামনে দেখছি একটি নতুন গোষ্ঠী তৈরী হয়ে উঠছে যারা কর্মক্লান্তিকে দাসত্বের পীড়া বলে মনে করে না, মমত্ববোধে সবটি সাধন করে যায় আনন্দে। শাসন কাউকে করতে হয় না অথচ প্রীতির শাসন উপেক্ষা করবে কে? ফাঁকি দেওয়ার প্রবৃত্তি কারো জাগে না; সময়ের অপব্যবহার যে করে ফেলেছে হয়তো একটু বেশীক্ষণ নিরর্থক তর্ক চালিয়ে, সে আপনা-আপনিই সময়ের ক্ষতিপূরণ দিয়ে যায়—অথচ তার উপর কোন রক্তচক্ষুর দাবি নেই। এই সমস্তটাই দেখলাম একটি লোকের সৃষ্টি—সে ব্যক্তি উপেনদা।

আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছিলাম এই সময়। উপেনদার সামনে কোন ব্যক্তিকে বিনা হাসিমুখে তো দেখা যায় না। হোক সে দুষ্টপ্রকৃতির, হোক সে কুটিল, হোক সে ক্ষুদ্রচেতা কিংবা যাই হোক না কেন, তাকে অন্তত উপেন বাঁড়ুজ্যের সামনে দাঁড়াতে হবে হাসিমুখে।

কলিং-বেল বেজে উঠেছে কয়েকবার। বেয়ারা আসতে দেরি করে ফেলেছে। উপেনদার সাম্‌নে হাজির হতেই তিনি বলে উঠলেন—কি বাবা দন্তরুচিকৌমুদী! তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে যাচ্ছে বাপ!

ছাতি তো ফাটে কিন্তু উপেন বাঁড়ুজ্যের মুখে হাসি ঠিক ফুটে রয়েছে! হাসিমুখে এ কিসের তিরস্কার? বেয়ারা মনে করতো সেবা যদি করতে হয়

চিরকাল তবে এমনি লোকের। নিজের কর্তব্যে কি আর কোনদিন ক্রটি হবে তার? অন্তত উপেন বাঁড়ুজ্যের কাছে এ ক্রটি নিয়ে সে হাজির হতে পারবে না।

চারিদিকে প্রীতির বাঁধনটা বেশ শক্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু যাঁর অদম্য শক্তির দ্বারা এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটির এমন চমৎকার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে তিনি যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছেন। তাঁকে তো সহজে দেখতে পাচ্ছিনা, সব চালু করে দিয়ে বাইরের কাজে কি তিনি এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যে, এখানে এসে নবাগতদের সঙ্গে ভালো করে মিশবার সুযোগ এখনও পাচ্ছেন না তিনি? আমরা ব্যাকুল হয়েছিলাম। এমন সময় অকস্মাৎ একদিন আবির্ভাব হ'লো সুভাষচন্দ্রের।

সেই দিব্যকান্তি সুহাস সুভাষ, চেরী প্রেসে প্রথম যে কচি কোমল মুখখানা দেখেছিলাম তাতে ঈষৎ কাঠিন্যের ছাপ পড়েছে। ত্বকের বর্ণাঢ্যতায় ঔজ্জ্বল্য কিছুটা ম্লান। আম্রমঞ্জরীতে যেন ফলের আভাস দেখা যায়।

সারথির পাশে যে সেনাপতির রণোন্মাদনা দেখেছি তিনি কি আজ সারথির বিচ্ছেদ-ব্যথায় আতুর? কোন দৃঢ়প্রত্যয় চিত্তের অভ্রান্ত নির্দ্দেশের জন্যে কি তিনি অপেক্ষমান? না, তমসাচ্ছন্ন নিশায় প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকবার ধর্ম তো তাঁর নয়, দিনান্ত বেলায় একটি ভাস্বর তারকা তার স্বভাবদ্যুতিকে ফুটিয়ে তুলছে। মনে হল শুধু তাঁর নিজের উপলব্ধি নয়, আর সকলকেও তিনি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন—

"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।"

এঘরে ওঘরে উপরে নীচে আমরা প্রায় সব একাকার করে ফেলেছি। কিছুদিনের মধ্যে পারস্পরিক হৃদয়ের বিনিময়ে একটা নির্মল স্বচ্ছতা সুন্দর একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কোথাও একটু আধটু ক্ষুদ্রতা বা মালিন্য দেখা দিলে তা শ্যাওলার মতো ভেসে ভেসে বেড়ায় না, কেমন করে জানি কোথায় তা সহজেই তলিয়ে যায়।

চটুল, লঘু আলাপের আসর বসেছিল দোতলার বড় হল ঘরটায়।

ফরওয়ার্ডের সহ-সম্পাদক দলের মধ্যে ছিল প্রমোদ সেন, শচীন সেন, চপলা ভট্টাচার্য আর সত্যেন বসু। আমাদের ঘর থেকে সরোজ আর আমি; প্রেমেন তখনো এসে পৌঁছেনি। আত্মশক্তি-সম্পাদক শচীন সেনগুপ্ত সবে এসেছেন। জানকীজীবন প্যারা লিখতে বসে আর সামলাতে না পেরে উঠে এসেছেন। কেননা এ-আসরের মধ্যমণি ছিলেন উপেনদা— হাসিয়ে প্রায় সকলকে ভাসিয়ে দিয়েছেন।

এমন সময় এলেন সুভাষচন্দ্র। শুচি, শুভ্র খদ্দরের বেশের সঙ্গে পায়ের পাদুকাও শুভ্রতা ধরেছে। হঠাৎ যেন বিজলী ঝলকে আমরা চমকে উঠলাম। এসেই প্রথমে ডাকলেন—উপেনদা।

উপেনদার সারা মুখখানিতে আনন্দোজ্জ্বল হাসি।

সুভাষচন্দ্র তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন একসঙ্গে সকলের উপর বিস্তার করে দিলেন; কিন্তু তবু সে চোখের দৃষ্টি যেন একটি লোককে একান্তে আহ্বান করছিল। সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন কি বাস্তবের রূপ ধরেছে? তিনি যে-সব তরুণকে নিয়ে তাঁর সাংবাদিক সঙ্ঘ তৈরী করবেন মনে করেছিলেন তারা তাহলে এরাই। হাসিতে খুশিতে যেন এদের একটা স্বচ্ছ প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়! সুভাষচন্দ্র সকলকে দেখে খুশিই হলেন।

চায়ের বাটি ছাড়া কোন ভদ্র আসর জমে এ ধারণা সুভাষচন্দ্র করতে পারতেন না। সত্যই চা-য়ে ছিল তাঁর অত্যধিক আসক্তি। শুনেছি কর্মক্লান্ত জীবনে দিবারাত্রি শুধু আটচল্লিশ কাপ চা গলাধঃকরণ করে তিনি আহার্য সম্বন্ধে নির্বিকার থাকতে পারতেন। শোনা কথা ছাড়া চোখে যা দেখেছি তাতেও তাঁর ঐ কৃতিত্বে সন্দিহান হওয়া দুঃসাধ্য। উপেনদা বললেন - আমি ভাই চায়ের অত ভক্ত নই। তবে এই ছোঁড়াগুলো মাঝে মাঝে কোথা থেকে যেন আনায়, আমাকেও দেয় তার একটু পেসাদ। যা বলেছ, আলাপে প্রলাপে ও অনুপানটা থাকলে মন্দ লাগে না।

উপরে-নীচে সর্বত্র একবার প্রদক্ষিণ করে সুভাষ গেলেন উপেনদাকে নিয়ে একটি ঘরে নিভৃত আলাপের সুযোগ নিতে। সুভাষ স্বল্পভাষী। গম্ভীর আলাপের মধ্যেও হৃদয়ের মাধুর্য মন্দাকিনীর ধারার মতো প্রবহমান।

এক একটি লোক থাকে যারা অপরের মধ্যে প্রাণশক্তি সঞ্চারের অধিকার নিয়ে জন্মায়। সুভাষের ছিল তাই। সুভাষের কর্মশক্তি, উপেনদার আনন্দ; এ দু'য়ের যেন নতুন করে সংযোগ সাধিত হলো। আমরাও পেলাম এক নতুন অনাস্বাদিত জীবনের সন্ধান। সাংবাদিকের জীবনে একটানা প্রবাহে এ কোন্ নতুন তরঙ্গবেগ!

সারা বিশ্বের অগণিত প্রাণের স্পন্দন বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের এই জীর্ণ বাড়িটার তলায় রোটারি মেসিনের বুকে ধ্বনিত হচ্ছে। সুদূর সানফ্রান্সিস্কোতে বিত্তশালী কোন নাগর দম্পতির প্রথম শিশুপুত্রকে কারা যেন রাতারাতি হরণ করে নিয়ে গিয়ে বেনামী চিঠি দিচ্ছে—অমুক ঠিকানায় এক লক্ষ ডলার পৌছে দিলে তবে আদরের দুলালকে তারা ফেরৎ দেবে; বিষুবিয়সের মুখে গলিত লৌহস্রাবের বেগ সম্প্রতি এত দ্রুত হয়েছে যে, চল্লিশ মাইল দূরের বাড়িগুলাও হয়ে উঠেছে লাল;* তুরস্ক থেকে আসছেন হালিদা হান্নুম ভারতের নারীদের ঘুম ভাঙ্গিয়ে উদার গড়ের মাঠের উন্মুক্ত আবহাওয়ায় টেনে নিয়ে যেতে; জাপানের সম্রাট পথে বা'র হবেন একবার রাজোদ্যান দেখবার মানসে, ঐ সময় রাস্তার দু'ধারের পুরবাসীদের জানলার সার্সী বন্ধ হয়ে যাবে, অলিন্দ থেকে কারো উৎসুক নয়নতারা দৃষ্টিগোচর হবে না; অথবা দেবপ্রয়াগে মারা গেছে কয়েক জন তীর্থযাত্রী উপর থেকে ধ্বসে-পড়া কোন্ এক প্রকাণ্ড প্রস্তর ফলকের চাপে! টেলিগ্রামের ভিতর দিয়ে বিশ্বের বহুবিধ বিষয় আসে আমাদের আয়ত্তে, বহুজনের সঙ্গে হয় আমাদের পরিচয়—এ যেন 'তারে চোখে দেখিনি, কিন্তু বাণী শুনেছি।' সাংবাদিকের জীবনে বৈচিত্র্য কম নয়।

লাইনো ঘর থেকে বিজলী বাবু গেলি প্রুফ রেখে গেলেন কয়েকখানা। বিকালে দুই নম্বর 'ডাক' সংস্করণ এই মাত্র ছেড়ে দেওয়া হলো, তাই রোটারি মেসিনটা কিছুকালের জন্যে স্তব্ধ হয়েছে; কিন্তু লাইনোর খটাখট শব্দ চলেছে সমানে। নীচের কম্পোজিটরদের কলরবের সঙ্গে কলহাসের শব্দ ভেসে আসে উপরে। সবটা মিলিয়ে যেন এক আনন্দের সঙ্গীত মূর্চ্ছনা! যাকে গ্রহণ করেছি আনন্দে, আনন্দেই হবে সে বিধৃত—বিসদৃশের মধ্যে সাদৃশ্যের

সুষমায় হবে সে মণ্ডিত। আজ যদি এই মুহূর্তে ঘরের কোণের ঐ জলের কলসীটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো তবে বোধ করি তার মুক্ত জলধারাকেও গ্রহণ করতে পারতাম আনন্দের ধারারূপে।

সুভাষের মোটরখানা হুস্ শব্দ করে উধাও হয়ে গেল, হয়তো বা বৌবাজারের কংগ্রেস অফিসের দিকে। কিরণশঙ্কর রায়কে হয়তো সেখানে পাওয়া যেতে পারে।

ফরওয়ার্ডের নিউজ-এডিটর অনিল রায় ছিলেন অত্যন্ত চাপা লোক। তাঁর সঙ্গে কাজের কথা দু'চারটে ছাড়া বাজে কথা কিছু বলেছি কিনা মনে পড়ে না। তাঁর সামনে দু'হাত দূরে যে সাব-এডিটর কাজ করতেন তাঁকেও কাজ বণ্টন করে দেওয়ার সময় কপির উপর তাঁর নাম লিখে বেয়ারাকে বলে দিতেন—অমুককে। এ-হেন অনিল রায়ের প্রাণেও যে রস ছিল তা আবিষ্কার করেছিলেন আত্মশক্তি-সম্পাদক শচীনদা। শচীনদা যেন বালু সরিয়ে ফল্গুধারাকে টেনে আনতেন।

একটু আগেই সুভাষচন্দ্র এসে চলে গেছেন। ডাক সংস্করণ একটা ছেড়ে দেওয়া হলো। একটু বিশ্রম্ভালাপের অবসর আছে এখন। দেখি, শচীনদা ঘুষিয়ে ঘুষিয়ে অনিল রায়ের কাছে গিয়ে বেশ জমিয়ে তুলেছেন। উপেনদাকেও দু'দণ্ডের জন্যে শচীনদা আটকে ফেলেছেন ওখানে। লোভ সামলাতে না পেরে গেলাম একটু একটু করে এগিয়ে।

শচীনদা অনিল রায়কে দেখিয়ে আমায় বললেন—দেখেছ কবি, ওর চোখ দুটো, কি সুন্দর! কেমন, 'লেডি-কিলার' বলে মনে হয় না?

শচীনদা আমায় কবি বলে ডাকতেন।

অনিল রায়কে তো রোজই দেখি। কালো কুচকুচে রং। টানাটানা দু'টি ডাগর চোখের এতখানি কমনীয়তা ছিল তা তিনি না হাসলে টের পাওয়া যেতো না। লজ্জায় অনিল রায় হেসে ফেললেন। তাঁর লজ্জাটাও ছিল একেবারে স্ত্রীসদৃশ। আমাদের মুখের দিকে আর চাইতে পারছিলেন না। টেবিল-ল্যাম্পের সামনে একটা অপ্রয়োজনীয় টেলিগ্রামের পাতা উল্টাতে উল্টাতে তিনি বললেন—শচীনবাবু, আমি কিন্তু প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

এখানে বলা প্রয়োজন অনিল রায় অবিবাহিত ছিলেন এবং বাংলা মতে বিয়ের বয়স তাঁর অনেক দিন আগেই পার হয়ে গিয়েছিল।

উপেনদা তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন—বর্ণচোরা আম রে, ধরবার উপায় নেই। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন,—কিরে, তুই তো কবিতে-টবিতে নিকিস্; তোদের রবি ঠাকুর না এই রকম একজোড়া হরিণ-চোখ দেখে পাগল হয়ে লিখেছিলেন—"কালো, তা সে যতই কালো হোক—"

শচীনদা ও আমি হো হো করে হেসে উঠলাম।

অনিল রায় প্রায় গলে পড়েছিলেন। ও-ঘরের লোক চমকে উঠে গলা বাড়িয়ে এদিকে চাইলে। ব্যাপার কি? ব্যাপার কিছুই নয়। উপেন বাঁড়ুজ্যে এ ঘরে আছে যে।

উপেনদা আর দাঁড়ালেন না। যাবার সময় হেসে বলতে বলতে গেলেন—শচীন, ব্যাপারটা ভালো নয়। অস্কার ওয়াইল্ডিজমের কাছ ঘেঁষে যাচ্ছে কিন্তু।

পরের দিন দেখি বাথ-রুমের এ-পাশটা কাঠের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা হয়ে গেছে। একটা নেড়া দেওয়াল-আলমারি আগে থেকেই ছিল, তাতে গোটা চারেক তাক বসানো হয়েছে; আর তাদের উপর সাজানো হয়েছে কাপ, ডিস, কেট্‌লি। একটা তোলা-উনুনও বসানো হয়েছে এক কোণে। সব প্রস্তুত। শুনা গেল আজ থেকে এখানে বসেই টেবিলে টেবিলে চা পাওয়া যাবে বিনি পয়সায়। এ সৌভাগ্য সম্ভব হলো কি করে? হয়েছে সুভাষচন্দ্রের কল্যাণে। শরৎবাবুকে তিনি বলেছেন—মেজদা, ছেলেরা বাইরে থেকে চায়ের নামে বিষ পান করবে, সে হবে না। অফিসেই চা-পানের ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। তুমি খরচাটা কোম্পানী থেকেই দিয়ে দিয়ো। সুভাষ ধরেছে যখন, তখন শরৎবাবুর তাতে 'না' বলবার উপায় নেই। সারা দিন-রাত্রি শুধু চা তৈরী করে সরবরাহ করবার জন্যে দু'টি লোককে সুভাষচন্দ্র বহাল করিয়েছিলেন।

এই সময় কিছুদিন বাদে আমাদের মধ্যে দেখা দিলেন কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। এঁর নাম শুনেছিলাম কিন্তু আগে এঁকে চোখে দেখিনি। সুস্থ, সবল দেহ। বলিষ্ঠ দু'টি বাহু আজানুলম্বিত। দৈর্ঘ্যে বোধ হয় সাড়ে পাঁচ ফুটেরও কিছু উপরে। গায়ের রং বেশ ফর্সা। চোখে চশমা। মোট কথা চেহারাটি সুন্দর।

শান্তিনিকেতনে মাষ্টারি করতেন বোধ হয়। কিন্তু শান্তির চেয়ে অশান্তির প্রতিই তাঁর বেশি টান।

লোকটা নন্‌-কো-অপারেশন শুরু হবার পর থেকে বার কতক জেল খেটেছেন। আপাতত জেলে যাবার আর কোন সম্ভাবনা না থাকায় ইনি নিজেকে নিষ্কর্মা বোধ করছিলেন। সাহিত্য করবার কিঞ্চিৎ বাতিক ছিল। জেলে যাবার পথ বন্ধ হওয়ায় এখন সেই বাতিকটা একটু জেগে উঠেছে। তাই খবরের কাগজে এসে যোগ দিলেন কলমটাকে কিছু ধারালো করবার উদ্দেশ্যে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে হাতটা পেকে উঠবে, আবার অবসর সময়ে দুটো চারটে কবিতাও লেখা চলবে মাসিক কাগজের জন্যে। ঘোরতর গান্ধীপন্থী ইনি। দেশবন্ধুর কাগজে তাঁর মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যাহত হবে, তা জেনেও তিনি এখানে আসতে রাজি হয়েছেন, তার কারণ তাঁর না-এসে উপায় নেই। নিছক দেশোদ্ধারের হট্টগোলের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারলে পেটের খোরাকটা যেন কারা জুগিয়ে যায়; আর শেষ পর্যন্ত যদি শ্রীঘরে আশ্রয় পাওয়া যায় তবে তো কথাই নেই। গান্ধীজী স্বরাজদল থেকে নিজেকে গুটিয়ে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন; তাঁর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পালা আপাতত বন্ধ। সুতরাং গান্ধী-পন্থী বিজয়লালের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সুযোগ নেই। কিন্তু পেট নামক দেহের অংশটা আছে অটুট, তাকে যে খোরাক দিতে হয়।

বিজয়লাল একটা রফা করে ফেলেছেন। বলেছেন—মত-পথের কথা এখন থাক, দেখাই যাক না কেন। তেমন যদি দেখি মনটা পীড়িত হচ্ছে, চলে যাব এখান থেকে। কাজ ছাড়তে পারবো না—এমন দাসখত তো আমাকে দিতে হচ্ছে না। প্রয়োজন হলেই ছেড়ে দিতে কতক্ষণ।

মনে হলো বিজয়লাল তা পারেন। তাঁর কথাগুলি দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কবি-হৃদয়ের ভাব-প্রবণতার সঙ্গে তাঁর কর্মশক্তির দৃঢ়তাও ছিল অদ্ভুত ভাবে জড়িত। নন-কো-অপারেশনের যুগে বিপিন পাল চীৎকার করে বলেছিলেন —"Education may wait but Swaraj cannot." এ বাণী বিজয়লালের কানে পৌঁছেছিল; কৃষ্ণনগর কলেজে বি-এ পড়বার সময় পাঠাভ্যাসে ইস্তফা দিয়ে তিনি পথে পথে ঘুরেছিলেন; মুর্শিদাবাদ জিলার গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবার আশাও দিয়েছিলেন সকলকে গান্ধীজীরই মতো। শ্রমের মর্যাদা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে স্টেশন থেকে ভদ্রলোকদের মোট মাথায় করে বয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁদেরকে লজ্জা দিয়েছিলেন; স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখাবার জন্যে মাথায় করে ছানাবড়া ফেরি করে বেড়িয়েছিলেন কলেজের ছাত্রদের মেসে মেসে। জাতের নামে বজ্জাতি দূর করবার জন্যে কোন গ্রামে গিয়ে বক্তৃতা শেষে হিন্দুর বাড়িতে অতিথি না হয়ে ইচ্ছা করে মুসলমানের আতিথ্য গ্রহণ করে গর্ব বোধ করেছিলেন বিজয়লাল।

উপেনদা'র সঙ্গে বিজয়লালের আগে থেকে একটু জানা-শুনা ছিল, তা জানতাম না; অবিশ্যি না থাকলেও বিশেষ কিছু অসুবিধা তাতে হতো বলে মনে হয় না। কারণ উপেনদা'র সঙ্গে পরিচয় তো দু' মিনিটের ব্যাপার। অতঃপর সম্বোধনে তুমি, তারপর দু'দিন বাদেই তুই।

এতদিন বাদে একটা খাঁটি গান্ধী-মার্কা লোক পেয়ে উপেনদা ভারি খুশি। ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে কেবলই ফিকে রসিকতা করে করে তাঁর জিবটা পচে গেছে। মনের মতো ঠুক্‌বার লোক না পেয়ে তিনি যেন ঝিমিয়ে পড়ছিলেন। এইবার অহিংস ভাবে দু'চারটে চোখা-চোখা বুলি ঝেড়ে তবু মুখ বদলানো যাবে। বহুদিন নিরামিষাশী থাকবার পর আমিষের আস্বাদ পাবার আশায় তাঁর ঠোঁট দুটো চুল্‌বুল্ করছিল।

গান্ধীজীর হাঁটু-বার-করা খদ্দরের সামান্য পরিধেয়টুকুর প্রতি ইঙ্গিত করে উপেনদা'ই তাঁর উনপঞ্চাশীতে একবার ভারত উদ্ধারের একটি চমৎকার ফরমুলা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, গান্ধীজী যদি ঐ বালাইটুকুর মায়া

একেবারে ত্যাগ করে রাজপথে বার হয়ে পড়েন এবং তাঁর শিষ্য-সাকরেদরা দলে দলে তাঁরই অনুসরণ করে কুইক মার্চ করে, তবে ভারতে যেখানে যত মেমসাহেব আছে সব এই নব নাগা সন্ন্যাসীদের দেখে 'উ-য়ো-মাই গ্যাড' বলে একেবারে সটান ঐ বোম্বায়ের জাহাজে গিয়ে উঠবে। আর স্ত্রী-ভক্ত সাহেবের দল ছুটবে তাদের পেছু পেছু বিলেত পর্যন্ত। বাস্, কেল্লা ফতে। মনের আনন্দে সমুদ্রের জলে সে সময় টুপ করে দুটো ঢিল ছুঁড়ে ফেলে ঘরে এসে দেখবো ভারত নিঃইংরেজ!

উপেনদা'র বোধ হয় সেই ফরমুলার কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল। বিজয়লালের গায়ে প্রায় গেঞ্জির সগোত্র হাত-কাটা কোমর পর্যন্ত ঝুল-ওয়ালা ঐ খদ্দরের সার্টটি দেখে বললেন—বিজয়, নীচের দিকে নামবার বুঝি সাহস হয়নি, তাই একটু উপরে উঠেছ?

ছোঃ, বলে বিজয়লাল মুখে এক অদ্ভুত রকমের শব্দ করে হেসে উঠলো—হেঃ-হেঃ-হেঃ। হাসিটা অট্টহাস, তবু তা ছিল আলাদা জাতের।

ও-ঘরে যাদের নাম করছি তাঁদের মধ্যে কুলেন পাল ছিলেন সরোজের মতো, ওরফে 'স্মার্ট'। কথা বলবার ভঙ্গিতে ঠিক প্রেমেনের জুড়ি। এই দু'জনকে একসঙ্গে লাগিয়ে দিলে মনের মতো যেন টাট্টু ঘোড়ার জুড়ি চলেছে। যারা অনভ্যস্ত তাদের পক্ষে এদের সঙ্গে তাল রাখা কঠিন হতো। ভবেশ নাগ ছিলেন রোগা খিড়খিড়ে, এজন্যে মেজাজটাও ছিল কিঞ্চিৎ রুক্ষ; সেই হেতু বোধ করি মাথার তালুতে জবাকুসুমের ভাগ পড়তো একটু বেশি, ভিজে চপ্‌চপ্ করতো। মেজাজ রুক্ষ হলেও এঁর কাজ কিন্তু ছিল সূক্ষ্ম। ইনি ইংরেজী ছাড়া ফরাসী ভাষাও চর্চা করেছিলেন কিঞ্চিৎ। আমার মনে আছে একবার রোমাঁ রোঁলা শ্রীঅরবিন্দের নামে তাঁর লিখিত একখানা ফরাসী বই পাঠিয়েছিলেন, ঐ সঙ্গে একখানা চিঠিও তিনি দিয়েছিলেন শ্রীঅরবিন্দের মতামত জানবার জন্যে। এসেছিল আর্য পাবলিশিং হাউসের ঠিকানায়। আমি চিঠিখানি তর্জমা করিয়ে নিয়েছিলাম

ভবেশ নাগকে দিয়ে। রিপোর্টার যতীন মুখুয্যে ছিলেন লম্বা, সুদর্শন। প্রাণে রস থাকতেও রসের প্রকাশ ছিল কম। আড্ডায় রসালাপ হলে তিনি আসর ছাড়তে চাইতেন না সহজে; একটু বিস্ময়বোধ হলে হেসে পূর্ববঙ্গীয় টানে বলে উঠতেন—নাকি? ফেরঙ্গ ইলিয়ট সাহেব ছিলেন চীফ রিপোর্টার। চমৎকার বাংলা বলতেন। এমন অনেক বাংলা প্রবাদ ও ঘরোয়া গল্প তিনি বলতে পারতেন যা আমাদের অবাক করতো। তাঁর সঙ্গে এই যতীন মুখুজ্যে ছাড়া সহকারী ছিল আরো দু'জন; তাদের মধ্যে কালীপদ বিশ্বাস পরে পাকা রিপোর্টার হয়ে প্রায়ই কোট-প্যাণ্ট চড়িয়ে বেড়াতেন বলে আমরা তাঁকে ডাকতাম 'কালী-সাহেব'। অপর ব্যক্তি রসরাজ চৌধুরীর হাতেখড়ি হলো দেখলাম। রসরাজ ছিল বেঁটে গোলগাল। সম্পূর্ণ বর্তুলাকার না হলেও তার নাকটা ছিল থ্যাবড়া ও মোটা এবং মাথাটাও ছিল তেমনি মোটা। মাথাটা মোটা হলেও মাথার ভিতরকার বস্তু তার এমনি সূক্ষ্ম ছিল যে তার জোরে সে ম্যাট্রিক হয়েও চাকরি করতে করতে গোপনে আই-এ পাশ করে, তারপর ইংরেজীতে অনার্স গ্রাজুয়েট হয়ে আমাদের সকলকে অবাক করে দেয়। দুর্গেশ নিয়োগীর মাথার চুলগুলি ছিল উলুখড়ের মতো খাড়া। গোল গোল ভাঁটার মতো দুটো চোখে একটু লক্ষ্মী টেরার ভাব। কথার চেয়ে কাজ তিনি ভালোবাসতেন বেশি। নির্বিরোধ লোক। কোন দিন উঁচু গলায় কারো সঙ্গে দুটো তর্কের কথা বলতে পারতেন বলে আমাদের মনে হতো না। উপেনদা বলতেন—'দুর্গেশ দুমরাজ'। কথাটা মনে করিয়ে দিত রবীন্দ্রনাথের কবিতা—

মারাঠা দস্যু আসিছে রে ঐ
করো করো সবে সাজ।
আজমির গড়ে কহিলা হাঁকিয়া
দুর্গেশ দুমরাজ।

মোহিত মৈত্রের চেহারা ছিল মোহিত করবার মতন। মাথায় একরাশ চুল গায়ের রংকে আরো উজ্জ্বল করতো। তিনি ছিলেন নিশাচর অর্থাৎ ইংরেজীতে 'নাইট-এডিটর'। উপেনদা'র সঙ্গে সত্য বক্সী ও জানকীজীবন

ঘোষ ছাড়া আর একজন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন; তাঁর নাম ছিল উপেন্দ্র নিয়োগী। মাটির মানুষ, সাত চড়েও কথা বলবার প্রবৃত্তি তাঁর ছিল না; দিবারাত্রি তিনি পানের শ্রাদ্ধ করতেন। দাঁতগুলো তাঁর ছিল যেন তরমুজের বিচি। উপেনদা তাঁকে ডাকতেন 'মিতাজী' বলে। বয়সে উপেনদার সমান না হলেও কাছাকাছি হবেন বোধ হয়। তাঁরও চোখ দুটি ছিল ডাগর ডাগর ঢলঢলে। অনিল রায়ের মতো এই প্রবীণ ব্যক্তিকেও শচীনদা তাঁর চোখ দু'টি নিয়ে রসিয়ে তুলেছিলেন। এদিক দিয়ে শচীনদা ছিলেন জহুরী। নিয়োগী মশায় টেলিফোন ধরতে রাজী হতেন না সহজে। সরোজ বলতো, টেলিফোনের চোঙে যদি এক কাচ্চা পানের পিক পড়ে যায় সেই ভয়।

এ ঘরে পঞ্চশিখ মশায়ের মাথায় কিন্তু শিখা ছিল একগাছি। সহজে নয়নগোচর হতো না। এ যুগের রুচির সঙ্গে তাল রাখবার জন্যেই বোধ করি এই শিখাগাছি আত্মগোপন করে থাকতে ভালবাসতো। আমাদের পোড়া চোখে তা কেমন করে ধরা পড়ে গিয়েছিল। গোণাগুনিতে আটটি বিড়ি তিনি একটি দিয়াশলাইয়ের খালি বাক্সে সাজিয়ে আনতেন। ঐ ছিল তাঁর সারা দিনের নেশার সম্বল। তার থেকে কারোর ভাগ পাবার জো ছিল না। যদিও কোন ভাগ্যবান একটি পান করবার সুযোগ পেতো, তা সে পেতো যথাসময়ে ঐটির শূন্যস্থান পূরণ করে দেবার সর্তে। দু'পয়সার একখানি ফারপোর পাকানো রুটি ছিল তাঁর জলখাবার। বাড়ি থেকে একটি কৌটাতে করে চিনি আনতেন সঙ্গে করে খানিকটা। খবরের কাগজের অফিসে সাদা কাগজের অভাব নেই, এক টুকরো কাগজ তিনি সিঙাড়ার মতো করে বেশ বানিয়ে ফেলতে পারতেন—সেইটাই হতো তাঁর চিনি তুলবার চামচ। এক টুকরো রুটি মুখে দিয়ে তারপর চিনি ফেলতেন ঐ চামচে দিয়ে। এমন হাতের মাপ আর কারো দেখিনি। এই ছিল তাঁর নিত্যকার জলখাবার। কারো সাধ্যি ছিল না ঐ চিনির একটু ভাগ পাওয়া। পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতেন, খেতে হলে বাড়ি থেকে আনতে হয়—ভিক্ষাবৃত্তি অনাচরণীয়। পরিষ্কার ভাষায় পরিষ্কার উক্তি। বুঝবার পক্ষে কারো অসুবিধা

ছিল না। নরেশ সেনগুপ্ত ছিলেন খাঁটি ডিসপেপক, রুক্ষটি মেজাজ। বকের মতো গলাটাতে কণ্ঠি চেয়ে থাকতো, যেন একটা হসন্ত। ভদ্রলোক কোন্ কালে তক্ষশিলা সম্বন্ধে গোটা দুই প্রবন্ধ বুঝি 'ভারতবর্ষে' লিখেছিলেন, তার জন্যে তাঁর গর্ব ছিল প্রচুর। সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা না হলে তাঁর মনটা করত খুঁত খুঁত। মুরারি দাস কথা বলবার আগে খানিকটা হেসে নিতেন। এ রকম লোককে কোন প্রশ্ন করায় বিপদ ছিল, জবাব পাবার আগে তাঁর হাসির চোট সামলে ধৈর্য ধরা কঠিন হতো। অনুবাদে তাঁর হাত ছিল বেশ। বিরজা ভট্টাচার্যের কলম চলতো ঝড়ের মতো। আমরা বলতাম গণেশের কলম চলেছে। তাঁর মতে অনুবাদের সৌষ্ঠব নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই; খবরের কাগজের পেট ভরাবার জন্যে এ রকম লোকের প্রয়োজন ছিল খুবই। আর, গিরিজা চক্রবর্তী ছিলেন দেখনহাসি। মানুষের সর্বাবস্থায় এমন নির্মল হাসি আর কারো মুখে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। তাঁর হাসির রকমটাও ছিল অদ্ভুত। পাতিহাঁসের ভয়-পাওয়া প্যাঁক-প্যাঁক শব্দ তাতে ছিল না, কিন্তু ছিল যেন তার আহার্য বস্তুতে মুখ ডুবিয়ে আনন্দের বিন্যাস—কট্‌কট্‌-কট্‌কট্‌, কট্‌কট্‌-কট্‌কট্‌! এ হাসির উৎসমুখটা ছিল একদম খোলা। বিধাতা বোধ করি তা বন্ধ করবার কায়দাটা তাঁকে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। আমাদের রিপোর্টার ইন্দ্রবাবু ছিলেন অসাধারণ লোক। বয়সে প্রৌঢ় হলেও তাঁর উদ্যম যুবককেও হার মানিয়ে দিতো। সর্টহ্যাণ্ডের বাংলা প্রতিশব্দ বোধ করি রবীন্দ্রনাথের সর্বাগ্রজ দ্বিজেন ঠাকুরের সৃষ্টি, কেন না তিনিই বাংলার রেখাক্ষর রীতির স্রষ্টা ও প্রবর্তক। ইন্দ্রবাবু দ্বিজেন ঠাকুরের প্রবর্তিত রীতি থেকে প্রেরণা পেয়ে স্বয়ং এক নিখুঁত রীতি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর এই রীতি যে কতখানি নিখুঁত তা আমরা প্রথম টের পেলাম একবার রবীন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা প্রকাশের পর। মহাকবি অবাক হয়েছিলেন তাঁর বক্তৃতার এমন যথাযথ অনুলিখন দেখে। তিনি স্বয়ং এ বিষয়ে ঔৎসুক্য দেখিয়ে লোক মারফৎ আমাদের কাছে খোঁজ নিয়েছিলেন, এ অসম্ভব সম্ভব হলো কি করে। অতঃপর আমাদের কাগজের আভিজাত্য বাড়লো, নামটাও

পড়লো ছড়িয়ে। ইন্দ্রবাবুর সে রেখাক্ষর রীতি একান্ত তাঁরই 'ট্রেড-সিক্রেট' থেকে শেষটায় বিলুপ্ত হয়েছে কি না জানি না। বাংলার এ সম্পদ যদি আমরা হারিয়ে থাকি, তবে সত্যই আমাদের দুর্ভাগ্য।

সকলে মিলে আমরা সৃষ্টি করেছি এক আনন্দের আবেষ্টনী। এই আবেষ্টনীর মধ্যে আমরা সত্যিই ছিলাম একটি সুখী পরিবার। আজকাল 'সুখী পরিবার' কথাটা অনেক ক্ষেত্রে শুনতে পাই। কিন্তু আমার যতদূর মনে পড়ে এর প্রথম প্রকাশ আমাদের এখানেই। আর, এই কথাটি শুনলে আমাদের মনের তলে তখন যে ঢেউ আঘাত করতো, সেই ঢেউ ঠিক তেমন করে আর কোথাও এসে লাগে কি না তা আমার পক্ষে বলা শক্ত।

১৯২৮-২৯ ছিল আমাদের ফরওয়ার্ড কোম্পানীর গৌরবময় কাল। এই সময়ে বাংলার কত আন্দোলনের কত ধারা বয়ে গেছে। আমরা করেছি শঙ্খধ্বনি, সেই ধ্বনিতে দিকে দিকে পৌঁছেছে তার বার্তা। দুর্ধর্ষ ইংরাজের দুর্দমনীয় মনে কি শঙ্কার ছায়া পড়ে না? যারা মার খায়, যারা জেলে যায়, যারা করে আর্তের সেবা তাদের দলে যে আমরাও সৈনিক। সকলের যৌথ শক্তি কি ইংরাজের নির্মম শৃঙ্খল ভিন্ন করে আনবে না সেই অতীত দিনের লুপ্ত গৌরব এই মহাভারতের সাগর তীরে? আমাদের ভবিষ্যৎ কি জানি না, তবু এই কণ্টকাকীর্ণ পথে পা বাড়িয়ে যেন উল্লসিত হয়ে উঠি; যেন চোখে পড়ে নিশান্তের আকাশে রক্তিম উষার আভাস অথবা সে ছিল শুধুই আমাদের কল্পনা। তা হোক, তবু কি যেন এক অব্যক্ত আনন্দে মনটা উঠতো দুলে!

১৯নং বৃটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের জীর্ণ বাড়িটায় দেখা দিয়েছিল যেন এক মধুচক্র। কত দেশের কত মধু-সন্ধানী এসে ভিড় করতেন এখানে। আসতেন প্রথিতযশা, স্বল্পখ্যাত অথবা অখ্যাত নেতা ও নেত্রীর দল; আসতেন ব্যবসায়ী, ব্যবহারজীবী; অধ্যাপক ছাত্র-ছাত্রী অথবা কোন উদীয়মানা যশোলুব্ধা বয়সে নবীনা। স্বরাজ্য দলের মুখপত্র এখানে।

কর্ণধারদের মধ্যে দেখা যায় সর্বত্যাগী কর্মযোগী সুভাষচন্দ্রকে। এখানে মধু ছিল বৈকি !

আর আসতেন প্রগতি-পন্থী তরুণ সাহিত্যিকের দল। তরুণ সাংবাদিকদের সঙ্গে তাঁদের যেন ছিল আত্মার আত্মীয়তা।

তখনকার দিনে 'কল্লোল' সাহিত্য-চক্রকে কেন্দ্র করে একদল দুরন্ত কাঁচা লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল যাঁরা ছিলেন সত্যিই শক্তিমান। রবীন্দ্রনাথও শরৎচন্দ্রের মতো দুইটি বিরাট প্রতিভার প্রভাবপুষ্ট যুগে থেকেও তাঁরা তাঁদের রচনা-রীতিতে এনেছিলেন একটি বিশেষ ভঙ্গি, জীবন-রহস্য উদ্ঘাটনের একটি বিশিষ্ট ধারা, এবং সেই হেতুই তাঁরা ঐ দুই সাহিত্য-মহারথীর স্নেহলাভে সমর্থ হয়েছিলেন।

ঐ দলের শৈলজা-প্রেমেন-অচিন্ত্য-প্রবোধ-বুদ্ধদেবের নাম তখন কে না জানে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম শুনেছিলাম আরো পরে। 'রাইকমল' তাঁর প্রথম রচনা কি না বলতে পারি না, কিন্তু তাঁর প্রথম প্রকাশিত এই একটি মাত্র গল্পেই তিনি অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়ে সাহিত্য-জগতের বিস্ময় উৎপাদন করেছিলেন।

ওঁরা ছাড়াও তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে তখন আসতেন অনেকেই। আসতেন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃপেন চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গাঙ্গুলী, মনোজ বসু, কবি হেম বাগচী, কবি জসীমউদ্দিন, পরিমল গোস্বামী এবং আরো কত কে।

রাজনীতিতে যেমন এসেছিল বন্যা—সর্বসাধারণের মনে দেশাত্ম-বোধের তরঙ্গ যেমন উদ্বেল হয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল তেমনি সাহিত্যেও যেন দেখা গেল নবপ্রাণের উচ্ছ্বাস, প্রবীণদের মধ্যে অনেকেই শঙ্কিত হলেন। নবীনের উদ্দাম অশান্ত ভাব নাকি সাহিত্যে দুর্নীতির অবতারণা করে সমাজকে রসাতলে ডুবিয়ে দেবে—এই হলো তাঁদের আশঙ্কা। কেউ বললেন—না, এদের কাছে আছে আশা করবার করবার অনেক কিছু, হলোই বা আদিরসের একটু বাড়াবাড়ি। দুরন্ত তরুণরা কিন্তু সৃষ্টির আনন্দে তখন চলেছে বেপরোয়া। কারণ তাদের কানে বেজেছে—

"রক্ত-আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।"

আরো কত দেশ, কত নতুন পথ। বিস্মিত হই আমরা। সমাজে আমরা যে স্তরের লোক সেই স্তরের মন কোথায় উড়ে যায়, হৃদয়-সমুদ্রে অনন্ত রত্নরাজির কতটুকু বৈভব আমরা উপলব্ধির মধ্যে ধরতে পারি—সে-সবেরই কোন সীমা পরিসীমা না থাকলেও আমরা যেন একটা সীমারেখা টেনে বসে থাকি। অর্থাৎ আমাদের ক্ষেত্রে অপরিসর, দৃষ্টি বেশীদূর প্রসারিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রতিভার ছায়ায় বাস করেও আমাদের দৃষ্টি পড়লো অন্য দিকে। আমাদের চেনা-জানা মানুষগুলির নিত্য আনাগোনার পথ পেরিয়ে অকস্মাৎ হয়তো গিয়ে উঠলাম বর্ণরসহীন এক অনাদৃত, অবহেলিত রাঙা মাটির অঞ্চলে যেখানে পাখির কূজনমুখর বনভূমির ছায়াচ্ছন্ন রূপ হয় না নয়নগোচর; অথচ সেখানেও থাকে এক শ্রেণীর নরনারী—যারা পাতালপুরীর বুক চিরে তুলে আনে অঙ্গার। অঙ্গারের মতোই বহিরাবয়ব তাদের, কিন্তু মুখের স্নিগ্ধ হাসিটির মধ্যে ফুটে ওঠে নিষ্কলুষ চিত্তের নির্দ্বন্দ্ব প্রশান্তি। সৌন্দর্য ও রুচিবোধ এদেরও আছে, এরাও জানে ভালোবাসতে, এদের ভালোবাসায়ও আছে আনন্দ ও বেদনা, কিন্তু কোথাও তো নেই সে আনন্দের মধ্যে কৃত্রিমতা বা বেদনায় অপরিসীম দৈন্য! এদের সঙ্গে তো পরিচয় ছিল না এর আগে। মাটির পৃথিবীর তলদেশে মানুষেরই হাতে নিষ্পেষিত এই সব মানুষ নেমে আসে অদূরে ঐ অপরিচ্ছন্ন কুলি-ধাওড়া থেকে, কিন্তু বিস্ময় জাগায় আমাদের মনে তাদের চিত্তের বৈভব।

একান্ত পরিচিত এই পথ। এই পথের পাশেই ঐ যে রেস্তোরাঁটি রয়েছে, কতবার না চোখে পড়ে ওটি। নতুন চা-পিয়াসীদের মধ্যে কয়েকটা

পরিচিত মুখ যেন নিত্যই দেখা যায়। কেউ বা বেকার, কেউ বা কলেজের ছাত্র, আবার কেউ বা এসেছে ব্যর্থ, তিক্ত পারিবারিক জীবনের আবহাওয়া থেকে দূরে এই কোলাহল-মুখর স্থানেই কিছুকালের জন্যে আত্মস্থ হতে! এদের দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত লাগে রেস্তোরাঁর মালিকের মনের তটে। হয়তো কোন গভীর রাত্রে এইসব সম্মিলিত জীবনের দুঃখ-দৈন্যের একটি মধুর ঐকতান বেজে ওঠে তার ক্লান্ত, ক্লিষ্ট মনে। রেস্তোরাঁর মালিক সীমাহীন, উদাত্ত আকাশের দিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে থাকে কিছুকাল।

সুদূর মফস্বলের এক পল্লীতে ডাকবিভাগের অতি সামান্য কেরানী সে, কিন্তু দুঃখের সঙ্গে সংগ্রামে অসামান্য ধৈর্য তার। সুদীর্ঘ ন'টি বছর কেটেছে তার রুগ্না স্ত্রীর সেবায়—সে যেন যমে মানুষে টানাটানি! দুরবস্থা একেবারে চরমে উঠতে ছুটির জন্যে আবেদন করতে বাধ্য হলো সে, কিন্তু ছুটি মঞ্জুর করলেন না তার উপরওয়ালা। সেই উপরওয়ালা অফিসার এসেছেন পরিদর্শন-সফরে সস্ত্রীক, স্ত্রী সঙ্গে না থাকলে কাজে তিনি উৎসাহ পান না।

হঠাৎ দেখা হয়ে গেল ঐ কেরানীর সঙ্গে তার অফিসারের। বলা বাহুল্য অফিসার-পত্নী সঙ্গেই ছিলেন। কেরাণীর পর্ণকুটীর অদূরেই। সকৃতজ্ঞ আহ্বান জানালে সে তাঁদের উভয়কে। অফিসার এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। পত্নী বললেন—কাছেই তো এসে পড়েছি আমরা। চলো না দেখেই আসি একবার ওঁর স্ত্রীকে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছিল। ঘরের এক কোণে টিম্‌টিম্ করে জ্বলছিল একটা লণ্ঠনের বাতি। চারিদিকে মৃত্যুর ছায়া, তারি মধ্যে দেখা যায় যেন জীবনের ঐটুকু আলো!

ঘরে ঢুকতে গা ছমছম করে। কেরানীর অনুসরণ করে অফিসার-পত্নী ঢুকলেন রোগিণীর ঘরে। অফিসার বললেন, তিনি বাইরেই অপেক্ষা করবেন। বাইরে হাওয়া আছে বেশ।

রোগিণীর বয়স বেশি নয়; শীর্ণ, অস্থিচর্মসার দেহ। রূপ নেই, এবং সে

যে কতখানি রূপহীনা তা এই স্তিমিত আলোকে এই পর্ণকুটীরের বুক-চাপা দারিদ্র্যের ভিতরে বসে না দেখলে বুঝা যায় না।

রোগিণীর কোন সাড়া নেই। নবাগতাকে সে দেখতে পায়নি, কারণ সে চোখে দেখে না যে! সারা মুখখানিতে বসন্তের ক্ষতচিহ্ন, বোধ করি ঐ রোগেই সে হারিয়েছে দৃষ্টিশক্তি।

একবার একটি বিকট শব্দ শুনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে রোগিণীর দেহটা গেল বেঁকে। কেরাণী নবাগতাকে জানালে, ও কিছু নয়। ওঁর আবার মৃগীরোগও আছে কি না। আরো বললে, একদিন বিকারের ঘোরে রোগিণী তার হাতের একটা আঙুল কামড়ে দিয়েছিল। হাসপাতালে গিয়ে তাকে এই আঙুলটা বাদ দিয়ে দিতে হয়েছে। এই দেখুন না—বলে সে নবাগতাকে আঙুলটি দেখিয়ে হাসলো—পরিচ্ছন্ন সে হাসি। এই হাসিটুকুর মধ্যে কোথাও ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, বিরক্তি নেই। এই চিররুগ্না কুরূপা স্ত্রী, এই দারিদ্র্য ও স্বজনসহায়হীন দুঃস্থ জীবন—এদেরই আসনের উপর বসে এই শান্ত, নিরীহ মানুষটি যেন কঠিন তপস্যা করে চলেছে। এ সংগ্রাম নয়, সাধনা। একটি অপরিসীম সৌন্দর্যোপলব্ধিতে নবাগতার সর্বশরীরে রোমাঞ্চ দেখা দিল। আকাশের ধ্রুবতারার অচঞ্চলতাকে মনে পড়ে না তার, তার মনে পড়লো প্রভাতসূর্যের প্রথম রশ্মিটির পবিত্রতাকে।

নবাগতার অসহিষ্ণু স্বামীর মুখে বিরক্তির ছাপ। একটা সামান্য লোককে এমনি ভাবে প্রাধান্য দেওয়ার এ কি বদখেয়াল অফিসার-পত্নীর?

সামান্য! নবাগতার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। স্বামীর সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তি তার রুদ্ধ হয়েছিল। কোথায় যেন একটা ব্যর্থতার অসন্তোষ রি-রি করে জ্বলতে লাগলো!

অমনিতরো কত না চিত্র ফুটেছে কল্লোল-চক্রের লেখকদের হাতে। প্রাণবন্ত ভাষায়ও যেন এলো নতুন করে একটা সজীবতা। শুধু ভাষার আভরণ নয়, সেই ভাষার অন্তরালে অতি তুচ্ছ বিষয় থেকে জীবন-বৈচিত্র্যের সত্যকার অর্থটুকু উদ্‌ঘাটন করবার ইঙ্গিতও পাওয়া যেতো ঐ লেখকদের লেখায়।

আমাদের কাগজের প্রতিষ্ঠানটি ছিল প্রগতি-পন্থী। গতানুগতিকার বাঁধ ভেঙে একটা নির্মুক্ত ধারায় একে বইয়ে দিতে চেয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং বিশেষ করে সুভাষচন্দ্র। তাই এই সব তরুণ লেখকের সঙ্গে আমাদের আত্মিক যোগ হয়েছিল স্বাভাবিক। এঁদের অধিকাংশের সঙ্গে আমার পরিচিত হওয়ার সুযোগ হয়েছিল এই কাগজের অফিসে অথবা আর্য পাবলিশিং হাউসে বারবেলা বৈঠকে। এই দ্বিতীয় স্থানটিতে বহু সুধীজনের পদধূলি পড়তো, কিন্তু সে আর এক অধ্যায়। থাক্ সে কথা।

শৈলজানন্দকে দেখেছিলাম স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন যুবা। মাথায় একরাশ ঘন কুঞ্চিত কেশ প্রায় বাবরি ধরনের ছাঁটা। মুখের হাসি টানা দু'টি ডাগর চোখেই ফুটতো বেশি।

তার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে আলাপ করবার প্রথম সুযোগ হয়েছিল বেলেঘাটা অঞ্চলে।

সহকর্মী প্রেমেন একদিন সরোজ রায়চৌধুরী আর আমাকে তার ওখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করলে। বললে—কালীঘাটে নয় কিন্তু, বেলেঘাটায়, বলে একটা ঠিকানা দিয়ে দিলে। তখন পাখিদের নীড় বাঁধবার সময় কি না জানি না, শৈলজানন্দ কিন্তু নীড় বেঁধেছিলেন ঐখানে। আর প্রেমেন্দ্র তার কালীঘাটের নীড় ছেড়ে এসে এই নতুন নীড়ের অংশীদার হয়ে বসেছিল। আমরা কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ করেছিলাম। এ কি তার শৈলজানন্দের প্রতি ভালোবাসা, না দিদিমার সঙ্গে রাগারাগির ফল? প্রেমেনের স্বভাবের মধ্যে ঐ রকম কি একটা ছিল। গড়ে যেমন আনন্দ, ভেঙেও নাকি তেমনি আনন্দ—বলতো সে। দুই বন্ধুতে তখন ভারি ভাব। আমরা বলতাম মাণিক-জোড়।

প্রেমেন আয়োজন করেছিল প্রচুর। চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় রীতিমত ভোজন বিলাস। কোঁচা দিয়ে যে কাপড় পরতে জানে না, কোমরের কাপড়ে একটা অদ্ভুত রকমের গেরো দিয়ে তার উপর কোঁচার কাপড়টা জড়িয়ে রাখে, সেই প্রেমেনের একি কাণ্ড! প্রেমেন তা হলে শুধু 'সাব-এডিটর' নয়।

সাংসারিক বুদ্ধিও [illegible] আছে দেখছি। হুঁ, বলে প্রেমেন আমাদের দিকে মিটমিট করে চায় আর [illegible]

সলজ্জ সঙ্কোচে প্রায় অবগুণ্ঠনবতী প্রেমেনের 'প্রথমা' নিজ হাতে রান্না করে নিজ হাতেই পরিবেষণ করছিলেন। শৈলজানন্দ বসেছিলেন আমাদের সঙ্গে। প্রগতি-পন্থী লেখকের বধূর এই সনাতনী অবগুণ্ঠর দেখেই বুঝি সরোজ কি একটা রসিকতা করে ফেললে। ভদ্রমহিলা আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেই তাঁর আঁচলের চাবির গোছা গিয়ে লাগলো সরোজের মাথায় ঠক্ করে।

হলো তো!

সরোজের লাঞ্ছনায় শৈলজানন্দের হাসি পেয়ে গেল এবং সে এমন হাসি যে, তাঁর প্রায় দম বন্ধ হয়ে যায় আর কি। এই যে! খাওয়াটাই মাটি হবে নাকি? শেষটায় সামলে নিলেন। যাক, সব ভালো যার শেষ ভালো।

সেই মধ্যাহ্নভোজনের দিনটি আমার আজো মনে পড়ে।

জোড় ভেঙে যায়। প্রেমেন আবার নতুন করে জোড় বাঁধে। এবার দেখি প্রায়ই প্রেমেন আর অচিন্ত্যকে। প্রেমেনকে এবার ভাঙার নেশা বুঝি পেয়ে বসেছিল। 'তখন কালবোশেখের উন্মত্ত মসীবরণ আকাশে নীড় ভাঙার মহোৎসব' চলছিল কি না তার খবর অবিশ্যি রাখিনি।

'কল্লোল' ভেঙে যখন দু'খানা হলো অর্থাৎ 'কল্লোল' আর 'কালি-কলম' সেই সময় শৈলজানন্দের সঙ্গে বেশি করে মিশবার সুযোগ হয়েছিল। মুরলীধর বসু 'কালিকলমের' সম্পাদক হলেও তিনি ছিলেন শৈলজানন্দের উপরই প্রধানতঃ নির্ভরশীল। প্রায় তাঁরা আসতেন 'বরদা এজেন্সী'তে। ঐখান থেকে 'কালিকলম' প্রকাশিত হতো। বরদা এজেন্সী আর আর্য পাবলিশিং হাউস তখন পাশাপাশি ঘর। সুতরাং শৈলজানন্দের সঙ্গে প্রায় নিত্য দেখা হতো আমার।

আড্ডা দেওয়ার জায়গা থাকলেই সেখানে অচিন্ত্যকুমারকে দেখা যেতো। এই কিছুক্ষণ আগেই হয়তো দেখে এলাম তাঁকে 'কল্লোল' অফিসে আড্ডা দিতে সম্পাদক দীনেশ দাশ, নৃপেন চাটুজ্যে আর পবিত্র গাঙ্গুলীর সঙ্গে।

নৃপেন মাঝে মাঝে মাথার এক অদ্ভুত ঝাঁকুনির দ্বারা তাঁর ফুলানো ফাঁপানো বাবরী চুলগুলিকে সামনে থেকে পিছনে ফেলবার দুশ্চেষ্টা করলেও কয়েকটা অবাধ্য গোছা কিছুতেই বাগ মানে না দেখে তিনি সেগুলির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করছিলেন আর পবিত্র গাঙ্গুলী সমানে বক্‌বক্ করে বকে যাচ্ছিলেন।

আবার এই এসে হাজির দুম্ করে আর্য পাবলিশিং হাউসে!

হয়ত বললেন—মুরলীদা এসেছেন, মুরলীদা? আসেনি? তবে টুনু?

'টুনু' মানে 'কুসুমের মাস'-এর কবি অজিত দত্ত। পাণ্ডুরবর্ণ ক্ষীণদেহ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। তখন সবে এসেছেন কলকাতায় কর্মজীবন সুরু করতে। অচিন্ত্যকুমারের লম্বা, লিক্‌লিকে চেহারা তখন। কালো কোঁকড়ানো চুলগুলি কপাল থেকে পিছন দিকে পালিশ করে ফেরানো। ঠোঁট দু'টি দৃঢ়তাব্যঞ্জক; চোখে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব পরিস্ফুট। তাঁর তখন চঞ্চল প্রকৃতি হলেও লক্ষ্য করতাম তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠা, তাঁর শৃঙ্খলাবোধ।

প্রায়ই আসতেন মোটা মোটা বই হাতে করে। বোধহয় তখনো তিনি আইনের ছাত্র। তাঁদের দলের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত এবং তিনি এই তিনজনই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। শুধু যে কলেজের বই-ই হাতে থাকতো তা নয়। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতির সাধনাও চলেছে তখন পুরাদমে।

আমার কিন্তু গল্পী অচিন্ত্যকুমারের চেয়ে কবি অচিন্ত্যকুমারকে বেশি ভালো লাগত তখন। উত্তরকালে যে—অচিন্ত্যকুমার তাঁর অনন্যকরণীয় ভাষায় ভাবঘন চিত্তের অনন্ত ঐশ্বর্য প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যকে তুলে ধরেছেন এক সুউচ্চ শিখরে সে-অচিন্ত্যকুমারের বিকাশ তখনো হয়নি।

অচিন্ত্যকুমারের হাল্‌কা সুরের প্রেমের কবিতায় রস পেতাম আমি। এমন অদ্ভুত কোমলতা তিনি সৃষ্টি করতেন যে, তাতে কেমন একটা নেশার আবেশ আসতো। এজন্যে শুধু আমার বয়সটাই যে দায়ী ছিল তা নয়, কাব্যে কোথায় রসসৃষ্টি হয় তার বোধও বোধহয় একটু ছিল। শুধু হাল্‌কা নরম সুরের কবিতায় কি তাঁর কৃতিত্ব? 'অমাবস্যা'র কবির হাতেই ফুটেছে উদাত্ত গম্ভীর সুরের কবিতা। 'পাখি' তাঁর এক ভাব-সম্পদে সমৃদ্ধ অপূর্ব

রচনা। শরৎচন্দ্রের যে জয়ন্তী উৎসব হয়েছিল আমাদের উদ্যোগে, সেই উৎসবে যাঁরা কবিতায় শরৎ-প্রশস্তি করেছিলেন, আমার মনে হয় অচিন্ত্যকুমারের রচনাটিই হয়েছিল সেগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। উদাত্ত-গম্ভীর ছন্দের মধ্যে শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্যটুকু ঘন রসে জমাট। নিখুঁৎ শব্দযোজনায় কড়ি ও কোমলের এমন চমৎকার একাত্মতা ঘটেছে যে, উচ্চারণেই মধুক্ষরণ হতে থাকে।

প্রখ্যাত কবি ও সমালোচক বুদ্ধদেব বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে যখন পাকাপাকি ভাবে কলকাতায় এসে বসলেন তখন আমাদের কাগজের বয়স বেড়েছে। আমাদের সহকর্মী সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসুর কাছে তাঁকে আসতে দেখেছিলাম কয়েকবার। আমাদের বারবেলায় তিনি দু'একবার এসেছিলেন। বেঁটে চেহারা চোখ-মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ছাপ থাকলেও ছিলেন অত্যন্ত লাজুক। নতুন লোকের সঙ্গে আলাপে ভালো করে চাইতে পারতেন না। হাটের মধ্যে আসা বোধহয় ছিল তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, তাই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পাইনি আমি। একান্ত নির্জন একটি স্থান, কয়েকটি অন্তরঙ্গ বন্ধু, আর মাঝে মাঝে চায়ের পেয়ালায় চুমুক; অর্থাৎ নিতান্ত ঘরোয়া বৈঠকেই তিনি খুলতেন ভালো।

প্রতিভাবান এই লেখকের ইংরাজী রচনার হাতও অসাধারণ। পরবর্তী-কালে ইংরাজী ভাষায় রচনা প্রকাশে ইনি খ্যাতিলাভ করেছেন।

বিখ্যাত বিপ্লবী ও লেখক নলিনীকিশোর গুহের মুখে শুনেছিলাম বুদ্ধদেব নাকি দশ বছর বয়স থেকেই কবিতা রচনা সুরু করেন। তাঁর প্রথম কবিতা বোধহয় পড়েছিলাম 'শঙ্খ' পত্রিকায়।

বলেছি আমার পরিচয়ের ঘাঁটি ছিল প্রধানতঃ দুটি—এক কাগজের অফিস আর অন্যটি বারবেলা বৈঠক। এই দ্বিতীয় ঘাঁটিতেই আমি জমে উঠেছিলাম প্রবোধ সান্যালের সঙ্গে। বিষ্যুৎবারের বিকালের দিকে বৈঠক বসতো। এখানে সভ্য হওয়ার সুবিধা ছিল এই যে, চাঁদা দিতে হতো না এক পয়সাও।

আর কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম ছিল না বলেই হয়তো আড্ডাটা জমতো বেশ। যার পকেটে পয়সা থাকতো সেই দিত তখন চায়ের দামটা।

কিছুদিনের মধ্যে প্রবোধকুমার সবাইকে হার মানালেন। বিষ্যুৎবার ছাড়াও অন্য যে-কোন দিন যে-কোনো সময়ে তিনি আমার আস্তানায় হাজির হয়ে যেতেন। বৈশাখের খর রৌদ্রে ঘর্মাক্ত কলেবরে অকস্মাৎ আমার ঘরে প্রবেশ করে হয়তো বললেন—চলো যাই চা খেয়ে আসি।

পরিচয় ঘন হয়ে এসেছে তখন।

ভরা দুপুরে চা! নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও পা বাড়িয়ে দিই 'লিলি-কেবিন'-এর দিকে। তখনকার দিনে ঐটিই ছিল আমা সবাকার রম্যভূমি অর্থাৎ চা-চক্র।

চায়ের সঙ্গে অনুপান চলে পাশপাড়ার পুরুতঠাকুরের গঞ্জিকাসেবী পুত্রের প্রতি তস্য মাতার অবিশ্বাস্য স্নেহের কাহিনী; চিড়িয়ার মোড় ছেড়ে প্রদ্যোৎ ঠাকুরের বাগান পেরিয়ে দক্ষিণ সিঁথির পথ ধরে উত্তর দিকে এগুতে সেই যে ভয়াবহ ডাকাতের হাতে পড়ে করুণালাভের কথা; বীরপাড়া ছাড়িয়ে রেল লাইনের ধার ধরে উল্টোডিঙিতে গেলে স্টেশনের পূব দিকে জলের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় এখনো ঐ যে কোন্ ঐশ্বর্যশালীর জীর্ণ-মলিন লীলা-নিকেতন—ঐখানে ধরা পড়েছিল একদিন গভীর রাতে মেছোবাজারের গুণ্ডা জুড়ন সেখের সঙ্গে কুমারটুলির এক পরিবারের মেয়ে ষোড়শী কুমারী নোটন।

এত অল্প বয়সে অমন বিচিত্র অভিজ্ঞতা! তন্ময় হয়ে শুনতাম প্রবোধকুমারের গল্প, আর কল্পনায় উড়ে যেতাম স্বপ্নের জাল দিয়ে বোনা তাঁর বিচিত্র জগতে। অজানা অচেনার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে যেতো বনহুগলীর প্রান্তসীমায় কিংবা হয়ত ভাঙরের খালের দিকে। এমন বিচিত্র অভিজ্ঞতাই তো জীবন-দর্শন। বৈচিত্রবিহীন জীবনের কোন অর্থ নেই। নিজেকে মনে বলতাম দীন, হীন।

এই সময়ই বোধহয় ফুটেছিল তাঁর 'নিশিপদ্ম'। শুধু চোখে দেখা নয়, অন্তরে দেখা জিনিষকে তিনি 'অবিকল' আঁকতে পারতেন ভাষার ছবিতে।

কত দিন কত সন্ধ্যা এমনি করে আনন্দে কেটেছে প্রবোধের গল্প শুনে। কিন্তু দুঃখের দিনও তো আসে। আমারো দুঃখের দিন এলো একদিন। সে কথা পরে বলছি। একটা বাঁধা ধরা ছকের মধ্যে নিজেকে ধরে ভবিষ্যতের রঙিন কল্পনা সাজিয়ে যেতাম। হঠাৎ সবটা ভেঙে যেন চুরমার হয়ে গেল। নতুন কোন পথ পাইনা দেখতে, তাই তখন পথে পথে ঘুরে বেড়াই। এই পথে সঙ্গী হলো প্রবোধ। বললে—তুমি বেকার, আমিও চির-বেকার।

বললাম—একটু পার্থক্য আছে। তুমি তো একা, আর আমি যে ইতিমধ্যে বহু!

—তা হোক, চল দিনকতক মনানন্দে ঘুরি। বেকারের সঙ্গী কি সহজে মেলে?

এই বেকার অবস্থায়ই দেখেছিলাম এই সব তরুণ সাহিত্যিকের সাহিত্য ও সাহিত্যস্থষ্টির প্রতি অপরিসীম নিষ্ঠা, সাহিত্যস্থষ্টিতে জীবনধারণের সংস্থান করার দিন তখনো আসেনি, এখনো এসেছে কিনা সন্দেহ। কারণ দু'একজন ভাগ্যবান ছাড়া সাহিত্যশিল্পীদের সকলকেই প্রাণধারণের উপায় খুঁজতে হয় অন্যত্র। কিন্তু এঁদের কাউকেই তখন দেখিনি ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে। কোন্ অদৃশ্য শক্তির তাড়নায় যেন এঁরা সব স্থষ্টি করে চলেছেন তখন কারো দুঃখের অবধি নেই, কেউবা কাটায় অনশনে কয়েকটা দিন। তবু বিকৃতি দেখিনি কারো মুখে। এঁরা যেন বসেছিলেন কঠোর সাধনায়। ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি স্থূল শারীর ধর্মের দিকে এঁদের খেয়ালই থাকতো না, সাহিত্য ছাড়া আর সবই তখন তুচ্ছ এঁদের কাছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে নাম করতে পারি নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের। কল্লোল-দলের এই দুই জন শিল্পী বাংলার অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

সাহিত্যের প্রতি এই অচলা নিষ্ঠা থাকার দরুণই কল্লোল-চক্রের হয়েছে আজ নিঃসন্দেহ প্রতিষ্ঠা।

স্নভাষচন্দ্রের কল্যাণে বার কতক করে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিই। আমাদের চা-চক্রের আদর্শ গৃহিণী তুল্য মতিকে প্রাণ ভরে ভালোবাসতে

শিখেছি। ডিমের মামলেটের সঙ্গে এক টুকরা পাঁউরুটি, কখনো বা মুড়ি-নারকেল, কখনো বা মর্তমান কলার সঙ্গে কয়েকখানা আনারসের চাকার ব্যবস্থা মতির সঙ্গে করে ফেলেছি আমরা।

সেদিন বসন্ত সমাগমে মৃদু দক্ষিণ বায়ুর আন্দোলন ছিল কিনা ঠিক মনে নেই। কোন্ রসিক সাব-এডিটরের প্রাণে রসের জোয়ার এসেছিল হঠাৎ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে। তিনি গুন্ গুন্ করে শুরু করেছিলেন কাজী নজরুলের গজল—

"চলে নাগরী, কাঁখে গাগরি,
চরণ ভারী, কোমর বাঁকা।"

এই সময়ে কাজী নজরুলের গজলের খুব প্রচলন হয়েছিল। এমন কি সুদূর পাড়াগাঁয়ে গোচারণ ভূমিতে কোন বৃক্ষচ্ছায়ায় ক্লান্ত রাখাল বালকের কণ্ঠেও শুনতে পাওয়া যেতো—'কে বিদেশী, মন-উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে।'

কাজী নজরুলের গজল গানের এতদূর জনপ্রিয়তার মূলে ছিলেন দিলীপকুমার রায়। এই লোকটির একটি অসাধারণ গুণ এই যে, ইনি গুণীকে আবিষ্কার করতে জানেন। বহু গুণীকে ইনি সাধারণ্যে পরিচিত করে দিয়েছেন, বাংলা দেশে এ বিষয়ে এঁর জুড়ি মেলা ভার। আমার যতদূর মনে পড়ে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে এঁর মুখে প্রথম নজরুলের গজল গান শুনি—'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুলশাখাতে দিস্‌নে আজি দোল'। অপূর্ব মধুর, কোমল সে কণ্ঠ! কণ্ঠের সে ধ্বনিতে বুলবুলি পাখিটার নৃত্য যেন কোন চাঁপাগাছের শাখায় আন্দোলিত হতে দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম। স্বর-মাধুর্যের ঐন্দ্রজালিক দিলীপকুমারের সেদিনকার সেই কণ্ঠ আজও ভুলতে পারিনি।

সংস্কৃত রসসাহিত্যের ভক্ত চপলাকান্ত আর থাকতে পারেন নি। মৃদু পদসঞ্চারে তিনি এ ঘরে দেখা দিলেন। দ্বিধা-বিভক্ত তাঁর কালো কোঁকড়ানো চুলের সম্মুখের দু'টি গুচ্ছ বাঁকা শিঙের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে চশমার উপরে ভাসমান। ঢল ঢল চোখে রসাভাস, মুখে গদগদ ভাষ। বললেন—

কী গাগরি দেখছেন মশায়, দেখুন দিকি নাগরী একখান। বলেই শুরু করলেন :

"শ্লাঘ্যং নীরসকাষ্ঠতাড়নশতং শ্লাঘ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ,
শ্লাঘ্যং পঙ্কবিলেপনং পুনরিহ শ্লাঘ্যো হৃতিদাহানলঃ।
যৎকান্তাকুচকুম্ভ বাহুলতিকা-হিল্লোললীলা সুখং,
লব্ধং কুম্ভকর ! ত্বয়া ন হি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে ॥"

কোন রূপবতী যুবতী চলেছেন জলভরা কুম্ভ কাঁখে নিয়ে, গতি তাঁর মন্থর। এ দৃশ্য চোখে পড়েছে এক রসিক যুবকের। তিনি কুম্ভের সুখে ঈর্ষাতুর, তাই কুম্ভকে উদ্দেশ্য করে বলছেন—হে কুম্ভ ! তুমি ধন্য, কেন না জীবনে অনেক দুঃখ সহ্য করে তবে না আজ তুমি এই পরম সুখের অধিকারী হয়েছ। কুম্ভকার যখন তোমাকে সৃষ্টি করতে প্রবৃত্ত হয় সে সময় তুমি শুষ্ক কাষ্ঠের আঘাত নীরবে সহ্য করেছ, সে তো শ্লাঘার বিষয় ; তারপর খর রৌদ্রে হয়েছ বিশুষ্ক, সেও যে শ্লাঘনীয় ; তারপর পড়েছে তোমার অঙ্গে পঙ্কের প্রলেপ এবং সর্বশেষে হয়েছ অনলে দগ্ধ ! তপশ্চর্যার পরীক্ষায় দুঃখ-দহনকে এতখানি তুচ্ছ করতে পেরেছিলে বলেই না তোমার কপালে আজ এত সুখ—সুন্দরী যুবতীর বক্ষলগ্ন হয়ে তার কুচকুম্ভ ও বাহু-লতার আন্দোলন-জনিত লীলাসুখ তুমি উপভোগ করবার অধিকার পেলে। তুমি ধন্য !

উপেনদার কানে নাগরী অথবা গাগরি পৌঁছেছিল কিনা জানি না। তবে তাঁর মনটা উস্‌খুস্ করছিল। প্যারা লিখে শেষ করেই তিনি এ ঘরে এলেন ছুটে। এসে মোলায়েম কণ্ঠে বিজয়লালকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন—ও বিজয় ! এখানে লাগরটা কে হে ? কিন্তু বিজয়কে পাওয়া গেল না। বিজয় ঘোরতর নীতিবাগীশ, স্বর্গীয় হেরম্ব মৈত্রের প্রায় সগোত্র তখন সে। দুষ্ট লোকের কাছে শুনেছিলাম, হেরম্ব বাবু নাকি একবার উর্বশী নাম্নী কোন মোটরবাসে উঠতে গিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। বিজয়ও তেমনি কুচকুম্ভ শুনে 'ছোঃ' বলে কানে আঙুল দিয়ে কোথায় যেন সরে পড়েছিল। কিন্তু টেবিলের উপর শাদা কাগজের সীটের উপর মুড়ি আর নারকেল সাজানো ছিল, সেগুলির সদ্ব্যবহার শুরু হতেই থেমে গিয়েছিল চপলাকান্তের

রসালাপে। উপেনদার সেদিকে চোখ পড়তেই আর কথা বা প্রশ্ন তাঁর মুখে শোনা গেল না। তিনি সোজা ঐ বস্তুগুলির উপর থাবা বসিয়ে দিলেন এবং সে একটি থাবা নয়, দু'হাতের দুই থাবা। সকলে হাঁ হাঁ করে উঠলো— উপেনদা! উপেনদা! আর উপেনদা, উপেনদার কি তখন কথা বলবার জো আছে? দু'হাতের খেলা ততক্ষণ তাঁর চলেছে সমানে। বেগতিক দেখে কেউ কেউ কাড়াকাড়ি শুরু করলে। কিন্তু পোর্টব্লেয়ারের নারকেলের দড়ি পাকানো শক্ত কব্জির সঙ্গে পেরে ওঠা দায়। তা ছাড়া 'জাতের বিড়ম্বনা' তাঁর ছিল না। সেটা ছিল আমাদের পক্ষে আরও মারাত্মক।

উপেনদার এমনধারা অত্যাচার আমাদের প্রায়ই সহ্য করতে হতো। কিন্তু সব দিন মানুষের সমান যায় না। একদিন জব্দও করেছিলাম তাঁকে ভালো রকম। আহার্য বস্তু প্রায় অর্ধেকটা শেষ করে বাকি অর্ধেক টেবিলে সাজানো হয়েছিল এমনভাবে, যাতে দরজার মুখে উপেনদা এসে পৌঁছতেই সুড়ুৎ করে তা সহজে লুকিয়ে ফেলা যায়। এ যেন ফাঁদের মধ্যে খাবার বিছিয়ে শিকার ডাকা। আমরা সবাই ছিলাম সজাগ, কিন্তু যেন আনমনা হয়ে কাজে ব্যস্ত আছি এমনই ভাব ছিল আমাদের। উপেনদা তাঁর ঘর থেকে মাছরাঙা পাখির মতো ওঁত করেছিলেন। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতেই একজন তাঁর চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেয়ে সবাইকে সাবধান করে দিলেন —উঠেছে বেঁটে বামুনটা! উপেনদা লপাক্ লপাক্ করে পা ফেলে এ ঘরে এসে দরজার মুখে দাঁড়াতেই নথিং নট্ কিচ্ছু—বাঃ! এই ছিল, এই নেই!

কী বাবা, ম্যাজিক নাকি!—উপেনদা বোকা বনে গিয়েছিলেন। এই রাস্‌কেলটা, ব্লাডিভোষ্টক!—বলে তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন। যেন তাঁর এই দুর্ভোগের মূলে আমিই।

আমি শপথ করে বললাম—না, উপেনদা, আমি এর বিন্দু বিসর্গও জানি নে।

না, উপেনদা! —মুখ ভেঙ্‌চে তিনি আমার ডাকের প্রতিধ্বনি করে বললেন—না, তুমি কিচ্ছুই জানো না। চাঁদে যেন কলঙ্ক নেই!

সে যাক। আমরা সবাই মিলে ধরে বললাম উপেনদাকে দু'আনা পয়সা

দিতে। গরীবখানায় গরীব খানার ব্যবস্থা আবার এক্ষুনি হয়ে যাবে। কিন্তু উপেনদা সে পাত্রই নন। বললে—উহুঁ সে হচ্ছে না। শাস্ত্রীয় নিষেধ আছে। এ বিষয়ে আমি ঘোর সনাতনী, শাস্ত্র মেনে চলি। শাস্ত্র বলে 'নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ'। আমি খাঁটি বিপ্র এটা তোমরা মানো? আর ভোজনে আমার নৃত্য যে আর্টের পর্যায়ে ওঠে এটাও দেখেছ। শাস্ত্রীয় বিধান হচ্ছে বেয়াকুবে খাওয়ায় আর বুদ্ধিমানে খায়। এই শাস্ত্রীয় বিধান আমি লঙ্ঘন করি কি করে?

এমনতরো ঘটনা আমাদের সাংবাদিক জীবনের শুষ্কতায় সরসতা আনতো। কোন বিখ্যাত ব্যক্তির বক্তৃতা আমাদের মধ্যে শোনে একজন; আমরা সকলে মিলে তার অনুলিখন ছাপি। খেলা দেখবার জন্যে মাঠে যায় আমাদের মধ্যে একজন, আমরা অফিসে বসে জয়-পরাজয়ের তারিফ করি। লোকে যখন সান্ধ্যভ্রমণে নির্মল হাওয়ায় শরীর স্নিগ্ধ করে আমরা তখন রোটারি মেশিনরূপী দৈত্য দানবটার পেট ভরাবার জন্যে টেলিগ্রাম সম্পাদন করি। আমাদের প্রাণশক্তির উৎস যা-কিছু তা ছিল ঐ ধরণের বৈঠকে রঙ্গ-রসিকতায়।

ইংরেজী, বাংলায় মিলিয়ে তিন তিনখানা কাগজ আমাদের হাতে। আমাদের তখন বৃহস্পতির দশা চলেছে।

সংবাদপত্রের অফিসে ক্ষিপ্র কর্মব্যস্ততার মাঝে অবসর বিনোদের জন্যে লঘু হাস্যরসের অবতারণার প্রয়োজন ছিল। সময়ের শৃঙ্খলে বাঁধা পরিমিত কোন অবসরের সৃষ্টি আমরা করে নিতাম যখন তখন। এতে আমাদের কর্মস্রোত কখনো ব্যাহত হয়নি, দেখেছি চিত্তের সরসতায় উৎসাহ হতো দ্বিগুণতর—অর্থাৎ ভাঁটার পরে আবার আসতো জোয়ার। এটা আমাদের ধাতুগত স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল ছোকরা সম্পাদকদলের পাণ্ডা স্বর্গীয় উপেন বাঁড়ুজ্যের কল্যাণে।

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের রসিক চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের নিঃশব্দ পদসঞ্চার অনেকদিন হতো ওঘর থেকে এঘরে যেন নাট্যমঞ্চের নায়িকার মতো। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে হাত থেকে খসে পড়তো আমাদের লেখনী। শোনা

যাক চপলাকান্তের আবৃত্তি ও কাব্যালোচনা। কাজ তো ছাই আছেই, থাক না।

চপলাকান্ত নিঃসঙ্কোচে অবলীলায় সংস্কৃত শ্লোক পরিবেশন করে যেতেন, কারণ তাঁর সঞ্চয় ছিল প্রচুর। শৃঙ্গার রসের প্রতি তাঁর লোভ ছিল একটু বেশি রকম, তাই ঐ রসের সঞ্চার পেলেই তিনি তাঁর ভৃঙ্গার পেতে ধরতেন। ছাত্রমহলে অধ্যাপকের অংশ তাঁকে গ্রহণ করতে হতো না বলে তাঁর কণ্ঠ ছিল অবাধ।

এ প্রসঙ্গে আমার কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ভোলানাথবাবুর কথা মনে পড়ে যেতো। তিনি আমাদের পড়াতেন কুমারসম্ভব কাব্য। পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত অনেক শ্লোকের ব্যাখ্যা খুঁজে পেতাম না মানের বইতে। সে গুলোর মাথার উপরে লেখা থাকতো 'অশ্লীল'। আ মরণ! অশ্লীল যদি তবে পাঠ্যপুস্তকে ছেলেদের মাথা খাওয়ার জন্যে দেওয়া কেন আর কালিদাসকে নিয়েই বা এত মাতামাতি কেন? মহাকবিকে ধরে কি তাঁর কালে কেউ ঠেঙায় নি?

ভোলানাথবাবু ক্লাসে ঢুকেই অতি গম্ভীর ভাবে বলে যেতেন—**My young friends, this is rather indecent. However, I am explaining it to you.** বলেই হয়তো শুরু করলেন:

"তস্যাঃ প্রবিষ্টা নতনাভিরন্ধ্রং
ররাজ তন্বী নবরোমরাজিঃ।
নীবীমতিক্রম্য সিতেতরস্য
তন্মেখলা মধ্য মণেরিবার্চ্চিঃ॥
মধ্যেন সা বেদিবিলগ্নমধ্যা
বলিত্রয়ং চারু বভার বালা।
আরোহণার্থং নব যৌবনেন
কামস্য সোপানমিব প্রযুক্তম্॥

যৌবনোদ্ভিন্না পার্বতীর রূপ বর্ণনা হচ্ছিল। এ দু'টি শ্লোকে কবি বক্ষতল থেকে নাভিদেশ পর্যন্ত বর্ণনা দিয়েছেন। নবরোমরাজির উদ্গম হয়েছে

পার্বতীর, সেগুলি অতি সূক্ষ্ম, কোমল। কটিবাস ছাড়িয়ে তারা প্রবেশ করেছে একেবারে নাভির গুহায়। মনে হচ্ছে যেন চন্দ্রহারের মধ্যদেশে নীলকান্তমণি শোভা পাচ্ছে। তলপেটে সুচারু তিনটি বলি পড়েছে, যেন কামদেবের উঠবার সিঁড়ি সেগুলি—যৌবনেরই সৃষ্টি !

ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে কারো চৌদ্দ পুরুষের সাধ্যি ছিলনা একটুখানি ফিক্ করে হাসে। তা ছাড়া লঘু চিত্ততার কোন কারণও ছিল বলে তো বোধ হয় না। নীরবে সকলে ভোলানাথবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকতো আর মনটা বোধ হয় চলে যেত দূরে নগাধিরাজের রাজ্যে ! সৌন্দর্যের ব্যাখ্যার সঙ্গে ভোলানাথবাবুর গাম্ভীর্য এমন সমতা রেখে চলতো যে, সেখানে কোন তরল চাপল্য ঠাঁই পেতো না।

নবরোমরাজির এতখানি সৌন্দর্য আর সুচারু বলির এতখানি লাবণ্য ও মনোহারিতা যেমন কালিদাসের চোখে দেখেছি, তেমন তো আর কখনও দেখি নি। কোথায় অশ্লীলতা যার জন্যে সঙ্কুচিত হয়ে মুখ লুকাতে হবে ? “হায়রে, যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।”

যাক সে কথা ! একটা পরিচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে আমরা গড়ে তুলেছিলাম আমাদের নিবিড় সম্পর্ক। আমরা যারা বাংলা দৈনিকের সম্পাদন ভার নিয়ে এসেছিলাম, কালের দিক দিয়ে তাদের অভ্যুদয়ে কিছু বিলম্ব হলেও কি করে ইংরেজী দৈনিকের দলে মিশে আমরা যে একাকার হয়ে গেলাম তা সত্যই বিস্ময়কর। হাসিতে খুশিতে, ব্যস্ততায় আলস্যে, আয়াসে বিলাসে ১৯২৭-২৮ সালের অনেকখানি বয়ে গেল যেন ঝড়ের মতো।

আমাদের প্রতিষ্ঠানের সংগঠন সৌকর্য যে কতখানি তা এই দীর্ঘ এক বৎসরে টের পেয়ে গেছি। এর প্রায় সবটুকু কৃতিত্বই সুভাষের। সুভাষ মনে প্রাণে বিপ্লবী, তাই দেশ-বিদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি এর যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। বলিষ্ঠ চিন্তা ও নির্ভীক মতবাদ প্রচারে ফরওয়ার্ড তখন সারা ভারতবর্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সংবাদ-জগতে এই সংবাদপত্র তখন এনেছিল একটি নতুন ভাবধারা। যাঁর সংগঠন শক্তির ফলে ফরওয়ার্ড প্রতিষ্ঠানের এই অপ্রতিহত ক্ষমতা লাভ হয়েছিল, তিনি ছিলেন সুভাষচন্দ্র।

আমরা এসে বসেছি সাজানো বাগানে। ধীরে ধীরে প্রত্যয় হলো আমাদের আত্মিক যোগ হয়েছে বহু দেশে বহু প্রগতিশীল মানুষের সঙ্গে। যে ইংরেজ আমাদের প্রভু সেই ইংরেজের দেশেও আছে আমাদের মনের মানুষ—লর্ড অলিভিয়র, জর্জ ল্যান্সবেরী, ব্রেলসফোর্ড, মেজর গ্রাহাম পোল ইত্যাদি।

১৯২৮ সাল এলো যেন সারা কলকাতায় প্রাণের বন্যা নিয়ে। এইখানে সেবার অখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সভাপতি। বোধ করি মাস দুই আগে থেকে এই কংগ্রেসের সাফল্যের জন্যে বিরাট আয়োজন চলছিল। এই কংগ্রেসের সভামণ্ডপের সঙ্গে একটি বিরাট প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয়েছিল, তার উদ্যোক্তা ছিলেন নলিনীরঞ্জন সরকার আর এখানকার জেনারেল সেক্রেটারী হয়েছিলেন ডাঃ বিধান রায়। উপেনদা যে বলতেন সুভাষের বিশ্বাস ভারত ললনারা না জাগলে ভারতের মুক্তি নেই, তা সত্যি কথা। কারণ, সুভাষ ইতিমধ্যে এক নারী সম্মিলনী গঠন করে ফেলেছিলেন তাঁর মা ও মেজ বৌদিকে পুরোভাগে রেখে, নইলে অপর নারীরা যোগ দেবে কেন? এই সম্মিলনীর সেক্রেটারী হয়েছিলেন লতিকা বসু (বর্তমানে ঘোষ)।

কংগ্রেস সভাপতিকে রাজোচিত সম্মানে অভ্যর্থনা করার আয়োজন চলছিল। বিরাট স্বেচ্ছাসেবক দল তৈরী করেছিলেন সুভাষ এবং স্বয়ং হয়েছিলেন তার অধিনায়ক। নারী স্বেচ্ছাবাহিনীর নায়িকা করা হয়েছিল লতিকা বসুকে।

২৮ ঘোড়ার গাড়িতে এলেন ২৮ সালের কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল। কলকাতা শহরের রাস্তায় রাস্তায় বাড়িতে বাড়িতে লক্ষ লক্ষ নর-নারীর অপেক্ষমান ঔৎসুক্যের সে কি অপূর্ব দৃশ্য। সকালের দিকটা। খবরের কাগজের অফিসে যাবার তাড়া নেই। কাজেই এ দৃশ্য প্রাণভরে দেখবার অবসর আমাদেরও হয়েছিল।

বিরাট মিছিলের অধিনায়ক সুভাষচন্দ্রকে দেখেছিলাম প্রধান সেনাপতির বেশে মোটর গাড়িটার মাঝে দণ্ডায়মান অবস্থায়—ডান দিকের পাখানি ঋজু লম্বমান, বাঁ দিকের পা অর্ধবঙ্কিম ভাবে একটা পা-দানির উপর স্থাপিত। চলমান মিছিলের বিপরীত দিকে অর্থাৎ কংগ্রেসের সভাপতির মুখের দিকে মুখ ফিরানো; দক্ষিণহস্ত মিলিটারী কায়দায় কপাল স্পর্শ করেছে, বাম হস্তে ছিল একখানি ছড়ি। General Officer Commanding সভাপতিকে সাদর আহ্বান করে নিয়ে চলেছেন। সত্য বক্সী তাঁর এই সৈনিক বেশের ছবিখানি আইরিশ নেতা মাইকেল কলিন্সের অনুরূপ ছবির সঙ্গে পাশাপাশি 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের চোখে কিন্তু এ দৃশ্য ভালো লাগে নি তখন। তাঁর লেখনীতে ফুটলো তীব্র বিদ্রূপ। সুভাষচন্দ্রের এ মূর্তি প্রকাশিত হলো 'Goc' রূপে—ঝাঁজালো মন্তব্যে সে মূর্তির ব্যাখ্যা হলো নিছক সঙ!

সজনীকান্তের লেখনী ছিল ধারালো, আর তিনি তার ব্যবহার করতে ভালোবাসতেন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে। সব কিছুকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ছাঁচে ঢালতে না পারলে তাঁর রসোপলব্ধির ব্যাঘাত ঘটতো। এ রসের একটা মারাত্মক দোষ এই যে, স্বল্পবুদ্ধি পাঠককুল অনেক সময় বিভ্রান্ত হয়ে এতে অভ্রান্ত সত্য আছে বলে ধরে নেয় এবং সে ধারণা সহজে দূর হতে চায় না। কাজেই অনেককেই সন্ত্রস্ত, তটস্থ হয়ে থাকতে হতো সে সময়। কারণ, সজনীকান্তের বক্রদৃষ্টি কার উপর কখন পড়বে তার ঠিক ছিল না।

'কল্লোল' চক্রের চক্রীদের উপর তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। সজনীকান্তের হাতে তাঁদের নিস্তার পাবার জো ছিল না—তাঁদের প্রায় সকলকেই লাঞ্ছিত হতে হয়েছে তাঁর হাতে।

রথী, মহারথীও বাদ পড়তেন না। বাংলা সাহিত্যের বীরবল প্রমথ চৌধুরী 'সনেট-পঞ্চাশৎ' রচনা করে কবি হবার কি দুরাশাই না পোষণ করেছিলেন এবং তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি নাকি পণ্ডশ্রম একথাও শুনতে হয়েছিল। এমন কি, একালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথও নাকি ক্লাসিকের পর্যায়ে

কিছু দিতে পারে নি বলে তাঁকে 'স্মর-গরল' পান করতে বলা হয়েছিল। স্নুতরাং কা কথা স্নুভাষচন্দ্রের। তাঁকেও শুনতে হয়েছিল—

"খোকা ভগবান নামে গজানন বঙ্গধামে
করিছে বিহার।"

'Goc' হওয়া যে স্নুভাষচন্দ্রের নিতান্ত সখ ছিল না, তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন উত্তরকালে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হয়ে।

আর কে-ই বা তখন বুঝতে পেরেছিল যে, শক্তির পূজারী স্নুভাষচন্দ্র এক মহাজাতির কল্পনা করেছিলেন এবং তাঁর সেই কল্পনাকে বাস্তবরূপ দেবার কালে রবীন্দ্রনাথই তাঁকে একদিন এই বলে অভিনন্দন জানাবেন?—

"বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তবে বহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ করছি। দেহে মনে তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারব—আমার সে সময় আজ গেছে, শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্তব্য রূপে বাংলা দেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান করতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপর আশীর্বাদ করে বিদায় নেব এই জেনে যে, দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ করেছ, দশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হয়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন করে।"

সজনীকান্তের এই রূপ যে তাঁর আসল রূপ নয় তা কিন্তু টের পেয়েছিলাম অনেকদিন পরে। সেদিন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের কোন রঙ্গমঞ্চে বোধ করি রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের অভিনয়। বহু স্নুধী ও বরেণ্য নর-নারীর সমাবেশ হয়েছিল। অভিনয় শুরু হবার কিছু আগে স্বয়ং কবিগুরু এসে হাজির হলেন। সমবেত জনতা দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানালে! কবিগুরু আসন পরিগ্রহ করবার প্রাক্কালে তাঁর চরণাম্বুজের ধূলি যাঁর বক্ষে, অধরোষ্ঠে ও কপালে বিলেপিত হলো তিনি দেখলাম সজনীকান্ত দাস। ভক্তের এমন নমনীয়, আনন্দোচ্ছল ভাব আমি আর কখনো দেখিনি।

রবীন্দ্রনাথের চোখে মুখে সস্নেহ হাসির সে কি স্নিগ্ধতা! আমি উপভোগ করেছিলাম সেদিন।

ব্রহ্মোপলব্ধির পথে যাঁরা 'নেতি'র পথ ধরে চলেন তাঁরাই নাকি অধিকতর ভক্ত; কথাটার মধ্যে সত্য থাকতে পারে, কারণ নেতির মধ্যেই নীতি লুকিয়ে আছে। না-পাওয়ার জ্বালাটা যার বেশি তারই অভিমান হয় তীব্র এবং তারই ফলে বিদ্রোহ। ভগবান এই বিদ্রোহীকে চিনতে পারেন সহজে। সজনীকান্তের সাধনা যে সফল হয়েছে তার প্রমাণ পেলাম সেইদিন কবিগুরুর কৃপাদৃষ্টি বর্ষণে!

ঠিক এমনি দৃশ্য উপভোগ করেছিলাম আর একদিন, যেদিন দেখলাম সজনীকান্তের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ কল্লোল সাহিত্য-চক্রের কোন এক ব্যক্তিকে।

প্রত্যয় হয়েছিল সজনীকান্তের আর্ট সহজিয়ার আর্ট!

সুভাষচন্দ্রকে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক রূপে দেখে আর এক ব্যক্তি মর্মাহত হয়েছিলেন সেদিন। তিনি আত্মশক্তির সম্পাদক শচীন সেনগুপ্ত। তিনি তাঁর সম্পাদকীয় মন্তব্যে সুভাষচন্দ্রকে বিদ্রূপ করেন নি, কিন্তু দুঃখ করেছিলেন এই বলে যে, সুভাষকে তিনি এভাবে দেখতে চাননি, চেয়েছিলেন তাঁর স্বতন্ত্র সত্তায় প্রস্ফুটিত বাংলার একজন চিন্তানায়ক ও ভবিষ্যৎ ভারতীয় নেতারূপে। সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামশীল মন ইংরেজের সঙ্গে আপোষের পক্ষপাতী ছিল না কোন দিন। পূর্ণ স্বাধীনতার উপাসক সুভাষচন্দ্র নেহরু-রিপোর্টের বিরুদ্ধাচরণ করবেন সক্রিয়ভাবে এইটাই তিনি দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর স্থান নিয়েছিলেন জহরলাল। পার্ক সার্কাসের বিরাট কংগ্রেস মণ্ডপের তোরণ দ্বারে অগণিত লোকের ভিড় হওয়ায় কংগ্রেস সভাপতির প্রবেশ পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সভাপতির পথ অবাধ করবার জন্যে তস্য পুত্র জহরলাল আদেশ দিয়েছিলেন সুভাষকে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে। শচীন সেনগুপ্তের ব্যথা ছিল এইখানে।

আত্মশক্তি সম্পাদকের মন্তব্যে সুভাষ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু রুষ্ট হতে পারেন নি। সম্পাদকের সঙ্গে পরে আলোচনায় সুভাষ তাঁর আত্মপক্ষ

সমর্থনে এই কথা জানিয়েছিলেন যে, তিনি শৃঙ্খলার পূজারী, আর শৃঙ্খলাই হচ্ছে সৈনিকের ধর্ম। ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রামে ভাবী সৈনিকদের সামনে তিনি এই আদর্শই তুলে ধরতে চান, তাঁর মনে এখন মর্যাদার কোন প্রশ্নই ওঠেনি। এই কংগ্রেসের ফল কি হবে তা তাঁর জানা আছে। কংগ্রেসের সংগ্রামশীল মন আবার নেমেছে নীচে—আবার এসেছে ভিক্ষাবৃত্তি, শুধু ভাষার অবরণে সে দৈন্য ঢাকবার একটা চেষ্টা আছে মাত্র। তাঁর চিন্তাধারার সহায়ক একমাত্র জহরলাল ছাড়া কংগ্রেসের ভিতর আর কেউ এখন নেই। সুতরাং জহরলালের উপর নির্ভর করে তিনি দেশের সৈনিক সংগঠনের দিকে জোর দিতে চান। দেশের তরুণদের কাছে এই দৃষ্টান্ত তাঁকে দেখাতেই হবে।

যাক সে কথা। কংগ্রেসের সে জাঁকজমক ভোলবার নয়। বিরাট মণ্ডপের তলায় দেখলাম সেবার অনেক নেতাকেই—দেখলাম শ্বেতশুভ্রকেশা, পক্ক আম্রবর্ণা এ্যানি বেশান্তকে, দেখলাম পাক্কা নিখুঁত বিলাতী পোষাকে সজ্জিত মিঃ জিন্নাকে, উত্তরকালে কদম-কদম কায়েদে-আজমে রূপান্তরিত জিন্নাকে।

সরলা দেবী চৌধুরাণী হয়েছিলেন 'বন্দেমাতরম' জাতীয় সঙ্গীতের পরিচালিকা—পুত্র দীপক চৌধুরী ব্যাণ্ড মাস্টার। ব্যাণ্ড মাস্টারের হাতের বামনাকার ছড়িটা ঘুরলো একবার দক্ষিণে আর একবার বামে অর্কেষ্ট্রার তালে তালে।

নেহরু-রিপোর্ট পাঠ শেষ হলে তার বিরুদ্ধবাদী রূপে প্রতিভাত হলেন, কংগ্রেস সভাপতির পুত্র জহরলাল; বুঝলাম কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে পিতার উত্তরাধিকার পুত্রই লাভ করবেন।

এই কংগ্রেসে নেহরু-রিপোর্ট পাশ হয়ে গেল। তাতে ছিল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবি। তার সঙ্গে গেল এক বৎসরের জন্যে এক চরমপত্র। ইংরেজ যদি সে দাবি মেনে না নেয় তবে অতঃপর পূর্ণ স্বরাজসলিলে ঝম্পপ্রদান! থাকুক তখন ইংরেজ গালে হাত দিয়ে হাঁ করে।

সত্য বক্সীর কলম চলে উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ তুলে—দুর্বার দুর্নিবার, ইংরেজকে

সোজা পথ দেখিয়ে দেয়—ঐ যে রাস্তা। উপেনদার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মারাত্মক রকমের তিক্তকষায় হয়ে উঠছে; তা গলাধঃকরণ করা দায় হলো। যদিও তিনি ইংরেজকে ডাকছেন—'এসো এসো আধ আঁচরে বসো' তথাপি সে তো আঁচর নয়, সে যে কাঁকর!

অষ্ট্রেলিয়ায় বসে ইংলণ্ড থেকে মাসিমাকে আমরা বোন-পোর বাড়িতে একবার হাওয়া বদল করে যাওয়ার জন্যে কখনো অনুরোধ করতাম না কিংবা কানাডায় কোন যৌবন-বন-সারিকা সঙ্গীতঘন শ্যালিকার সঙ্গে পত্রালাপও করিনি; তবু নেহরু রিপোর্টে আমরা ঐ সোনার পাথরবাটিটা দাবি করে বসেছিলাম। জানি সে দাবি অগ্রাহ্য হবে; অগ্রাহ্য হলেই তো সংঘর্ষ, আর সংঘর্ষের পথ ধরেই তো লক্ষ্যে পৌছানো যায়। চরম লক্ষ্যে পৌছতে হলে ওটা শুধু আর এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার চাল।

কর্তব্য কঠিন, কঠোর। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর গান্ধীজী বাংলায় এসে ত্রিমুকুট পরিয়ে গিয়েছিলেন জে, এম, সেনগুপ্তকে (তখনো দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন হন নি)! সুভাষ মান্দালয় থেকে ফিরে এলে তখন এই দুইজন উজ্জ্বল মণির দিকে চেয়ে থাকতো বাংলাদেশ, অনন্ত অব্যক্ত আশা নিয়ে।

যুবকদের মধ্যে সাড়া পড়েছে। ছাত্রদের দলে দলে দেখা যায় চাঞ্চল্য। নারীরা বেরিয়ে আসছেন রাজপথে—বুঝি কার ডাক শুনা যায়। এই সময় যুবকদের মনে বেশ প্রেরণা যোগাতো কাজী নজরুলের গান—

"দুর্গম-গিরি-কান্তার ঐ দুস্তর পারাবার (হে)
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে যাত্রীরা হুঁসিয়ার।"

সভা-সমিতির ধূম পড়েছে। নেতাদের 'জ্বালাময়ী' বক্তৃতা আর মর্মস্পর্শী বাণীর বন্যায় ভেসে গিয়ে আমরা প্রায় পড়তাম অকূলে। নারীদের মধ্যে যাঁরা তখন যশোভিন্না তাঁদের সকলকার মনোরঞ্জন করতে না পারলে পীড়া বোধ করেছি, ভয়ও ছিল মনে মনে বুঝি বা কোপানলে পড়ি।

সাংবাদিকের জীবনে বিড়ম্বনাও কম নয়।

এই সময়ে হঠাৎ এক নারী উঠেছিলেন যশের কাঙালিনী, স্বামিধনশালিনী,

যত্র-তত্র-গামিনী। শুনেছি তাঁর নাকি প্রতিভা ছিল। সভা-সমিতির বাই তাঁর বেশ ছিল। তার চাইতেও যে বাইটা তাঁর ছিল বেশি সেটা হল তাঁর নিজস্ব বিজ্ঞাপন। সভাটা কোন্ জাতের, কি তার বক্তব্য আর কি তার উদ্দেশ্য সে সব বিচারের প্রয়োজন কি? এই নারী সভার আয়োজন করতেন—সেইটুকুই তো যথেষ্ট। আর সেই সভার একটি মনোজ্ঞ বিবরণের সঙ্গে তাঁর নামটি জুড়ে দিলেই ব্যস!—সব মনোহর। প্রথম প্রথম এর প্রয়োজন ছিল, কারণ আমরা যে ভারত ললনাদের জাগরণের ভার নিয়েছিলাম; ঢাক পিটিয়ে তাদের ঘুম ভাঙাতে হবে যে। আপাতত এই ললনাকে কিছু প্রাধান্য দিলে অন্য ললনাদের যদি চোখ ফোটে তো মন্দ কি!

ধীরে ধীরে এই ললনার জ্বালায় আমরা জ্বালাতন হয়ে উঠলাম। প্রায় নিত্য তাঁর বাণী বা সভার বিবরণী এসে হাজির হয় এবং সেটা আমাদের ছাপতে হবে এমনই ছিল যেন অনুশাসন। প্রথমে আসতো বাহক; তারপর টেলিফোনে বারম্বার সবিনয় অনুরোধ এবং হয়তো একটু অভিমানও; তাতেও কাজ না হলে আসতো একটি ফুটফুটে ছেলে—কৈশোর থেকে তখনো বোধ হয় যৌবনে পা দেয়নি; অতঃপর স্বয়ং দেবীর আগমন গণ্ডা দেড়েক ভক্ত তরুণের পরিবেষ্টনীতে।

ছেলেটি এসে বলতো—অমুক দেবীর ওটা ছাপা হয়নি কেন তাই জানতে পাঠিয়েছেন আমাকে।

অমুক দেবীর ওটা যে মহামূল্যবান জিনিস তা আমরা মনে করতে পারিনি বলে তার আদরও করতে পারিনি; কাজেই ছেলেটিকে যা-হোক করে হয়তো বিদায় দিতাম।

ছেলেটি যে দেবীরই তনয় তা টের পেয়েছিলাম অনেক পরে।

কিন্তু নিস্তার পাবার জো ছিল না। ঐ যে বলেছি স্বয়ং দেবীর আগমন—আগমন নয়, একেবারে আক্রমণ!

সত্য বক্সীর কোনই দায়িত্ব ছিল না। কারণ, সম্পাদক হিসাবে তখন 'বাঙ্গলার কথা'য় নাম বেরুতো গোপাল সান্যালের। গোপাল সান্যালই এই নারীকে আবিষ্কার করেছিলেন। তবু সত্যবাবু এই ললনাকে দেখলেই ভয়ে

ছুটে পালাতেন শশক শিশুর মতো। তাঁর মুখে তখন শুনতে পেতাম তাঁর আঞ্চলিক ভাষার একটি অদ্ভুত শব্দের অনুচ্চ ধ্বনি। শব্দটার প্রকৃত অর্থ কি তা আজও জানিনা, জানবার চেষ্টাও করিনি তবে এটা সহজেই মালুম হতো যে, ললনা সুমধুরহাসিনী হলেও তাঁর কাছে বিভীষণা, শুভ্র খদ্দরধারিণী হলেও বোধ করি রক্তাম্বরধারিণী সুতরাং দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

উপেনদা বলতেন—সত্যটা শিশু। তিনি এ ব্যাপারের মীমাংসা অচিরেই করে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁরও কোন এক্তিয়ার ছিল না এ-বিষয়ে। যা কিছু করবো আমরাই।

একদিন গোপাল সান্যাল ললনাকে আমার দিকে লেলিয়ে দিয়ে সভায় যোগদানের অছিলায় পিঠটান দিলেন!

আচমকা এই আক্রমণে অভিভূত না হয়ে ললনাকে বললাম, তাঁর বক্তৃতা ছাপা হবে নিশ্চয়ই কিন্তু তার সঙ্গে তাঁর একখানি ছবি চাই যে। বললাম তাঁকে, তাঁর একখানা ফটো দয়া করে যদি তিনি পাঠিয়ে দেন তবে আমরা ব্লক করে নেবো।

ছবি আসা পর্যন্ত তবু ভাববার সময় পাবো তো!

অতঃপর ললনার যে ফটো এলো তাতে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ! ও হরি! এ যে একেবারে কনে-বৌয়ের ছবি! গলায় উঠেছে যেন কোমরের চন্দ্রহার অথবা যেন কোন গ্রাম্য মেয়ের গলার হাঁসুলি—গ্রীবার নীচে কিছুটা অনাবৃত স্থানে যথাযথ পরিদৃশ্যমান! অর্থাৎ এ ছবি যেন যৌবন-জল-তরঙ্গ রোধিবে কে!

হরে মুরারে! এ ছবি ছাপবে কে? অকুণ্ঠভাবে ফেরত দিয়ে বলে দিলাম— একটা আধুনিকতম ছবি চাই যে; ও তো অনেক দিন আগেকার ছবি, ওটা তো চলবে না।

ভদ্রমহিলা হয়তো ব্যথিত হয়েছিলেন, কিন্তু অনুরোধ সত্ত্বেও ঘুরে ফিরে এলো ঐ একই হাঁসুলি-মার্কা ছবি, তার সঙ্গে এক টুকরো কাগজে একথাও লেখা আছে যে, ও-ছবি ছাড়া আর কোন ছবিই যে নেই তাঁর, সুতরাং ঐখানিই যেন আমরা ছাপি। তাঁর এ আব্দার রাখতে না

পেয়ে ছবিখানি স্রেফ ফেরত দিয়ে দিলাম। এবার আর একটু সাহস বেড়েছিল।

ছবিখানির প্রতি ভদ্রমহিলা তাঁর আকর্ষণ ত্যাগ করতে পারছিলেন না, কিছুতেই কিন্তু আমাদের তাতে কোন আকর্ষণ ছিল না, কারণ সাংবাদিকের 'অপ্-টু-ডেট' হওয়াতেই যে কৃতিত্ব !

উক্ত ভদ্রমহিলাকে দেখতাম নানাস্থানে—কখনো কোন বিরাট মিছিলের পুরোভাগে আবার কখনো বা কোন নামজাদা দোকানের অন্দরে ঢুকে চায়ের পেয়ালা হাতে পিকেটিং করতে। মাথার উপরে ঘুরতো বিজলী পাখাটা। ভদ্রমহিলার পক্ষে অমন অভদ্র পিকেটিং শোভন নয় বলেই হয়তো দোকানীর মনে জেগে উঠতো করুণা !

যা হোক, আমার দাওয়াই খেটে গেলো। দ্বিতীয় ছবি আর এলো না। আমিও অতঃপর ভদ্রমহিলার যত বক্তৃতা বিবৃতিই আসে সব টেবিলের তলায় রক্ষিত 'জঞ্জাল-পেটিকায় স্বাহা' মন্ত্র পড়ে নিক্ষেপ করে দিই !

অত্যাচার বন্ধ হলো। ভয়ে ভীত হবার সম্ভাবনা না থাকায় সত্যবাবুর অবাধ আগমন শুরু হলো আবার আমাদের ঘরে।

অতঃপর ঐ ভদ্রমহিলা রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্তে তৃণখণ্ডের ন্যায় কোথায় যেন ভেসে গেলেন ! শুনেছি তাঁর জীবন নাকি মধুময় হয়েছিল। মধুময় কি বিষময় তা জানিনে তবে আমরা যে নিরাময় হয়ে বেঁচে গেলাম তা নিঃসন্দেহ।

কংগ্রেস অধিবেশনের জের তখনো চলেছে—বিশেষ করে প্রদর্শনীর। প্রদর্শনীর নানা দ্রব্য-সম্ভারের মধ্যে দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি মমত্ববোধ জাগানোই ছিল আসল উদ্দেশ্য। ঘরের জিনিস দীনতা-দুষ্ট হলেও তা যে ঘরোয়া, তাই আকর্ষণটা ছিল বড়। দিনের পর দিন পার্ক সার্কাসের ঐ জন-বিরল প্রান্তরে যে সাময়িক শহরটা গড়ে উঠেছিল সেইখানে জন-সমাগম হতো অগণিত।

লোকের আগ্রহে প্রদর্শনীরও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি হচ্ছিল। এই সময় একদিন এলেন সুভাষচন্দ্র আমাদের কাগজের অফিসে।

নিত্য বৈকালিক আসরটা বেশ জমে উঠেছে। আগন্তুককে দেখেই উপেনদা সহাস্যমুখে একেবারে রাজভাষায় তাঁকে সম্বর্ধনা করলেন—'Hallo G. O. C.'।

কর্মযোগী সুভাষচন্দ্রের আকৃতি গাম্ভীর্যময়। কিন্তু উপেন বাঁড়ুজ্যের সামনে সে গাম্ভীর্য জল হয়ে যেতো। তথাপি আজ তাঁর মুখে যে হাসির দীপ্তি দেখা গেলো তা যেন স্বতঃস্ফূর্ত—চিত্তের প্রসন্নতা থেকে তা উৎসারিত।

উপেনদা। একটা মৌলিক চাল যা হোক তুমি চেলেছ সুভাষ! ক্ষাত্র তেজকে অহিংসার আবরণ দিয়ে এমন চমৎকার তুমি ঢেকেছ যে, তারিফ করতে হয়। তোমার অহিংস্র-গুরু তোমার এই সৈনিক বেশ দেখে আবার উপবাস শুরু না করেন। কারণ, কায়েনমনসাবাচা অহিংস হতে হবে তো। তোমার মনের কথা কি তা জানি না তবে বচনে তুমি যে অহিংস তা তো নিত্য সভা-সমিতিতে প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ কায়ে যে কি রকম একটা গোলমাল করে ফেললে!

সুভাষ। শক্তি প্রকাশেরও একটা রূপ আছে উপেনদা, শক্তি প্রয়োগের কথা তো ওঠেনি।

উপেনদা। কিন্তু প্রয়োজন হলে কি করে অহিংস ভাবে প্রয়োগ করবে তাই ভাবছি। সৈনিক মারে না, মার খায়—এ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাইনি কি না তাই ভাবছি।

সুভাষ। দেশের ক্ষাত্রশক্তি খর্ব হয়েছে বহুদিন, তাকে উজ্জীবিত করাই আমার উদ্দেশ্য। নৈতিক বলের মোহে আমরা বহুদিন ঝিমিয়েছি, একটাকে বড় করতে গিয়ে আর একটাকে ছোট করেছি, গ্রন্থি আমাদের সেইখানেই, সেটা ছেঁড়া দরকার। নৈতিক বল নৈতিক বল করে বাহুবলের কথা ভুলেছি, ফলে বাহুবলের অভাবে নৈতিক বলের ছল খুঁজি। এই মিথ্যাচরণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, সচেতনতা যদি ফিরিয়ে আনতে পারি তবেই তা হবে সত্যিকারের কাজ।

উপেনদা। ব্যাপারটা ঠিক ধরেছ সুভাষ! আরে ঐ কথাটাই তো বলছি বারংবার তবু এ মোহাচ্ছন্ন দেশের যে মোহ কাটে না। বাংলা দেশটা যে শাক্তের। সেই শক্তির উপাসনা কই? এই সেদিনও স্বামী বিবেকানন্দ চাবুক মেরে গেলেন, তথাপি সাড়া নেই! শ্রীঅরবিন্দ যে দেখিয়ে গেলেন পথ—সেই পথের দিশারীকে কোথায় হারিয়ে ফেললে সব।

উপেনদার সহজ পরিহাস-প্রিয়তা গাম্ভীর্যে পরিণত হলো। সাধারণত তাঁকে এভাবে পাওয়া আমাদের পক্ষে সহজ ছিল না। কিন্তু সুভাষের মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল, তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি এইবার মুখর হয়ে উঠলেন। ফলে তিনিই বক্তা আর সব এখন শ্রোতা।

বলছিলেন তিনি তাঁর রাজনীতির গুরুর আদর্শের কথা, ক্ষত্রতেজের উপর যিনি আবার ভারতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাঁরই কথা। অনেকে বলেন ক্ষত্রতেজের অভাব তো ছিল না মহাভারতের যুগে, কিন্তু ঐ ক্ষত্রতেজের বিকাশেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আর ঐ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধই নাকি ভারতের অবনতি ও দীর্ঘকালব্যাপী পরাধীনতার মূল কারণ। ঐ যুদ্ধে তেজস্বী ক্ষত্রিয় বংশের সব লোপ হয়ে গেলো আর তারই ফলে এলো আমাদের পরাধীনতা। এই রাজনীতিক তত্ত্ব মূঢ়, ম্লেচ্ছ-চিন্তাপ্রসূত, একথা বলেছেন তাঁর গুরু। তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন এই তত্ত্ব তাঁর গীতার ব্যাখ্যায়। তাঁর ব্যাখ্যাটা হলো এই—

জাতীয় মহত্ত্ব কেবল ক্ষত্রতেজের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, চতুর্বর্ণের চতুর্বিধ তেজেই সেই মহত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। সাত্ত্বিক ব্রহ্মতেজ, রাজসিক ক্ষত্রতেজকে জ্ঞান, বিনয় ও পরহিত-চিন্তার মধুর সঞ্জীবনী সুধায় জীবিত রাখে, ক্ষত্রতেজ শান্ত ব্রহ্মতেজকে রক্ষা করে। ক্ষত্রতেজরহিত ব্রহ্মতেজ তমোভাব দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শূদ্রত্বের নিকৃষ্ট গুণসকলকে আশ্রয় দেয়, অতএব যে দেশে ক্ষত্রিয় নেই, সেই দেশে ব্রাহ্মণের বাস নিষিদ্ধ। যদি ক্ষত্রিয় বংশের লোপ হয়, নতুন ক্ষত্রিয়কে সৃষ্টি করা ব্রাহ্মণের প্রথম কর্তব্য। ব্রহ্মতেজ পরিত্যক্ত ক্ষত্রতেজ দুর্দান্ত, উদ্দাম আসুরিক বলে পরিণত হয়ে প্রথমে পরহিত বিনষ্ট করে, শেষে স্বয়ংও বিনষ্ট হয়। সত্ত্ব রজঃকে সৃষ্টি করবে, রজঃ সত্ত্বকে রক্ষা

করবে, সাত্ত্বিক কাজে নিযুক্ত হবে, তা হলেই ব্যক্তির ও জাতির মঙ্গল সম্ভব। সত্ত্ব যদি রজঃকে গ্রাস করে, রজঃ যদি সত্ত্বকে গ্রাস করে, তমঃপ্রাচুর্ভাবে বিজয়ীগুণ স্বয়ং পরাজিত হয়, তমোগুণের রাজ্য হয়। ব্রাহ্মণ কখনো রাজা হতে পারে না, ক্ষত্রিয় বিনষ্ট হলে শূদ্র রাজা হবে, ব্রাহ্মণ তামসিক হয়ে অর্থ-লোভে জ্ঞানকে বিকৃত করে শূদ্রের দাস হবে, আধ্যাত্মিক ভাব নিশ্চেষ্টতাকে পোষণ করবে, স্বয়ং ম্লান হয়ে ধর্মের অবনতির কারণ হবে। নিঃক্ষত্রিয় শূদ্রচালিত জাতির দাসত্ব অবশ্যম্ভাবী। ভারতের এই অবস্থা ঘটেছে।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যাঁরা ভারতবর্ষের অবনতির সূচনা দেখেন তাঁরা ভুলে যান যে ঐ যুদ্ধটা ঘটেছিল পাঁচ হাজার বছর আগে। আর, ঐ যুদ্ধের পর আড়াই হাজার বছর কেটে গেলে তবে ম্লেচ্ছদের প্রথম আক্রমণ ভারতের সিন্ধু দেশের অপর পার পর্যন্ত পৌছেছিল, অর্জুন প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ্য এতদিন ধরে ব্রহ্মতেজ অনুপ্রাণিত ক্ষত্রতেজের প্রভাবেই দেশকে রক্ষা করে এসেছিল।

উপেনদার কণ্ঠে আজ বাক্যের স্রোত এসেছিল। বুঝলাম সৈনিক সুভাষকে তিনি অন্তরে স্থান দিয়ে আনন্দ-মুখর হয়ে উঠেছেন। এক সময় হঠাৎ তাঁর বাক্য-স্রোত রুদ্ধ হয়ে গেলো। প্রয়োজন নেই আর তাঁর বক্তৃতার, তাঁর কাম্য আদর্শই যে মূর্তি পরিগ্রহ করে উঠছে সুভাষের মধ্যে।

সুভাষের হৃদয় আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠলো। তাঁর আদর্শের স্থূল, বাহ্য রূপটা বাদ দিয়ে তার আন্তর ঔজ্জ্বল্যে যে উপেনদা মুগ্ধ হয়েছেন, এইটিই তো তাঁর পক্ষে চরম ও পরম গৌরব।

সুভাষের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আরম্ভকাল দেখেছি। সাগরের বুকে ঈষৎ আন্দোলিত অনুচ্চ তরঙ্গ সে। একদিন তা যে উত্তাল হয়ে উঠে দিগদিগন্ত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তা তখনো ছিল সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন সুভাষ। ঝঞ্ঝা-সংক্ষুব্ধ সাগরের তলদেশে সেদিন দেখেছি এক অবিস্মরণীয় প্রশান্তি।

ভারতের মুক্তিসাধনায় সুভাষচন্দ্র যেমন স্বদেশের সকল প্রগতিপন্থীকে

চাইতেন সঙ্ঘবদ্ধ করতে, তেমনি বিদেশে যাঁরা ছিলেন এমনি মননশীল, তাঁদেরকেও তিনি করতে চাইতেন আকর্ষণ। বৈদেশিক সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে সুভাষচন্দ্রের প্রয়াসের মধ্যে কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্য ছিল; অনেক সময় তা আমাদের মতো সাধারণ বুদ্ধিজীবীর বিভ্রান্তি ঘটাতো, কেননা প্রগতির পরিপন্থী স্বার্থান্বেষী এমন অনেক নেতার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠতা করতে কুণ্ঠিত হন নি যাঁদের সহানুভূতির অন্তরালে দুরভিসন্ধি ছিল না—এমন বিশ্বাস পোষণ করা কঠিন হতো। কিন্তু সুভাষচন্দ্র করতেন রাজনীতি; তাঁর রাজনীতিতে জটিলতা কুটিলতার মধ্যে যে জিনিসটা ছিল সব চেয়ে বড় সেটা হচ্ছে তাঁর দেশাত্মবোধের সঙ্গে দুর্দমনীয় স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠা। পরানুগ্রহলাভে আত্ম-বিক্রয়ের সম্ভাবনাকে তিনি সব সময় দূরে রাখতেন। এক্ষেত্রে তিনি যে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন তা তাঁর রাজনীতিতে উত্তরকালে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতের শত্রু ইংরেজ, সুতরাং ইংরেজের শত্রুবর্গের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব করার বাধা ছিল না রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে। তিনি যেমন আইরিশ নেতা ডি ভ্যালেরার সঙ্গে সখ্য স্থাপন করেছিলেন তেমনি সৌহার্দ তাঁর হয়েছিল মুসোলিনী, হিটলার এবং টোজোর সঙ্গে এবং কতখানি স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মিক শক্তির উপর অটল বিশ্বাস তাঁর যে ছিল, তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রধান সেনাপতিরূপে। এটা ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু থাক সে কথা।

জাঁদরেল নেতা ছাড়া ক্ষুদে নেতাদের সঙ্গেও সম্প্রীতি স্থাপনে তাঁর কোন বাধা ছিল না, এমন কি তা শত্রুর ঘরের লোকদের সঙ্গে হলেই বা ক্ষতি কি? ঘরের শত্রু বিভীষণকে টেনে এনে মিত্র করার পন্থা তো আমাদের সনাতন। সুভাষচন্দ্র তাই ভাব করেছিলেন ইংরেজের শ্রমিক-দলের কারো কারো সঙ্গে যাঁদের অন্তরের না হোক মুখের উক্তিও ছিল ভারতের পক্ষে অনুকূল।

ইংরেজের শ্রমিক দলের মুখপত্র "ডেলী-হেরাল্ড"-এর প্রতিনিধি মিঃ ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড একবার কলকাতায় এসেছিলেন। সুভাষচন্দ্র একদিন নিয়ে এলেন তাঁকে নিমন্ত্রণ করে ফরওয়ার্ড অফিসে। সেদিন মহা ধূমধাম। পেলেটি হোটেল থেকে খানা এলো। কুচো মাংস ও সব্জীর পুট দেওয়া স্যাণ্ডউইচের

স্তূপ, কুঁচি দেওয়া রং-বেরঙের কাগজের মধ্যে বসানো হরেক রকমের কেক আর জোড়া সন্দেশের মতো লাল, নীল ক্রীমে মোড়া গোলাকার, ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ বিস্কুটের রাশি, আর তার সঙ্গে নেটিভ রুচির ভীমনাগের সন্দেশের ঝুড়ি! গোটা দশেক 'বয়' শুভ্র পোষাকে নীলকাপড়ের শিরস্ত্রাণের উপর হোটেলের তকমা এঁটে আজ্ঞাবহ হয়ে যথারীতি অপেক্ষা করছিল। গেরস্ত বাড়িতে জামাই এলে যেমন সেদিন মুগের ডালের মুড়িঘণ্টর সঙ্গে তিলপিটুলি বেগুন-ভাজার আস্বাদের আশায় ছেলে মেয়েদের দল নৃত্য করে, তেমনি সাহেবের আগমনেও আমাদের মনটা নেচে উঠেছিল। উপেনদার সঙ্গে মুড়ি ও নারকেল কুচি নিয়ে কাড়াকাড়ি করার দায় থেকে মুক্ত হয়ে অন্তত একদিনের জন্যেও রসনার একটু ভালো রকম তৃপ্তি হবে, এই আনন্দেই মনটা উঠেছিল নেচে। মিথ্যা বলবো না। সাহেবের চেয়ে সাহেবের আপ্যায়নের বস্তুগুলির উপর সেদিন আমাদের আকর্ষণ ছিল বেশি। সুভাষচন্দ্র তাঁকে নিয়ে কি খেলা খেলবেন খেলুন, আমাদের এদিকে যে তর সইছিল না। তিনি আমাদের মনোভাব বুঝেছিলেন কিনা জানি না, কিংবা হয়তো এটা তাঁর ভালো করেই জানা ছিল যে, পেটটা ঠাণ্ডা থাকলেই সব ঠাণ্ডাভাবে হৃদয়ে গ্রহণ করা যায়; তাই সাহেবের বক্তৃতা শুরু হবার আগেই ভোজ্যবস্তুর সদ্ব্যবহারের আদেশ হয়ে গেল। সাধু সাবধান! আমরা অতঃপর সাহেবের বক্তৃতা শোনবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি।

ব্রেল্‌স্‌ফোর্ড সাহেব তাঁর উদার মতবাদ প্রকাশ করবার সময় সেদিন বিশেষ করে সংবাদপত্র সম্বন্ধে যে বক্তৃতাটি দিলেন, তাতে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল! তিনি তাঁদের নিজেদের সংবাদপত্র ডেলী হেরাল্ডের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন, এক সময় এমন হলো যে, তাঁদের কাগজ বুঝি যায়-যায়; কর্তৃপক্ষ মহা সমস্যায় পড়ে ভাবতে লাগলেন তাঁরা কাগজ বন্ধ করবেন কি না—কারণ কাগজের প্রচারসংখ্যা তখন ষোল লক্ষ থেকে নেমে আট লক্ষে দাঁড়িয়েছিল। ভাবনারই কথা; কারণ তাঁদেরই কাগজের প্রচার-সংখ্যা ছিল সব চেয়ে কম; অন্যান্য কাগজের প্রচার ছিল ঊর্ধ্ব সংখ্যায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ লক্ষ।

বলে কি সাহেব! আমাদের বাংলা দৈনিকের প্রচার তখন চল্লিশ হাজার ছাড়িয়ে গেছে, ইংরেজী দৈনিক প্রায় ত্রিশ হাজার উঠেছে; আমাদের উল্লাস আর ধরে না, কি একটা অসাধ্য সাধন যেন আমরা করে ফেলেছি। ভাবতাম তখন আমাদের কাগজ আরো কত ছাপা হবে। 'কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ।' কিন্তু আমাদের আশা বা কল্পনার দৌড় লাখের বেশি ছিল না আর সাহেব বলে কি না চল্লিশ পঞ্চাশ লাখের কথা! কি আজব দেশ রে বাবা! রসনার এমন তৃপ্তির পর এ কি বজ্রাঘাত। মনটা দমে গেল নিজেদের অক্ষমতার কথা ভেবে। দীন দরিদ্র দেশের অশিক্ষিতের সংখ্যা বাহুল্যই আমাদের এই দৈন্যের কারণ জেনে মনটা পীড়িত হলো। তবু ভেবেছিলাম সেদিন, আমরা তো এই অপবাদ অপনোদনের ভারই নিয়েছি; কে জানে আমাদের কাগজও একদিন লাখে লাখে বিক্রি হবে না? আমাদের বর্তমান প্রচার-সংখ্যার কল্পনাও তো এর আগে বাংলা দেশে ছিল না। "আসিবে সে দিন আসিবে" বলে মনটাকে সেদিন কোন প্রকারে প্রবোধ দিয়েছিলাম।

১৯২৯ সালের কংগ্রেসে "পূর্ণ স্বরাজ" প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। কিন্তু তার পরেও প্রায় বছরখানেক কেটে যায়, তবু ইংরেজ এক বিন্দু স্বরাজ দিবার জন্যেও প্রস্তুত হলো না। দেশের লোকেদের মনে অবসাদ ঘনিয়ে এসেছে। আবার সকলকে সঞ্জীবিত করে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দেওয়া চাই। ক্ষীর-সমুদ্র না থাক, আমাদের দেশের আশে পাশে লবণসমুদ্রের অভাব নেই। সমুদ্রের জল একটু জ্বাল দিয়ে নিলেই লবণ তৈরী হতে পারে। ভাতের সঙ্গে আর কিছু না হোক, একটু কুড়িয়ে পাওয়া লবণ মিশিয়েও এই গরীব দেশের লোকেরা তা গলাধঃকরণ করতে পারে; কিন্তু আইনত তা করবার অধিকারও আমাদের কারুর নেই!—এমনি ইংরেজের শোষণ নীতির চাল। গান্ধীজী এই নিয়ে শুরু করলেন তাঁর অহিংস-আন্দোলনের নব পরিকল্পনা।

বিজয়লাল "ইয়ং ইণ্ডিয়া"র নিয়মিত পাঠক। এই নব পরিকল্পনা তাকে আলোড়িত করেছিল। মাথায় কি একটা খেলছিল তার। ক'দিন থেকে তার থমথমে ভাবের মধ্যেও ছিল একটা অস্বস্তিকর অস্থিরতার ভাব। এই

সময় হঠাৎ সে একদিন টেবিলের উপরে দাঁড়িয়ে উঠে খদ্দরের হাফ-শার্ট পরা সুদীর্ঘ দেহটা সকলের দৃষ্টিগোচর করে বক্তৃতার ভঙ্গিতে ঘোষণা করলে, "আজ থেকে আমার চা ত্যাগ।"

চা-পানে কি অপরাধ তা বুঝতে পারি নি। সে জন্যে বিজয়লালের কাছে কোন কৈফিয়ত চাওয়াও আমরা সঙ্গত বোধ করি নি। জানি এটা তার একটা খেয়াল এবং এ ধরনের খেয়াল তার স্বভাবের সঙ্গে জড়িত। মাঝে এই কিছুদিন আগে তার খেয়াল উঠেছিল, আমাদের সকলকে সে বিকাল বেলার দিকে একটু ব্যায়াম চর্চা করাবে। সে বলতো "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্", শুধু বুদ্ধির চর্চা করে করে শরীর যে এদিকে সবার শুকিয়ে যাচ্ছে, শরীরটা খাড়া রাখতে পারলে তবে না বুদ্ধির চর্চা। তার মুখে এই অনুশাসন মানাতো বৈকি। পেশীবহুল ঐ সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহটার দিকে চাইলে ব্যায়াম বিষয়ে তার যে বলবার অধিকার আছে, তা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না! আমাদের ঘরের সামনেকার খোলা ছাদে জোড়ায় জোড়ায় পায়ে জড়িয়ে দিয়ে আমাদের সবাইকে সে দৌড় করাতো। সে সময় তার হাত থেকে কারো নিস্তার পাবার জো ছিল না— না আমাদের বেঁটে প্রেমেনের, না আমাদের কণ্ঠি-বার-করা নির্জীব নরেশ সেনগুপ্তের। দিন কতক সে এক মজার ব্যাপার। হাসি হুল্লোড়ের সঙ্গে শরীরে দ্রুত রক্ত সঞ্চালনের ফলে দেখতাম মাথাটা সত্যিই পরিষ্কার হয়েছে এবং রসভার দেহের জড়তা কেটে গিয়ে দেহটা হয়েছে বেশ লঘু। ভালোই লাগতো। বিজয়লালের এই অদ্ভুত ব্যায়াম প্রক্রিয়ার নাম ছিল 'মুর্গীর লড়াই।"

বিজয়লালের ঘোষণা ত্যাগধর্মী। তার নড়চড় হবার জো ছিল না। এ বিষয়ে সে ছিল খাঁটি গান্ধী-পন্থী। উপেনদা বিজয়লালের এই ঘোষণা শুনে বললেন—ক্ষেপচুরিয়াস। আবার ক্ষেপেছে। **Experiment with Truth** হবে হে। উপেনদা একটু হাসলেন। কিন্তু সে হাসিতে ছিল যেন একটা আশঙ্কার আভাস। অতঃপর তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ বাদে তিনি বলে উঠলেন—আমার মনে হচ্ছে বিজয়টা এবার এখান থেকে

বিদায় নিয়ে হুন চুরি করতে বার হবে। আর পুলিশের কয়েক ঘা লাঠি খেয়ে দন্ত ইজ দি ছিরকিটি করে কোথাও পড়ে থাকবে অহিংসার বালাই নিয়ে।

উপেনদা ছিলেন গান্ধীজীর উপর হাড়ে-চটা। অহিংসার আন্দোলন শুরু হবার সময় থেকে আমরণ তিনি গান্ধীজীর এই নীতির নিন্দা করে গেছেন। এটা যে একটা মহত্তর পন্থা নয়, একথা বলতে তিনি কোনদিন কুণ্ঠিত হন নি এবং তাঁর এই বিশ্বাস থেকে কেউ তাঁকে বিচ্যুত করতে পারে নি কখনো।

বিজয়ের জন্যে সত্যিই তিনি শঙ্কিত হয়েছিলেন। শাক্ত বাংলার এই বৌদ্ধ রূপান্তর তিনি আদৌ বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। বিজয়ের প্রতি তাঁর স্নেহ যে কতখানি গভীর ছিল, তা শুধু টের পেলাম সেদিন।

বাস্তবিক এর কিছুদিন বাদে বিজয়লালের অন্তর্ধান হলো। লবণ আইন ভঙ্গের জন্যে সে বোধ হয় মহিষাদলের দিকে ছুটেছিল; উপেনদার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হলো।

শাক্ত মতের উপাসক উপেনদা দ্বীপান্তর থেকে এসে বড় বেশি রাজনীতি করেন নি—অন্তত প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রে তাঁকে বেশি দিন দেখা যায় নি। একবার বীরেন্দ্র শাসমল প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি রূপে বোমারু বিপ্লবীদের কর্মপন্থার নিন্দাসূচক অভিভাষণ দেবেন জানতে পেরে, উপেনদা সদলবলে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হয়ে সেখানে দক্ষযজ্ঞ করে এসেছিলেন। তারপর দেশবন্ধুর স্বরাজ দলে প্রত্যক্ষ ভাবে তিনি যোগ দিয়েছিলেন, তার কারণ গান্ধী-বিরোধী মনোভাবের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর অন্তরের সাড়া। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর মসি ছেড়ে তিনি অসি ধরতে চান নি।

বিজয়লালের অন্তর্ধানের পর একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি আমাদের ঘরে এসে হাত-পা এলিয়ে দিয়ে বলতে সুরু করলেন:

—"ওহে শোন। ১৯০৭ সালের কথা বলছি। মামলার সে সময় যেন ধূম পড়ে গেল। 'যুগান্তরের' নামে রাজদ্রোহের মামলা চলছিল। ওদিকে

আবার 'বন্দেমাতরম'-এর নামে রাজদ্রোহের অভিযোগ এসে পড়লো, কারণ 'যুগান্তরের' কয়েকটা প্রবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ তাতে প্রকাশিত হয়েছিল। পুলিশ জানতে পেরেছিল অরবিন্দ ঘোষই বন্দেমাতরম চালান—তিনিই ঐ কাগজের সম্পাদক ; কিন্তু বহু সাক্ষী-সাবুদ খাড়া করেও তারা প্রমাণ করতে পারলে না অরবিন্দ ঘোষই ঐ কাগজের সম্পাদক। কাজেই অরবিন্দ মুক্তি পেলেন। সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি ভেবেছিলেন যুগান্তরের সম্পাদক ভুপেন দত্ত যেমন আত্মপক্ষ সমর্থন না করে জেলে গিয়েছিল, অরবিন্দ ঘোষও তেমনি বিনা বাক্য ব্যয়ে সুড়সুড় করে জেলে যাবেন। কিন্তু অরবিন্দ ঘোষের তেমন বীরত্ব দেখাবার প্রবৃত্তি আদৌ ছিল না। ভারতবর্ষে রাজনীতির চর্চা যে শিশুশিক্ষার নীতিকথার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, একথা তিনি মোটেই বিশ্বাস করতেন না। 'শঠে শাঠ্যং' নীতিটা যে ধর্মসঙ্গত নয়, একথা তাঁকে কখনো বলতে শুনি নি।

বুঝলাম বিজয়ের বিরহে উপেনদার এই ক্ষোভ। বললেন—এমন সোনার চাঁদ ছেলেটা মাটি হয়ে গেল হে, 'আবাদ করলে ফলতো সোনা।'

বন্দেমাতরম আর অরবিন্দের কথা উঠতেই আমরা সেদিন চেপে ধরলাম উপেনদাকে তখনকার কথা কিছু বলতে। উপেনদাও বন্দেমাতরমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন—তিনি ছিলেন সহকারী-সম্পাদক। কাগজ কি ভাবে চলতো সম্পাদক অবস্থায় অরবিন্দের ধরন-ধারণ কি রকম ছিল ইত্যাদি কথা জিজ্ঞেস করতে উপেনদা বলে গেলেন :

—দাদারে দাদা ! প্রথম অরবিন্দকে যেদিন চাক্ষুষ দেখি সেদিন একেবারে হতাশ হয়েছিলুম। তাঁর সম্বন্ধে আমার সমস্ত কল্পনা একেবারে ধূলিসাৎ হয়েছিল। বন্ধু বান্ধবদের মুখে তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনেছিলুম। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য, অদ্ভুত মনীষা ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের বিষয় কতো যে শুনতুম। তারপর যেদিন শুনলুম তিনি বরোদা কলেজের আটশো টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানে আসছেন ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক হয়ে মাত্র দেড়শো টাকা বেতনে, তখন বিস্ময়ে আমার হাঁ হয়ে গেল এত্ত বড়। লোকটির অনন্যসাধারণ ত্যাগের কথা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলুম।

আমি যখন বন্দেমাতরম অফিসে প্রথম যাই, অরবিন্দ তখন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দেওঘরে পলাতক। সেটা ছিল ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাস। এর মাস দুই পরে একদিন শুনলুম অরবিন্দ এসেছেন এবং এসেছেন শুধু নয়, আমার পাশের ঘরেই সশরীরে বর্তমান! শুনতেই এক ঝলক রক্ত যেন সারা শরীরে বিদ্যুতের মতো সঞ্চালিত হলো! যাঁর সম্বন্ধে এত শুনেছি যাঁর লেখা পড়ে মনে হতো উঃ কি ভাষা—যেন আরবী ঘোড়ার জুড়ি চলেছে টগবগ্ টগবগ্ করে, তাঁকে দেখবার কৌতূহল হতো প্রায়ই। দেশ-বিদেশের জানা-অজানা কতো বড় বড় লোকের ছবি মিলিয়ে মনে মনে তাঁর একটা ছবি এঁকে রেখেছিলুম। আজ চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

চুপি চুপি পাশের ঘরের দরজার কাছে সাহস করে এগিয়ে উঁকি মেরে দেখলুম—কই কোথায় অরবিন্দ? আমাকে একজন সহকর্মী একটা চেয়ারের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালে—সেখানে কাষ্ঠপুত্তুলির ন্যায় আড়ষ্ট কি যেন একটা মূর্তি দেখা যায়।

ব্যোম ভোলানাথ! এই অরবিন্দ! মনে মনে বললুম, মা ধরিত্রী! দ্বিধা হও মা। ঐ রোগা, কালো, সিড়িঙ্গে প্রাণীটিই অরবিন্দ! উনিই আমাদের Chief? তার চেয়ে বরং শ্যামসুন্দরবাবু ছিলেন ভালো। তিনি বেঁটে বটেন, তবু তাঁর প্রমাণসই দাড়ি আছে। হেমেন্দ্রবাবুরও বেশ নধর-কান্তি ভদ্রলোকের মতো চেহারা। কিন্তু এ কি!

মনটা প্রায় দমে গিয়েছিল, এমন সময় সেই কাষ্ঠমূর্তি আমার দিকে চাইলেন। সে চাহনির যে কি বিশেষণ তা খুঁজে পাই না। কালো তারার আশে পাশে একটা কৌতুকপ্রিয় তরলতা মাখানো ছিল, কিন্তু ঐ তারার মাঝখানে এমন একটা কি অতলস্পর্শ ভাব ছিল, যা আজও বিশ্লেষণ করে উঠতে পারি নি।

মুখশ্রী দেখে অরবিন্দকে ধরবার উপায় ছিল না। তিনি ছিলেন বর্ণচোরা আম। বাহির দেখে তাঁর ভিতর বুঝবার জো ছিল না।

সে যাক্। বন্দেমাতরম অফিসে আমি যখন ঢুকি, তখন দেখতুম নিয়ম-শৃঙ্খলার ধার বড় কেউ ধারতেন না। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ শ্যামসুন্দরই

লিখতেন। 'প্রেরণা' না এলে তাঁর কলম থেকে প্রবন্ধ বার হতো না, কিন্তু তাঁর প্রেরণা যে কখন আসবে তার স্থিরতা ছিল না। কোন দিন বা চায়ের পেয়ালায় চুমুক মারতেই তাঁর প্রেরণা এসে গেল; আবার কোনদিন বা চা পানের পর ছিলিম চারেক তামাক পুড়িয়েও তাঁর প্রেরণা আসতো না। প্রিণ্টার বেচারা পড়তো মুস্কিলে। এই প্রেরণা-ধর্মীর মুখের দিকে চেয়ে থাকলে তো আর কাগজ বার হবে না সময় মতো। কাগজ বার হতে তাই দেরি হয়ে যেতো মাঝে মাঝে।

অরবিন্দ পাকাপাকি ভাবে যখন বন্দেমাতরমের ভার নিলেন, তখন আমাদের সে দুঃখ ঘুচলো। তিনি দেওঘর থেকে আসার পর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সুবোধবাবুর বাড়িতে বাসা নিলেন। সেখান থেকেই প্রবন্ধ লিখে যথাসময়ে অফিসে পাঠিয়ে দিতেন। অফিসে বড় একটা আসতেন না, এলেও কথাবার্তা বেশি বলতেন না। অত্যন্ত স্বল্পভাষী লোক। তা ছাড়া বাংলা চলতি ভাষার উপর তাঁর তেমন দখল ছিল না বলেই বোধ হয় তাঁর কথাবার্তা বলার সুবিধা হতো না। তাঁর বাংলা উচ্চারণ অনেকটা সাহেবী ধরনের ছিল বলে আমরা তাঁর আড়ালে মুখ টিপে টিপে হাসতুম। অথচ বাংলা লিখতেন তিনি চমৎকার।

এমন অসাধারণ, একাগ্রচিত্ত লোক জীবনে আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সুবোধবাবুর বাড়িটা ছিল আড্ডাখানা। সেখানে একদল গাল-গল্প জুড়েছে; আর একদল অট্টহাস্যে ছাদ কাঁপিয়ে তুলেছে; আবার কেউ কেউ বা মহাতর্ক জুড়ে প্রায় হাতাহাতির উপক্রম করেছে, এই ভীষণ দুর্যোগের মধ্যে এক কোণে বসে নির্বিকার ভাবে তাঁকে প্রবন্ধ লিখতে কিংবা কোন বই পড়তে দেখেছি। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপও নেই!

রাশভারি লোক বলে আমরা তাঁকে ভয়ও করতুম, ভক্তিও করতুম। তাঁর কথার কোনরূপ প্রতিবাদ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। কাজকর্মের কোনরূপ গোলমাল হলে বিরক্ত হয়ে তিনি চুপ করে যেতেন; আর যখন খুব বেশি রেগে যেতেন সে সময় তাঁর ঠোঁট দুটো একটু পত্‌পত্‌ করে কেঁপে উঠতো। সেই সময় সবাই প্রমাদ গণতো।

একবার এমনি ঘটনা ঘটেছিল। আমাদের মধ্যে বিনয়বাবু নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন আমাদের সহযোগী। একাধারে এত গুণ এই কলিযুগে খুব কম লোকেরই দেখা যায়। বিনয়বাবু এসেছিলেন সুবোধবাবুর স্ত্রীর যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা করতে। একে যক্ষ্মা রোগ, তার উপর বিনয় বাবুর চিকিৎসা, সুতরাং রোগী অল্প দিনের মধ্যেই এই ধরাধাম ত্যাগ করে শান্তিধামে প্রস্থান করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বিনয়বাবু কথকথা করে, থিয়েটারী মঞ্চে অভিনয় করে এবং সং দেখিয়ে সুবোধবাবুর বাড়ির বৃদ্ধামহলে এমনি পসার জমিয়ে নিয়েছিলেন যে, সেখান থেকে ক্রমাগত সুপারিশ আসতে লাগলো, বিনয়বাবুকে যা হোক একটা কাজে-কর্মে আটকে না ফেললে এমন রত্নটি হাতছাড়া হয়ে যাবে। কাজেই বন্দেমাতরম অফিসে তিনি একটি হোয়াটনট হয়ে এলেন।

একদিন হলো কি, বিনয়বাবুর উপর ভার পড়লো রাতে প্রুফ দেখার। অরবিন্দের প্রবন্ধে একটা শব্দ ছিল **churchianity**, বিনয়বাবু বেচারা **churchianity**র ধার ধারেন না। তিনি ঐ কিম্ভূতকিমাকার শব্দটি নিঃসংশয়চিত্তে অবলীলায় কেটে শুদ্ধ করে লিখে দিলেন **Christianity**. পরদিন সকাল বেলায় কাগজ খুলেই অরবিন্দ দেখলেন কোন্ মহাপণ্ডিত তাঁর লেখার উপর কলম চালিয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানলেন ঐ সংশোধন কার্যটি বিনয়বাবুর কৃত। অরবিন্দের এজলাসে ডাক পড়লো তাঁর। বিনয় বাবু হাত জোড় করে বললেন—কি করবো মশায়, দোষ আমার নয়, দোষ ইউনিভারসিটির। আমি এক গাদা বই পড়ে বি-এ পাশ করেছি, কিন্তু কোথাও **churchianity**র দেখা পাই নি। বক্তৃতা হয় তো আরো কিছুক্ষণ ধরে চলতো, কিন্তু হঠাৎ অরবিন্দের ঠোঁটে কম্পন দেখা দিল। বিনয়বাবু বেগতিক দেখে প্রাণ নিয়ে সেখান থেকে চোঁচা দৌড় দিলেন!

মেজাজে ও কথাবার্তায় অনেকটা সাহেবী ধরনের হলেও অরবিন্দকে দেখেছি খাঁটি বাঙালী রূপে। ধুতি চাদর আর একজোড়া চটিজুতা ছিল তাঁর সম্বল। ঘরের আসবাবের মধ্যে শোবার একখানি খাট আর টেবিলের উপর ছড়ানো একগাদা বই। বাবুয়ানির কোন চিহ্ন তাঁর ভিতর কোন দিন দেখিনি।

পূর্বজন্মের সংস্কার কি না জানি না, কিন্তু সাহেবিয়ানার মধ্যে পালিত হওয়া সত্ত্বেও হিঁদুয়ানীর প্রতি তাঁর প্রগাঢ় একটা শ্রদ্ধা দেখা যেতো। ১৯০৭ সালে সুরাট-কংগ্রেস থেকে ফেরবার পথে বিষ্ণুভাস্কর লেলে নামক এক মারাঠী সাধকের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং অরবিন্দ তাঁরই কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি সুবোধবাবুর বাসা ছেড়ে আলাদা বাসায় বাস করতে শুরু করলেন। এই সময় থেকে ধর্মসাধনায় তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়ে যেতো, এই সময় অরবিন্দ আহারাদি বিষয়েও কঠোর সংযম অভ্যাস করতেন। দেশে একটা ধর্মভাব না জাগলে যে রাজনৈতিক বিপ্লব সফল হবে না, এই মতবাদ তিনি এই সময় থেকেই প্রচার করতে আরম্ভ করেন। তাঁর জীবনের গতি এখন থেকে নতুন দিকে ফিরলো। তাঁর মধ্যে নতুন পরিবর্তনও দেখা যেতে লাগলো।

ভগবানের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ লেলের শিক্ষার গোড়ার কথা। লেলের বিশ্বাস ছিল ভগবানের কাছে প্রত্যাদেশ না পেলে দেশের কাজে সফলকাম হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আমরা অনেকেই লেলের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলুম, কিন্তু সম্পূর্ণ ভাবে আত্মসমর্পণ করবার চেষ্টা এক অরবিন্দ ছাড়া আর কারো ভিতর দেখি নি। আমাদের ভিতরে ছিল 'লক্ষ্যবিহীন লক্ষ বাসনা' সেগুলিকে গুটিয়ে নিয়ে ভগবানের প্রত্যাদেশের প্রতীক্ষায় ঊর্ধ্বমুখ হয়ে থাকা আমাদের পোষাতো না। জ্ঞানকাণ্ডের চেয়ে কর্মকাণ্ডের দিকেই আমাদের ঝোঁক ছিল বেশি। কিন্তু সমস্ত কর্মজাল থেকে নিজেকে বিমুক্ত করে ভগবানের দিকে ফিরবার অসাধারণ ক্ষমতা অরবিন্দের ছিল। ক্রমে ব্যাপারটা দাঁড়ালো এই যে, কোন একটা কাজের মীমাংসা তাঁর কাছে জানতে চাইলে তিনি হাঁ, না, কোন জবাবই দিতেন না; বলতেন ভগবান যা ইচ্ছা করেন তাই হবে; তিনি নিজে কোন বিষয়ের মীমাংসা করবার চেষ্টা করবেন না। আমরা হাল ছেড়ে দিতাম, ভাই। ভগবান বেচারার নাগাল তখন পাই কোথায়?

লেলের সাধন-পন্থার প্রতি তিনি এতদূর আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার কারণও ঘটেছিল। সুরাট-কংগ্রেস থেকে ফেরবার সময় এমন কতকগুলি অসাধারণ

ঘটনা ঘটে, যার ফলে যোগশক্তির উপর তাঁর শ্রদ্ধা হয়েছিল অগাধ। একবার একটা সভায় তাঁকে বক্তৃতা করতে বলা হয়। লেলে তাঁকে বললেন—'বক্তৃতার বিষয় তুমি নিজে চিন্তা করো না। তোমার ডাক পড়লে তুমি ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো! ভগবান তোমার মুখ দিয়ে যা বলাবেন তাই বলে যাবে।' অরবিন্দও একান্ত বিনীত শিষ্যের মতো গভীর বিশ্বাসে তাই করলেন। সভায় প্রায় পাঁচ মিনিট কাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবার পর তাঁর মনে হলো, যেন ভিতর থেকে একটা শব্দ উঠে তাঁর মুখ দিয়ে বার হচ্ছে। তিনি যন্ত্রবৎ দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর মুখ দিয়ে কথা বার হতে লাগলো। আর একদিন তাঁর ঐ রকম আর একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হয়েছিল। একদিন রেলগাড়িতে আসতে আসতে তিনি দেখলেন যেন লোকজন, গাড়ি, স্টেশন, গাছপালা সমস্তই একটা চৈতন্যময় সত্তাকে আশ্রয় করে ভেসে রয়েছে।

ধর্মবিশ্বাসে এমন শিশুর মতো সরল লোক খুব কমই দেখেছি। এর পর জেলের ভিতরেও তাঁর অতীন্দ্রিয় অনুভূতি অনেক হয়েছে। সে যাই হোক, আমাদের মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত। নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে গুটিয়ে নিয়ে তিনি তাঁর চিত্তকে করেছিলেন ভগবানমুখী। তাঁর ভিতর কি কি পরিবর্তন ঘটছে, তার খবর আমাদের মধ্যে বড় একটা কেউ রাখতো না। তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারতুম যে, দিন দিন তাঁর চেহারার পরিবর্তন হচ্ছে। শুকনো কাঠের মতো ম্যালেরিয়া-ক্লিষ্ট শরীরের মধ্যে যেন অপূর্ব, শান্ত দিব্যশ্রী ফুটে উঠছে। চোখে মুখে কোথাও চাঞ্চল্য বা উদ্বেগের লেশ মাত্র নেই। দেখলেই মনে হতো যেন তিনি নিজের ভিতর এমন একটা আশ্রয় পেয়েছেন যেখানে বাইরের গণ্ডগোল আর পৌছতে পারে না।*

এই পর্যন্ত বলে উপেনদা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। মনে হলো তাঁর মনটা উড়ে চলে গেছে সেই অতীত দিনগুলির মাঝে, যেখানে অরবিন্দ কর্মী-

* গল্পটি উপেনদা অধুনালুপ্ত 'বঙ্গবাণী' মাসিক পত্রেও প্রকাশ করেছিলেন 'অরবিন্দ প্রসঙ্গ' নাম দিয়ে।

রূপে এক অপার অনন্ত রহস্যের সন্ধানে ধীরে ধীরে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছেন তাঁদের সাহচর্য থেকে।

সদা হাস্যময় উপেনদার মুখে গাম্ভীর্যের ছায়া পড়েছে। ভাবলাম হয়তো আরো কিছু পাওয়া যেতে পারে তাঁর কাছ থেকে আজ।

বললাম—উপেনদা, যখনকার কথা বলছেন তারপর তো এক যুগ কাটালেন পোর্ট ব্লেয়ারে ঘানি টেনে আর নারকেল দড়ি পাকিয়ে। যখন খালাস পেলেন তখনো তো আর একবার ছুটলেন অরবিন্দের কাছে পণ্ডিচেরীতে। কিসের আশায়?

—ছুটলাম বই কি ভাই, ভগবানের প্রত্যাদেশের আর কত বাকি তাই জানতে গিয়েছিলুম।

—ভগবান, কিংবা অতীন্দ্রিয় অনুভূতি—এ সবের কোনই হদিস পান নি? কেনই বা চলে এলেন অত শীগ্‌গির?

—ভগবান বস্তুটি কি তার হদিস আজও পাইনি। তবে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি একটু আধটু যে হয়নি, একথা আর পোড়া মুখে কি করে বলি! কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়ে গেল। আগেই বলেছি ধৈর্য বস্তুটি আমার ধাতে ছিল না। বিধাতা পুরুষ বলে যদি কেউ থেকে থাকেন তবে তিনি ঐ মহামূল্য বস্তুটি আমাকে দিতে ভুলে গেছেন। কাজেই কর্তার কাছে বিদায় নিয়ে অতি সত্বর পালিয়ে এলুম।

শোন তবে বলি অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কথা:

—ভাই, একদিন তো কর্তা দিলেন আমাকে পুরে একটা ঘরে, বললেন ধ্যান করতে। ছুঁয়েছিলেন কিনা এখন ঠিক মনে নেই। চোখ দু'টি মুদ্রিত করে সেই প্রকাণ্ড ঘরে আমি একা বসে গেলুম। খুব বেশিক্ষণ নয়, একটু বাদেই আমার মনে হলো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা সীমাহীন আলোক-সমুদ্র—আমার সত্তা তাতে বিলীন হয়ে গেছে; আমার যে বাহ্য 'আমি' আর এই প্রত্যক্ষ স্থূল জগতের সঙ্গে এখানকার কোনই মিল নেই; বাহ্যত আমার কোন জ্ঞান ছিল কি না জানি না, তবে অন্তরে যে বোধটা ছিল তাতে যে আনন্দের আস্বাদ পেয়েছি তা প্রকাশ করবার কোন ভাষা নেই; সে যে কি তা

কেবল বোধ হয় অনুভূতিতেই ধরা পড়ে। পরে যখন ধ্যান ভাঙলো তখন মনে হয়েছিল আমার এই দেহরূপ খোলসে আবদ্ধ 'আমি' ছাড়াও আর একটা 'আমি' আছে যা আনন্দময়, রসঘন, নিত্য শান্ত। কিছুক্ষণের জন্যে আমার দেহটা হয়ে গিয়েছিল অত্যন্ত লঘু, আমার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন যোগাযোগটা ফিরিয়ে আনতে কিছুটা দেরি হয়েছিল সেদিন।

আর একদিনের কথা বলি। একটা সাধু এলেন একদিন অরবিন্দ আশ্রমে —প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া সাধু, দিব্য গৌরকান্তি; বাপ রে কি চোখ! তিনি এসেছেন অরবিন্দের সঙ্গে দেখা করতে গুটিচারেক প্রশ্ন নিয়ে, সেগুলির সমাধান চাই।

কর্তার কাছে খবর গেল। কর্তা বলে দিলেন দেখা হবে না। দেখা হবে না? সেকি! সুদূর হরিদ্বার অঞ্চল থেকে পায়ে হেঁটে এসেছেন তিনি এতটা পথ অরবিন্দ-দর্শনে আর অরবিন্দ বলেন কিনা দেখা হবে না? কর্তা তো দেখলুম নির্মম। তিনি সাফ জবাব দিয়ে দিলেন—না, দেখা হবে না।

বারীন অনেক বুঝালে সাধুকে, ফল হলো না। সাধু গান্ধী মহারাজের মতো অহিংস ভাবে হুমকি দিলেন—প্রশ্নের জবাব চাই, নইলে 'পাদমেকং ন গচ্ছামি'। বারীন রণে ভঙ্গ দিয়ে কর্তার কাছে অসহায় ভাবে খবরটা দিলে।

এখনকার মতো কর্তা তখনো একান্তে অন্তর্ধান করেন নি। আমাদের সঙ্গে মিলে মিশে গাল-গল্প, হাসি-ঠাট্টাও চালাতেন। আমার কি দুর্বুদ্ধি হলো ভাই, হঠাৎ বলে বসলুম কর্তা, হুকুম যদি করেন তো আমিই একবার দেখি সাধুকে চেষ্টা করে, দেখি সাধুর দৌড় কত দূর।

কর্তা একটু হাসলেন। তারপর বারীনের দিকে চেয়ে বললেন—সেই ভালো, উপেনটা দুর্মুখ আছে, ঐ পারবে ওকে বোঝাতে।

ব্যস্। হুকুম পেয়ে গেলুম সাধুর কাছে সাহসে ভর করে। বললুম সাধু মহারাজ, দেখা তো করতে এসেছেন প্রশ্ন নিয়ে, কি আপনার প্রশ্ন একবার বলুন তো দয়া করে। সাধু পর পর চারটি প্রশ্ন করে বসলেন।

কোথা থেকে যে সাহস এসে গেলো তা বলতে পারি না ভাই, আমি

মুখ খুললুম। মুখ খুললুম বললে ভুল হবে, আমার মুখটা খুলে গেলো! বেশ বুঝতে পারছিলুম হাঁ-টা শুধু আমার, আর শব্দগুলি আসছে অন্য কোথা থেকে অনর্গল। কতক্ষণ ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ঘণ্টাখানেক হবে সাধুকে দিলুম বক্তৃতা।

শান্ত, ধীর অবস্থায় সাধু আমার মুখের দিকে চেয়ে আমার অনর্গল বক্তৃতা শুনে গেলেন। সাধু নির্বাক ছিলেন। আমি যখন থামলুম তখন সাধুর ঐ বিরাট মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব হাসি ফুটে উঠলো। কি তিনি পেলেন জানিনা। তবে তিনি তাঁর সত্যাগ্রহের আসন ছেড়ে দিয়ে বলে উঠলেন—'মিল্ গিয়া, আনন্দ্ হো গিয়া'।

তারপর একটা আভূমি প্রণতি জানিয়ে সাধু নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। প্রণামটা আমাকে নয়, বোধ করি অরবিন্দের উদ্দেশ্যেই।

ভাবলুম, 'বারে ভেল্কি বা।'

লবণ-সত্যাগ্রহ শুরু হবার আগে কিছুকাল থেকে সুভাষ-সেনগুপ্তের বিরোধ চরমে উঠলো। ব্যাপারটা চলছিল অনেকদিন থেকেই কিন্তু এতখানি তিক্ত ও বিষাক্ত আর কখনো হয়নি এর আগে। কংগ্রেসের বড় কর্তারা বিরক্তি প্রকাশ করেন। অন্য প্রদেশের লোকেরা এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্রোক্তি করতে থাকে। আমরা পীড়িত মনে ভাবি বাংলা দেশের মুখ বুঝি বা ম্লান হয়ে যায়।

দলাদলি শত্রুতার আকার ধারণ করলে তা সভ্য মানুষের মনকেও টেনে আনে নীচের দিকে। রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিও বীভৎস, কুৎসিত কাজে নামতে কুণ্ঠা বোধ করে না। এই মনোভাব প্রকাশ পেতো উভয় দলের সভাধিবেশনের সময়। এক দল সভা করতে চাইলে আর এক দল সেখানে আগে থেকে উপস্থিত হয়ে বিপক্ষ দলকে ঠেঙিয়ে সভা পণ্ড করে দেয়। সেনগুপ্তের দলের লাঞ্ছনার কথা আমাদের কাগজে প্রকাশ পায় না। সেনগুপ্ত দেখলেন তাঁর নিজস্ব দলের কাগজ না থাকায় এর প্রতিকার সম্ভব নয়; অতঃপর

তিনি তাঁর দলের একখানি মুখপত্র প্রকাশের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

আমাদেরও মনের অধোগতি হতে চলেছে। প্রাদেশিক নেতৃত্বের পর্যায় থেকে অখিল ভারতের নেতৃত্বের পর্যায়ে উন্নীত হতে হলে সমকক্ষ কোন্ নেতাকে সংবাদ পরিবেশনের কৌশলে কিরূপ বামনাকার করা যায়, তার সম্বন্ধে আমাদের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে নির্দেশ আসে। এ জন্যে অন্তরে অন্তরে পীড়া বোধ করতাম বৈকি।

উপেনদা যেন দূরদৃষ্টি দিয়ে দেখলেন এটা শুধু আমাদের ব্যক্তিগত মনের অপ্রসার নয়, আমাদের কাগজের ভবিষ্যৎও অনুজ্জ্বল।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর উপেনদা প্রত্যক্ষ রাজনীতি ক্ষেত্রে আর পা বাড়ান নি। কিন্তু তাঁর যা কিছু প্রত্যাশা ছিল ঐ সুভাষচন্দ্রের কাছে। সুভাষচন্দ্রের গায়ে একটি অহিংসার বর্ম থাকলেও তার নীচে যে বস্তুটি ছিল তা এই :

"য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজনীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥"

উপেনদার তা জানা ছিল। তিনি সুভাষচন্দ্রকে অত্যন্ত ভালো বাসতেন, এ কথা আগেই বলেছি! কিন্তু দলীয় মোহে আক্রান্ত হওয়ার ফলে তিনি যে জল ঘুলিয়ে তুললেন, তাতে উপেনদা হলেন বিশেষভাবে পীড়িত। সুভাষের জন্যে এসময় তিনি দুঃখ বোধ করতেন, যে ধাতু দিয়ে সুভাষ তৈরী তা বুঝিবা ম্লান হতে চললো—এই ছিল তাঁর আশঙ্কা।

হঠাৎ একদিন বললেন আমাকে, সুভাষের চরিত্রের অধঃপতন হয়েছে। চরিত্র শব্দটার কাঁচা অর্থে আমরা ছোট বেলা থেকে এমনি অভ্যস্ত যে, এখনো এর ধাক্কা সামলাতে পারি না সহজে। খটকা লেগে গেলো। নারীঘটিত কোন ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রকে জড়ানো যে কল্পনার অতীত। এই তো সেদিন দেখে এসেছি এলবার্ট হলের নীচে কোন নারীর সাগ্রহ আহ্বানকে তাঁর হেলায় প্রত্যাখ্যান। তাঁর অটল, অদম্য দৃঢ়চিত্তকে তো সেই পল্লবিনী লতেব নারী টেনে নিতে পারেন নি আপনার কাছে। সুভাষচন্দ্র সভা শেষে নীচে এসে দাঁড়ালেন; কার জন্যে অপেক্ষা করছেন

ক্ষণকাল, এমন সময় যেন কার ডাক শোনা যায়। পল্লবিনী লতেব আগেই এসে তাঁর মোটর গাড়ির হুডের একটা হাতল ধরে দাঁড়িয়েছিলেন অপেক্ষমানা হয়ে। শ্যাম্পু করে ফাঁপিয়ে-তোলা কৃত্রিম পিঙ্গলাভ তাঁর অলকদামের কয়েকটি গুচ্ছ বায়ু-তাড়িত হয়ে মুখমণ্ডলের উপর ঈষৎ আন্দোলিত হচ্ছিল। সুভাষচন্দ্র আসতেই তিনি তাঁর আরক্তিম অধরে মিষ্টি মৃদু হাসি টেনে অতীব মধুর কণ্ঠে তাঁকে আমন্ত্রণ করলেন—"আসুন না আমার গাড়িতে।"

সুভাষচন্দ্র তাঁর গাড়ির দিকে একবার চেয়ে পল্লবিনী লতেবকে অতি কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—"অমুক কোথায়?" অমুক মানে তাঁর স্বামী, তিনিও যে ছিলেন সভায়; তাঁকে তো দেখা যাচ্ছে না! তিনি কোথায় তা কে জানে? তাঁকে নইলে যে এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের যাওয়া সম্ভব নয়, একথা কে ভেবেছে? আচ্ছা বদরসিক!

পল্লবিনী লতেব ইঙ্গিতটি বুঝেছিলেন। অবজ্ঞায় তাঁর রক্তগোলাপের মতো মুখখানি নিমেষে কালো হয়ে উঠলো। তিনি অধোমুখী হয়ে রইলেন। সুভাষচন্দ্র সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন নি।

উপেনদার মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়েছিলাম। আমার মনের আলোড়ন বোধ করি তিনি আঁচ করে নিয়েছিলেন, তাই আমার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যে তিনি বলে উঠলেন,—ওরে, সুভাষও শেষে মিথ্যে কথা বলতে শিখলো!

—কি রকম?

—আরে, লোকটা তার ফণ্ড মেরে দিয়েছে, তা জানা সত্ত্বেও আবার সে গিয়ে সুভাষের কাছে হাত পাততেই সুভাষ দিয়ে দিলে তাকে টাকা অম্লান বদনে!

—তাতে মিথ্যে কথার কি হলো?

—আঃ! শোন্ না আগে সবটা, তারপর প্রশ্ন করিস। আমি জানতুম সব ব্যাপারটা। যার কাছে শুনেছি সে আদ্যপান্ত সব বলেছে আমায়। সুভাষও জানতো যে টাকাটা সে জলে দিচ্ছে, তথাপি সে ঐ লোকটিকে টাকা দিয়েছে আবার। কিন্তু আমি যখন সুভাষকে জিজ্ঞেস করলুম যে ঐ

ফণ্ড-মারকে সে আবার টাকা দিয়েছে কিনা তখন সুভাষ স্রেফ অস্বীকার করলে!

—জেনে শুনেও সুভাষবাবু টাকা দিলেন কেন? আর, আপনার কাছেই বা তিনি লুকাবেন কেন?

—দলগত স্বার্থের খাতিরে। আমাকে সে মিথ্যে কথা বলেছে, কারণ আমার কাছে তার দুর্বলতাটুকু সে ঢাকতে চায়।

সুভাষচন্দ্রের এই প্রতারককে জানতাম, বেশ জোরালো বক্তৃতা দিয়ে গ্রাম্য জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলবার ওস্তাদ হিসাবে। অর্ধ শিক্ষিতদের মধ্যে তাঁর প্রতাপ ছিল খুব বেশি। গুহ্য বিষয়ে তাঁর দ্বারা কাজ হবে বলে সুভাষচন্দ্র টাকা দিয়েও তাঁকে দলে রেখেছিলেন।

তবু ভালো। সুভাষচন্দ্রের চারিত্রিক অধঃপতনের একটা দিক উদ্ঘাটিত হলো।

সুভাষচন্দ্রের আত্মবিশ্বাস ছিল দৃঢ়। তিনি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, তাঁর যে কর্মপন্থা তা যদি দেশের যুবক-যুবতীরা গ্রহণ করে তবে দেশের পক্ষে হবে মঙ্গলজনক, কিন্তু তার জন্যে তাঁর হাতে ক্ষমতা চাই। কিন্তু সেনগুপ্ত সে পথে হয়েছিলেন বাধা, কারণ গান্ধীজী তাঁকে ত্রিমুকুট পরিয়ে গিয়েছিলেন দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর। এই ক্ষমতা আহরণের দরুণই হয়েছিল দলাদলির সৃষ্টি।

দলাদলির আবর্তে পড়ে সুভাষচন্দ্র যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছেন এতে উপেনদা শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন রীতিমত। আরো অনেক উৎপাত ছিল তখন। প্রতিদিন বৈকালের দিকে সুভাষচন্দ্রের পেছু পেছু একদল মধুসন্ধানীর দল আসতো আমাদের কাগজের অফিসে। এরা সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষীর দল। এদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি কর্পোরেশনে সুভাষচন্দ্রের কল্যাণে ধাপে ধাপে উঠে একটি বড় পদ দখল করেছিলেন। বেঁটে গোছের লোকটার চোখে মুখে যেন চাতুরি খেলতো। সুভাষচন্দ্রের যতদিন ক্ষমতা ছিল তিনি ততদিন তাঁর পেছনে আঠার মতো লেপটে থাকতেন, তাঁর ক্ষমতার হ্রাস হলে নলিনীরঞ্জন সরকারকে ধরে আর এক ধাপ গেলেন এগিয়ে। অতঃপর

বাংলার একজন মুখ্য ব্যক্তির স্নেহপুষ্ট হয়ে জীবনের চরম চরিতার্থতা লাভ করে ধন্য হলেন।

যাই হোক, দলাদলির সময়কার কথাই বলি। ১৯২৯ সালের প্রায় শেষের দিকে। এই সময় রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে ঠোকাঠুকি আর মন কষাকষি চলেছিল মারাত্মক রকমের। যুবক-যুবতীরাও বিভ্রান্ত হয়ে ভাবছিলেন তাঁরা কোন্ নেতার নির্দেশ মেনে চলবেন। ঠিক যখন মনের অবস্থা এই, সেই সময় উত্তর কলিকাতা যুব-সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে উপেন বাঁড়ুজ্যেকে সভাপতি নির্বাচন করা হয়। উপেনদা সিমলা ব্যায়াম সমিতির প্রাঙ্গণে সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাতে তিনি এই দলাদলিকে নির্মমভাবে কষাঘাত হেনে এর উলঙ্গ রূপকে উদ্ঘাটিত করে ধরলেন। তাঁর চিন্তার ঐশ্বর্য তাঁর অনন্যুকরণীয় বাকপটুতায় অনেক নেতার বুকে শেল হয়ে বিদ্ধ হয়েছিল তখন। উপেনদা তাঁর অভিভাষণে বললেন :

"আপনারা যে Fascism, Communism Dominion Status, Independence, হিংসা, অহিংসা প্রভৃতি মতবাদ লইয়া গবেষণা করেন, ইহাদের মধ্যে কোন্ প্রশ্নগুলি আপনাদের মনে স্বতঃস্ফূর্ত? হিংসাবৃত্তির মানব জীবনে সার্থকতা আছে কি না, অহিংসা চরম ও পরম ধর্ম কি না, এসব লইয়া ভারতবর্ষীয় দার্শনিক ও ধর্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণ অনেক গবেষণা করিয়াছেন। সুতরাং সেই সমস্ত দার্শনিকদিগের বংশতিলকদের মনে যে এসব প্রশ্ন উঠিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও মনে হয় যে, রাজ্য শাসন ও রক্ষণ তো ক্ষত্রিয় প্রকৃতির লোকেরই কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, আর অহিংসা যে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, একথা তো ভারতবর্ষীয় চিন্তাধারার মধ্যে কোথাও নাই। তবুও রাজনীতি ও অহিংসার আজ এক অভিনব খিচুড়ি প্রস্তুত করিয়া মহাপুরুষেরা যে মহাপ্রসাদ রূপে বিতরণ করিতেছেন, তাহার প্রতি আপনাদের অচলা শ্রদ্ধা দেখিয়া আমি পুলকিত হইয়া উঠিয়াছি। আপনাদের অনেকেই রাজনীতি চর্চার সহিত সংশ্লিষ্ট;

আর রাজনীতি চর্চার অর্থই ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন। অহিংসার ভিত্তির উপর ক্ষত্রিয়ধর্ম স্থাপনের এই যে অভিনব চেষ্টা, ইহার কতখানি স্বতঃস্ফূর্ত আর কতখানিই বা ব্যর্থ পরানুকরণ, তাহা জানিবার কৌতূহল আমার মনে অতিশয় প্রবল। সেকালের বখাটে ছেলেরা কচু, আলু ও আদার মধ্যে সন্ধি স্থাপনের বৃথা চেষ্টায় 'কচ্বালাদা' শব্দের সৃষ্টি করিয়াছিল। অহিংসার সহিত ক্ষত্রিয় ধর্মের সেইরূপ Entente Cordiale স্থাপনের চেষ্টায় মহাপুরুষেরা একটা "রাজনৈতিক কচ্বালাদার" সৃষ্টি করেন নাই তো? আর এই 'কচ্বালাদা' প্রসাদাৎ তরুণের তারুণ্য দিন দিন শশিকলার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে কি? তাহা যদি না হয়, তবে জিজ্ঞাসা করি, এই ভয়াবহ পরধর্মকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া আপনারা বাংলাদেশে একটা অনর্থক দলাদলির প্রশ্রয় দেন কেন?

তারপর ধরুন—Independence আর Dominion Status এর কথা। আইনজ্ঞ পণ্ডিতদের অসাধ্য কর্ম নাই। বাপের বেটা হওয়ার চেয়ে পোষ্যপুত্র হওয়া যে বেশি গৌরবের ব্যাপার, একথা প্রতিপন্ন করিতে তাঁহাদের এক মিনিটও সময় লাগিবে না। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংরেজের উপনিবেশ-গুলির উৎপত্তি ও পরিণতির কথা যাঁহারা জানেন, তাঁহারা অক্লেশে স্বীকার করিবেন যে, Dominion Statusই উহাদের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু ভারতের ইতিহাসের পরিণতি কি ঐ Dominion Statusএ? দেশবন্ধু, মহাত্মাজী মাথায় থাকুন। কিন্তু আপনাদের চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করি, ভারতবর্ষের ঐ পরিণাম যদি হয়, তাহা হইলে আমাদের স্বর্গীয় পূর্বপুরুষেরা কি দুই হাত তুলিয়া আপনাদের আশীর্বাদ করিবেন বলিয়া মনে হয়? ওটা আপনাদের শোনা কথা, না নিজেদের স্বতঃস্ফূর্ত বিচারের ফল?

তারপর ধরুন Fascism ও Communism এর লড়াই। কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ সে বিচার আমি করিতেছি না; কিন্তু যাঁহারা ও সমস্ত মতবাদ গড়িয়াছেন তাঁহারা ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন সমাজের লোক। যে অবস্থায় যে যে কারণে ঐ সমস্ত মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে, সে সমস্ত অবস্থা ও কারণ আমাদের দেশে বর্তমান কিনা, এবং যদি না হয়, আমাদের দেশে জনসাধারণের মধ্যে

স্বাধীনতার আন্দোলন কিরূপ আকার ধারণ করা উচিত, সে সম্বন্ধে আপনারা কতটা আলোচনা করিয়াছেন তাহা জানিবার ইচ্ছা হয়। আলোচনা যে সম্যক হয় নাই, তাহা সন্দেহ করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। আমি দেখিতে পাই, আমাদের দেশের যে সমস্ত যুবক আমেরিকায় যান, তাঁহারা তিন দিনের মধ্যেই আমেরিকান democrat হইয়া পড়েন; যাঁহারা রুশিয়ায় যান, তাঁহারা ঠিক ঐ তিন দিনের মধ্যেই বিশ্বাস করিয়া লন যে, সত্য আবিষ্কারের একমাত্র পন্থা dictatorship of the proletariat. এত সহজে এত বেশি পরিবর্তন দেখিয়া মনটায় স্বভাবতই একটু খোঁচ লাগে।"

যা আমাদের মাটি থেকে ওঠেনি তা খাঁটি বলে চালানোর দুশ্চেষ্টাকে উপেনদা হানলেন কঠোর কুঠার। এই সময় কোন এক বিশিষ্ট নেতা একটি সভায় শৃঙ্খলা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে উঠে তরুণদের উদ্দেশ করে শুনিয়েছিলেন —"তোমরা একজনের কথা শুনে চলতে অভ্যাস করো, তা হলেই তোমরা শক্তিমান হ'য়ে দাঁড়াবে।" কিন্তু কে সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ যার আদেশ পালন করলেই সব দুর্বলতা একেবারে মুছে যাবে? কি লক্ষণ দেখে চিনবো তাঁকে? সবাই যে তখন ঘাটে ঘাটে তরী বেঁধে পরপারের যাত্রীদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, এ দুর্যোগে তিনিই একমাত্র কর্ণধার। বাছাই হবে কি করে? উপেনদা সেই কথাটিই জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তরুণদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, "দাদার জয়" গেয়ে ঘুরে বেড়ানো তারুণ্যের পরিচয় নয়। বললেন তিনি :—

"তারুণ্যের প্রধান লক্ষণ আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ও ঋজুগতি, তারুণ্যের দ্বিতীয় লক্ষণ আদর্শনিষ্ঠা। তরুণ চায় অতীতের আবর্জনাস্তূপ দুই হাতে সরাইয়া ফেলিয়া নূতন সৃষ্টির গোড়াপত্তন করিতে। দুনিয়ার কাছে ঘা খাইয়া যাহাদের আদর্শনিষ্ঠা মলিন হইয়া গিয়াছে, নিজেদের শক্তিতে বিশ্বাস হারাইয়া যাহারা প্রতিপদে রফা করিতে প্যাঁচ কষিতে চায়, তাহাদের সাকরেদী করা তরুণদের ধর্ম নয়। তরুণের ইন্দ্রিয়গ্রাম সতেজ—সে চায় নিজের চোখে দেখিতে, নিজের কানে শুনিতে, নিজের মনে ভাবিতে, নিজের হাতে কাজ করিতে।"

'দাদা কোম্পানী', 'ভারত উদ্ধারের সোল এজেন্সী,' 'ক্যাপচারিং পলিসি,' 'ডেপুটি মহাত্মা' ইত্যাদি বহুবিধ বচন তখন অনেকের মুখে মুখে ফিরতো। সেগুলির সৃষ্টিকর্তা ছিলেন উপেনদা। সেই সময় সুভাষচন্দ্রের কয়েকটি লেখা "তরুণের স্বপ্ন" নামে বই আকারে বার হয়েছিল। উপেনদা ঐ তরুণের স্বপ্নের পিছনে আরো দু'টি অক্ষরের একটি শব্দ জুড়ে দিয়ে আমাদের দেশের তরুণদের তারুণ্যহীন লক্ষণকে ব্যঙ্গ করতেন।

সেদিনকার সভামণ্ডপে উপস্থিত ছিলাম। অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সুভাষচন্দ্রকেও দেখেছিলাম উপস্থিত। সভা শেষ হতেই দেখলাম সুভাষচন্দ্র তাঁর আসন ছেড়ে বিদ্যুৎগতিতে এসে উপেনদাকে 'ক্যাপচার' করে তাঁর মোটরে তুলে নিয়ে নিমেষে হয়ে গেলেন উধাও। কেন, কোথায়? কি যে হয়ে গেল কে জানে!

টালা অঞ্চলে ইতিমধ্যে উপেনদার নিজস্ব একখানি বাড়ি হয়েছিল। তিনি সেইখানেই থাকতেন তখন। যুব-সম্মিলনীতে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার ঠিক পরের দিন সকালে দুটি তরুণী তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে করলে আক্রমণ। তাঁদের অভিযোগ হলো এই যে, উপেন বাঁড়ুজ্যে অকারণে নারী-বিদ্বেষী; আগের দিনের সভায় তিনি মেয়েদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করে এসেছেন। মেয়েদেরও বক্তব্য আছে এবং তা তাঁকে শুনতে হবে মেয়েদেরই সভায়।

উপেনদা বললেন—তা তিনি শুনবেন, কিন্তু তার আগে দয়া করে যখন তাঁরা তাঁর বাড়িতে এসেছেন তখন তাঁর বামনীর সঙ্গে আলাপ করে একটু মিষ্টিমুখ করে যেতে হবে যে।

—ওগো, ও গিন্নী এদিকে এসো; দুটি মেয়ে এসেছেন, আলাপ করবে এসো—বলে উপেনদা তাঁর বামনীকে ডাক দিলেন।

বামনী হলুদমাখা হাত নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেই থমকে জিব কেটে দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন—ওমা, এ কি গো! বাপ মা এদের আজও বিয়ে দেন নি! আলাপের ধরনটি বেশ। তরুণী দু'টি লজ্জায় অধোবদন হলেন। এই সনাতনী বামনীর সঙ্গে এঁরা আলাপ করবেন কি নিয়ে?

উপেনদা বললেন—ওগো, এরা যে গেরাজুয়েট, বিয়ে করবার সময় হাতে পেলো কই?

ওমা, তাই বলে—

বামনী আর ভাষা পাচ্ছিলেন না। 'গেরাজুয়েট' শুনবার পর তিনি আর একটু ঘাব্ড়ে গেলেন। যেন অকূলে পড়েছেন এইভাব দেখিয়ে অতঃপর তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন।

আগের দিনকার সভায় উপেনদা বলে এসেছিলেন :—

"স্ত্রীলোক আমার কাছে ভয়ের অর্থাৎ ভক্তির বস্তু; সুতরাং দুর্বোধ্য। তাঁহারা কি চান আর কি বলেন, আর তাহাদের চাওয়া ও বলার মধ্যে কোন সম্বন্ধ আছে কি না, এ প্রশ্নের মীমাংসা আমি কোনদিনই করিতে পারি নাই। তবে এ কথা যদি সত্য হয় যে, তাঁহারা সর্বতোভাবে স্বাধীন হইবার জন্য কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা হইলে সে বিষয়ে আপনাদের কোন সাহায্য নিষ্প্রয়োজন। বাংলা দেশে যদি একটা Husbands' Protection League খোলা যায়, তাহা হইলে এমন পুরুষ নাই যিনি গাঁঠের কড়ি খরচ করিয়া তাহার জন্য চাঁদা না জোগাইবেন; পুরুষের কাঁধ হইতে নামিয়া গড়ের মাঠে স্বাধীন হাওয়া খাইবার ইচ্ছা যদি সত্য সত্যই এ দেশের মেয়েদের হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্থির জানিবেন যে বাংলা দেশে এমন বোকা পুরুষ নাই যিনি সে শুভ সঙ্কল্পে বাধা দিবেন।"

তরুণী দু'টিকে উদ্দেশ করে এইবার তিনি বললেন—শুনলে তো মা-লক্ষ্মীরা Husband capturing এর বাণী। ওর সঙ্গে তোমাদের বড় বেশি পার্থক্য আছে বলে তো আমি মনে করি না। সুতরাং আমার কাছে দুর্বোধ্য।

তরুণী দু'টির মধ্যে প্রথমা ছিলেন ঢিলে গোছের। কর্মোন্মাদনা, বলতে কি কোন উন্মাদনাই আর তাঁর কাছ থেকে সম্ভব কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। দ্বিতীয়া যিনি তিনি ইতিহাসে এম-এ পাশ করে শীর্ণদেহা হয়েছেন—শুকনো একটা খ্যাংরা-কাঠির মতো দেখতে। দেহভার কেন, কোন ভারই তাঁকে বইতে হতো না বলে তাঁর ছুটাছুটি করবার সুবিধা ছিল। তিনি ছিলেন তখনকার দিনে কোন ডাকসাইটে নেতার আত্মীয়া। তাঁর বাপ-মার দূরদৃষ্টি

ছিল, তাই তাঁরা তাঁদের কন্যাকে কোন লম্বা চওড়া নামে ভারাক্রান্ত না করে দিয়েছিলেন ছোট্ট দু'টি অক্ষরের একটুখানি নাম, কন্যা তাঁদের তাই বহন করতেন সহজে।

এই দ্বিতীয়াকে সম্বোধন করে উপেনদা জিজ্ঞেস করলেন, ইতিহাসে তো তিনি এম-এ পাশ করে রোদে পুড়ে ও জলে ভিজে ছুটোছুটি করছেন যত্রতত্র ; যেটুকু দেহ অবশিষ্ট আছে, তাও যে যাবে অতঃপর। তখন করবেন কি?

তারপর পরশুরাম-বর্ণিত উঁচু-নীচু-টক্কর-বিহীন সরলরেখারূপী এই কঙ্কালিকার আপাদমস্তক একবার ভালো করে চোখ বুলিয়ে নিয়ে উপেনদা বলে উঠলেন,—তুমি তো দেখছি মা, ছেলেমেয়েও মানুষ করতে পারবে না। সন্তান মানুষ করবার দায়িত্বও যে মায়ের।

কি নির্লজ্জ অসভ্য দুর্মুখ এই উপেন বাঁড়ুজ্যেটা! মুখে এঁর কিছুই বাধে না? বাড়িতে আগন্তুক মেয়েদের এই রকম অসম্মান!

ব্যস্, যবনিকা পতন! উপেনদাকে মেয়েদের সভায় অতঃপর আর কেউ ডাকেনি।

সংবাদপত্রের বহির্জগতে কর্মের স্রোত বয়ে চলেছে মন্দ নয়। ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতী, নেতা-নেত্রী—বড়, মাঝারি, ক্ষুদে সকলের আব্দার, অত্যাচার সহ্য করেও আমরা বেয়ে যাই তরী। মনোরঞ্জন মানভঞ্জন করবার আর্টটাও ধীরে ধীরে আমাদের বেশ আয়ত্তে এসেছে। আগেই বলেছি, কাগজের প্রতিষ্ঠান হিসাবে ফরওয়ার্ড কোম্পানীর ১৯২৭-২৮ দুই বৎসর গেছে যেন বৃহস্পতির দশা। এখানকার কাগজগুলির কাটতি হুড় হুড় করে বেড়ে গেছে, ইংরেজী 'ফরওয়ার্ডে'র জন্যে অমৃতবাজার পত্রিকা পড়ে গেছে, 'বাঙ্গালার কথা'র প্রচলনে 'আনন্দবাজার' তলিয়ে গেছে, সাপ্তাহিক বলতে তখন 'আত্মশক্তি'ই একমাত্র। কাগজ বিক্রির এজেণ্ট উগ্র সিংয়ের সে কি উগ্র মূর্তি তখনকার দিনে—লাগে লাখ টাকা দেবে উগ্র সিং, তবু কাগজ সব চালু রাখা চাই, এই ছিল উগ্র সিংয়ের মনের ভাব।

এমন দিনে শচীনদা করে বসলেন এক কাণ্ড। বলছি সে কথা। সম্পাদক হিসাবে শচীনদা ছিলেন নির্ভীক, উদার। নিজস্ব মত বলে তাঁর একটা বস্তু ছিল, যা তিনি কখনই পরমুখাপেক্ষী হয়ে বিক্রি করতে পারেন নি! তরুণ সাহিত্যিক বলে যাঁরা তখনকার দিনে নাম-করা সম্পাদকদের কাছে ছিলেন অস্পৃশ্য, অনাদৃত তাঁদেরকে তিনি আদরে ডেকে নিয়েছিলেন কাছে, তাঁদের স্থান ছিল তাঁর কাগজে অবারিত।

আত্মশক্তিতে কবিতা নির্বাচনের ভার পড়েছিল আমার উপর। শচীনদা বলতেন—কবি, ওগুলো তুমি দেখে দিয়ো ভাই, আমি ওসব বুঝি না।

একদিন ডজনখানেক কবিতার গুচ্ছ আমার সামনে ফেলে দিয়ে তিনি বললেন—এই নাও ভাই, দেখো দিকি ছাপা চলে কি না।

একই ব্যক্তির লেখা। লেখক স্বনামধন্য পুরুষ অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার; প্রথম কবিতাটির প্রথম লাইন পড়েই আমার চক্ষু প্রায় কপালে ঠেকে গিয়েছিল। কবি আরম্ভ করেছেন—

"ক' বোতল মদ টানিলে রঘুবংশম্ যায় গো লেখা?"

প্রথম লাইনেই ছন্দকে জবাই। তারপর আরও খানিকটা এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। তথৈবচ। ভাবসম্পদ যাই থাকুক না কেন, ছন্দোবদ্ধ কবিতা লিখতে ছন্দের প্রতি এই নির্মম উদাসীনতা তো সহ্য করা যায় না। সন্দেহ হলো কবির প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে।

নয়া বাংলার পাঁচটা বাঘা বাঘা ব্যাঙ্কের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সম্বন্ধে আলোচনা ছেড়ে অধ্যাপকের কবিতা লিখবার এ দুর্বুদ্ধি কেন হলো, তা বুঝতে পারিনি। বললাম—মাফ করুন শচীনদা, এ মাল চলবে না।

চলবে না, বলো কি হে?—বলে শচীনদা যেন দুঃখিত হয়ে কবিতাগুচ্ছ নাড়তে নাড়তে চুপ করে গেলেন।

আত্মশক্তি যথারীতি বার হতেই দেখি ঐ মাল ছাপা হয়ে গেছে। আমি একটু বিস্মিত বোধ করলাম। শচীনদার কাছে গিয়ে বললাম—শচীনদা, কি রকম হলো?

শচীনদা বললেন—কি করবো ভাই, দিলাম ছেপে। তুমি তো জানো না

আমি বিনয় সরকারের ছাত্র। স্বদেশী যুগে ন্যাশনাল কলেজে উনি ছিলেন আমার অধ্যাপক। সেদিন দেখা করতে গেছি ওঁর সঙ্গে, দিয়ে দিলেন ঐ কবিতাগুলো। ওঁর এখন কবিতা লেখার বাতিক হয়েছে। কি করি বলো? হাজার হোক মাস্টার মশায় তো।

মাস্টার মশায়ের কবিতাগুচ্ছ উত্তরকালে ছন্দোবদ্ধ রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল কি না তার খবর অবিশ্যি আর রাখতে পারিনি।

মাত্র এই ক্ষেত্রেই শচীনদার এই দুর্বলতা দেখেছি। অন্যথা আত্মম্ভরিতার সঙ্গে আত্মমর্যাদার একটা কঠোর রূপ ছিল তাঁর চরিত্রে।

এখন আসল কথাটা বলি। বিনয় সরকারের পালা আমরা সবে শেষ করেছি। এমন সময় এলেন এক দুরন্ত ভদ্রলোক যাঁকে আমরা উভয়েই চিনতাম। তিনি কয়েকদিন আগে একটি প্রবন্ধ দিয়ে গিয়েছিলেন আত্মশক্তিতে প্রকাশের জন্যে। আজও সেটা ছাপা হয়নি দেখে তাগিদ দিতে এসেছিলেন। লোকটির দুরন্ত বিপ্লবী বলে গর্ব ছিল, কেননা কয়েকবার জেল খাটার জৌলুস তিনি দেহে ধারণ করে তখনকার যুব-সমাজে শ্রদ্ধেয় হয়েছিলেন যে। শচীনদা বললেন প্রবন্ধটি তিনি দেখেছেন, একটু অদলবদল করা দরকার সেই হেতু দেরি হচ্ছে। দেখে ঠিক-ঠাক করা হলেই তিনি ওটা প্রকাশ করবেন।

বিপ্লবীর প্রবন্ধের গায়ে হাত! সম্পাদকের স্পর্ধা তো কম নয়। প্রবন্ধ-লেখক বললেন—তাঁর লেখা যেমনটি আছে, ঠিক তেমনটি ছাপতে হবে। শরৎবাবুর সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে।

কে শরৎবাবু?—শচীনদা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন!

—শরৎ বোস।

—শরৎ বোস কি সম্পাদক, যে তিনি প্রবন্ধ নির্বাচন করবেন?

দাম্ভিক শচীনদার দম্ভ এইবার ফেটে পড়লো। বিপ্লবী বলে তাঁর প্রবন্ধ ছাপতে হবে অক্ষত অবস্থায় এবং তা শরৎ বোসের কথামত? শচীন সেনগুপ্তকে সেই পাত্র পেয়েছেন নাকি ওঁরা?

টেবিলের উপর একটি আশির ওজনের ঘুঁষি মেরে প্রবন্ধটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শচীনদা একেবারে রাজভাষায় বিপ্লবীকে নির্দেশ দিলেন—**Get out**

আবার সেই Get out! একদিন শুনেছিলাম 'বৈকালী' অফিসে আর এই আজ। কিন্তু ঝাঁজটা তীব্রতর। শচীনদার এই বিপ্লবী মূর্তি দেখে আমি রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম। ভাবলাম বিনয় সরকারের রঘুবংশ যদি এইবার আসল বংশদণ্ড হয়ে আমার পিঠে পড়ে তো গেছি আর কি! আর দেরি করতে আছে? তিনতলা থেকে আমি একেবারে সোজা দৌড় দিলাম সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নিজের ঘরে।

এমন ভীতিজনক অথচ মুখরোচক সংবাদটি উপেনদাকে না দিয়ে থাকি কি করে? উপেনদা একগাল হেসে বললেন—বলিস্ কি, দিলে একেবারে গেট আউট করে? বেশ করেছে। কিন্তু ও গোঁয়ার গোবিন্দটা চাকরি রাখতে পারবে না দেখছি।

চুলোয় যাক চাকরি। শচীন সেনগুপ্ত চাকরির পরোয়া করে না। দম্ভ আর চাকরির মধ্যে প্রথমটিই তাঁর কাছে শ্লাঘ্য।

এই ঘটনার পর বোধ করি বেশি দিন নয়। একদিন শরৎ বোস তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর বাড়িতে, তাঁর সঙ্গে দেখা করে কি একটা কৈফিয়ত দিতে।

শচীন সেনগুপ্ত কি শরৎ বোসের বাড়ির চাকর যে ডাকলেই সেখানে যেতে হবে? রাগ একটু ঝিমিয়ে এলে তাঁর মনে হলো—নাঃ, যাওয়াই দরকার। এই প্রবন্ধের সম্বন্ধে যদি কোন কথা ওঠে তবে তিনি আচ্ছা করে শুনিয়ে দেবেন শরৎ বোসকে। শরৎ বোস কৈফিয়ত দাবি করলে কৈফিয়তের বদলে চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে তিনি বলে আসবেন—রইলো তোমার চাকরি বোস সাহেব, আমি চল্লুম।

বিপ্লবী প্রবন্ধ-লেখক শরৎ বোসকে ইতিমধ্যে নালিশ করেছিলেন কি না জানা যায় নি। যা জানা গেলো তাতে শচীনদা বিস্মিত হয়ে না রেগে প্রায় হেসে ফেলেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এক রকম বিলাতী কায়দায় ক্ষমাই প্রার্থনা করে এসেছিলেন, বোস সাহেবের কাছে—I am sorry.

এর আগে আমাদের সরকারী চাকুরে স্যর এন, এন, সরকার 'বন্দেমাতরম' জাতীয়-সঙ্গীত হওয়া উচিত নয় বলে সংবাদপত্রে এক চিঠি প্রকাশ

করেছিলেন। তাঁর গবেষণায় যুক্তির যা সারমর্ম, তা আমাদের শাসক প্রভুদের ভেদ-নীতির সমর্থন ছাড়া আর কিছুই নয়। শচীনদা এই চিঠির তীব্র প্রতিবাদে সরকার সাহেবকে দিয়েছিলেন আচ্ছা করে ঠুকে। শরৎবাবু তা পছন্দ করেন নি। কারণটা হাস্যকর। শরৎবাবু নিজে 'বন্দেমাতরম'-এর বিরোধী নন, অপরে বিরোধী হলেও তিনি ব্যথা পান ঠিক ; কিন্তু স্যর এন, এন, সরকার ব্যথা দিলে তিনি চুপ করে সহ্য করে যেতে রাজি—এ কথা জেনে শচীনদার বুদ্ধি ঘোলা হয়ে গিয়েছিল। শরৎবাবু অকপটে স্বীকার করলেন এন, এন, সরকার তাঁর যে professional গুরু, গুরু নিন্দা তিনি সইতে পারেন না। শচীনদা বলেছিলেন—ওঃ তাই!

দ্বিতীয় নম্বর কৈফিয়তের ব্যাপারটা আরো হাস্যকর। মন্তব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনে সম্পাদক মশায় কখন অলক্ষ্যে রায়বাহাদুরদের ধরে টান দিয়েছিলেন। ইংরেজ আমাদের শত্রু, এই শত্রুর সঙ্গে সংযুক্ত কোন ব্যক্তি বা বিষয় পেলেই ঘা মারা ছিল দেশপ্রেমের পরিচয়। এমন লোভনীয় কর্তব্য কর্ম শচীনদা উল্লসিত হয়ে করে ফেলেছিলেন এক সময়। শরৎবাবু সেই প্রসঙ্গই তুলে শচীনদাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে ঐ তুচ্ছ ব্যাপারের দিকে তাঁর অতখানি মনোযোগ দেওয়া ঠিক হয় নি। কিন্তু শচীনদা কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না, রায়বাহাদুরদের আঘাত করে তিনি এমন কি অন্যায় করে ফেলেছেন। শরৎবাবু শেষটায় সরল ভাবে শচীনদাকে প্রশ্ন করলেন—আপনি জানেন না আমার বাবা রায়বাহাদুর?

সম্পাদক মশায় অতঃপর বিপদে পড়ে গেলেন। শুধু বিপদ নয়, লজ্জিতও হলেন। রায়বাহাদুরকে ধরেছিলেন একটা সাধারণ শ্রেণী হিসাবে, শরৎবাবুর সঙ্গে এই শ্রেণীর কোন বিশেষ সম্পর্কের কথা ঘৃণাক্ষরেও তাঁর মনে ওঠেনি তখন। দ্বৈরথের আশঙ্কা ত্যাগ করে তাই তিনি লজ্জার হাসি হেসে শুধু বলে এলেন বোস সাহেবকে—**I am sorry!**

শচীনদার এই বিতাড়িত বিপ্লবী প্রবন্ধ-লেখকটি কিন্তু উত্তরকালে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিরূপে প্রকাশ পেয়েছিলেন। বাংলার রাজ্য-সরকারে কিছুকাল তিনি অশোকচক্রের তকমাধারী বহু আজ্ঞাবহের নমস্য হয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

শচীনদার বিপ্লবী বিতাড়ন প্রসঙ্গ এইখানেই ইতি দিয়ে আমাদের এদিকে নজর দেওয়া যাক। কিরণশঙ্করের শিষ্য সরোজের খুন্‌সুড়ি, বিজয়লালের খামখেয়ালি আর প্রেমেনের দৌরাত্ম্য বেড়েই চলেছে। সরোজ কিরণশঙ্করের কথা বলার ভঙ্গিটা উপেন বাঁড়ুজ্যের রসের সম্বরা দিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যঞ্জন পরিবেশন করতো, সেটা ভালোই লাগতো। উপেনদাও সরোজকে একটু ভালোই বাসতেন। প্রেমেনকে শনিবারে প্রায় পাওয়া যায় না, অন্যবারেও সে হঠাৎ গা ঢাকা দিয়ে দেয়। পরে এসে বলে অমুক রেস্তোঁরাতে বারোটা ডিমের মামলেট খেয়ে সে খুবই অন্যায় করে ফেলেছে এবং এমন কুকার্য সে আর কখনো করবে না। পেটটা তার ঐ জন্যেই খারাপ হয়েছিল। এ ঘরের লোক বিশ্বাস করে না, ও ঘরের লোক মুখ টিপে হাসে। সরোজ বলে ধানী-লঙ্কা। বিজয়লালের উপর তখন একরকমের 'ভর' হতো। ওয়াল্ট হুইটম্যান, এডওয়ার্ড কার্পেন্টার কিংবা রাসেল প্রভৃতি যে কোন লেখকের লেখাই বিজয় পড়ুক না কেন, তার সে পাঠ্যকালের অবস্থাটা ছিল আমাদের পক্ষে মারাত্মক। বাংলা কাগজে সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পাতায় একটি বিশেষ প্রবন্ধ ছাপাবার রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এ রীতি প্রবর্তন আমরা করেছিলাম আমাদের ইংরেজী দৈনিকের অনুকরণে। ফরওয়ার্ড পত্রে মেজর গ্রাহাম পোল কিংবা ল্যান্সবেরীর প্রবন্ধ অথবা 'Irish Gleanings' দিয়ে যেমন দু'তিন কলম ভরানো হতো আমরাও ব্যবস্থা করেছিলাম ঐ রকম কোন বিশেষ লেখকের বিশেষ লেখার দ্বারা সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা সাজাতে। বিজয় ঐ বিশেষ প্রবন্ধের স্থানটি প্রায় দখল করে বসেছিল। বিজয় হুইটম্যানের কবিতা নিয়ে চালালো প্রবন্ধ কয়েকদিন, তারপর হয়তো আসবে রাসেল কি গোর্কি। একেই আমরা বলতাম বিজয়ের 'ভর' হয়েছে। বিজয় এতে চটতো না বরং হেসে উঠতো—হেঃ হেঃ হেঃ।

বন্ধুবর প্রমোদ সেন ছিলেন উকিল। হঠাৎ তাঁর একবার খেয়াল হলো তিনি ওকালতি করবেন, খবরের কাগজের মাইনেতে পেট ভরে না।

গেলেনও তিনি যশোরে কিছুকালের জন্য ওকালতি করতে, কিন্তু আবার তিনি ফিরে এসেছেন আমাদের মধ্যে। কারণ তিনি ছিলেন জাত সাংবাদিক। পয়সার মোহ তাঁর কাছে বড় নয়; সংবাদ ও সাংবাদিকদের সঙ্গলাভের মোহ তাঁর কাছে অনেক বড়। বিজ্ঞ, বন্ধুবৎসল, স্থির, ধীর প্রকৃতির লোক। রাজনীতি, সমাজনীতি, এমন কি ধর্মনীতি নিয়েও তিনি আলোচনা চালাতেন বেশ। ধর্মনীতিতে তখন বোধ হয় তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত এসে ঠেকেছেন, শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত তখনো এসে পৌছান নি। চপলাকান্ত উকিল হবার জন্যে ছটফট করছেন, সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি আগের চেয়ে কমে এসেছে। শচীন সেন এম-এ পাশ করে সাব-এডিটরি করে; তার দুঃখ এই যে Once a sub is always a sub; সে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখার অধিকার পাচ্ছে না। কোন একটি বিশেষ সংবাদকে ফলাও করে দিতে হলে সংবাদটির সারাংশ প্রথমে ডবল কলমে সন্নিবেশ করে দেওয়ার রীতি ছিল আমাদের। শচীন হয়তো তাই করছে। তাকে টানতে গেলাম আড্ডায়। কৃত্রিম কোপে শচীন তার পূর্ববঙ্গীয় ঢঙে বলে উঠলো—ইসে, করো কি, দেখোনা এড-ডি-টোর-রিয়্যাল লিখ্‌ত্যাছি।

—এডিটোরিয়াল?

—হঃ ডবল কলম সামারি। আর্-রে আমাগো এই তো এড-ডি-টোর-রিয়্যাল!

শচীনের ইসে বলার মুদ্রাদোষ ছিল। ফলে আমরা তাকে ডাকতাম 'আমাগো ইসে' বলে। দিল-খোলা চমৎকার আড্ডাবাজ ছিল আমাদের এই শচীন (অধুনা ডাঃ)। রবীন্দ্র সাহিত্যের বিশিষ্ট পাঠক ও সমালোচক শচীন অতঃপর প্রখ্যাত হয়েছে এবং এডিটোরিয়াল লিখবার আস্পৃহাও তার সফল হয়েছে। বর্তমানে সে পাটনার ইংরেজী দৈনিক 'Indian Nation এর খ্যাতনামা সম্পাদক।

সরু, লিকলিকে ছোট্ট মানুষটি জানকীজীবন। কথা তাঁর মুখে খুব কমই শোনা যেতো। কথা বলার চেয়ে কথা শোনার মোহ ছিল তাঁর বেশি। তাঁকেও ইতিমধ্যে বকিয়ে তুলেছিলেন ধীরেন সেন (অধুনা ডাঃ)।

আমাদের দলের এ-হেন আবহাওয়ার মধ্যে একদিন বিজয়লাল এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে তার চরম খামখেয়ালির দৃষ্টান্ত দেখিয়ে সবাইকে অবাক করে দিল। শিশির ভাদুড়ির রঙ্গমঞ্চে কোন এক খ্যাতনামা অভিনেত্রীর অভিনয় দেখে বিজয় তো একদম পাগল। পরের দিন এসেই সে এই অভিনেত্রী সম্বন্ধে দারুণ উচ্ছ্বাস করে এক দেড়গজি প্রবন্ধ ফেঁদে বসলো এবং তা প্রকাশিত হলো সম্পাদকীয় স্তম্ভে। রঙ্গালয় বা সিনেমার কোন কাগজে এ প্রবন্ধ ছাপা হলে মানানসই হতো সন্দেহ নেই; কিন্তু একটা দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে এ প্রবন্ধের প্রকাশ যেন খুবই বাড়াবাড়ি বলে আমাদের মনে হলো। বিজয়লালকে একটু সায়েস্তা করেতে না পারলে তো আর চলে না দেখছি। আমার মাথায় তখন চট করে খেলে গেলো এক দুর্বুদ্ধি—দুর্বুদ্ধি নয়, একেবারে দুষ্টবুদ্ধি।

ঘরে ফিরে সেদিন রাত্রিতে এক পত্র রচনা করলাম, বিজয়কে সম্বোধন করে। লিখছেন যেন সেই অভিনেত্রী। আমাদের কাগজের তরফ থেকে বিজয় যে অভিনয় দেখতে গিয়েছিল সে তো রঙ্গমঞ্চের লোকেদের জানা, সুতরাং অভিনেত্রী যদি বিজয়কে সম্বোধন করে চিঠি দেয় তবে বিজয়ের কাছে তা অবিশ্বাস্য হবে না যদিও কিছুটা বিস্মিত সে হতে পারে। চিঠিখানার বয়ান ঠিক মনে নেই, কারণ তার নকল তো রাখিনি। বাঁকা হাতে বানান ভুল করে যতটা সম্ভব মেয়েলী ঢঙে চিঠিখানা রচনা করেছিলাম। কতকটা এই ধরনের :—

"সম্পাদক মহাশয়,

আমি জানি আপনীই এখানে এসেছিলেন। আমার অভিনয় আপনার এতো ভালো লেগেছে জেনে আমি গোর্বিত। কিন্তু সত্যিই কি আমি অতোখানি প্রসংশার যোগ্য? আপনার লেখা আমি কতোবার যে পড়লাম। তার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি আপনাকে। আপনি যে কতো বড়ো কতো মহৎ তা ভাবতে পারি না, বোধ হয় দেবতাই। নইলে আমাদের মতো ঘৃণ্য নারীদের অমোন দরদ দিয়ে আর কে দেখে?

রঙ্গমঞ্চে আমরা জাতে উঠি। ওখান থেকে নেমে এলেই আমরা যেন

নোংরা জল, তাতে পা পড়লেই নাইতে হয়। আচ্ছা, আমাদের ভালো হবার কি কোন পথ নেই, কোনো অধীকার নেই? সেই কথাটাই কেবলি ভাবি। আপনার লেখা পড়ে বুকে বল পাই, মনে হয় আমাদের কথা ভাববারও লোক আছে তাই আপনাকে দেখতে ইচ্ছে করে। দয়া কোরে যদি আমার বাড়িতে একবার পায়ের ধুলো দেন তবে ধন্য হই।

জানি আপনী আসবেনই কারণ আপনার মনে যে কোনো ময়লা নেই। গঙ্গাজল যে আপনার হাতে, সব ময়লা তাতে কেটে যায়। সমাজে আমাদের ভালো করবার যাদু আপনীই জানেন। আপনার প্রতিক্ষায় রইলাম। বাড়ীর ঠিকানা উপরে দিলাম। আমার শত কোটি প্রণাম জানবেন। ইতি—

অভাগিনী অমুক।"

চিঠিখানা আর একটু দীর্ঘ ছিল এবং বিনিয়ে বিনিয়ে হয়তো আরও কিছু বলা ছিল কিন্তু মোদ্দা কথাটা ঐ। চিঠিখানা থামে এঁটে তাতে আমাদের অফিসের ঠিকানায় বিজয়ের নাম লিখে দিলাম ফেলে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের এক ডাকঘরে দুর্গা বলে।

পরের দিন অফিসে এসেই আমার সেই দুষ্কার্যের সংবাদ প্রথমে দিয়ে রাখলাম আচার্য ফণীন্দ্রনাথকে, তারপর বললাম সম্পাদক গোপাল সান্যালকে। শরৎ বোস এবং সুভাষ বোসের কাছে প্রায় নিত্য যাওয়া-আসা ছিল গোপাল সান্যালের, তিনি ছিলেন তাঁদের প্রিয়পাত্র; কাজেই বিপদে অধম-তারণ তিনি হতে পারবেন নিশ্চয়। চাকরির মায়া বড় মায়া। অতঃপর কানে গেল উপেনদার। উপেনদা বললেন, জানিস বিজয়ের মাথার স্ক্রু ক'টা আলগা, একটা কাণ্ড করে না বসে। কিন্তু এই বদখেয়ালের ফলাফল দেখবার ঔৎসুক্য তাঁর মিটি মিটি হাসিতে প্রকাশ পাচ্ছিল। বাকি আর সকলে ছিল অন্ধকারে।

যথাসময়ে বাঁকা হাতে লেখা থামের চিঠিখানি এসে পৌছলো বিজয়ের হাতে। বিজয় পড়ে তো অবাক! একি আকস্মিক দুর্দৈব! প্রথমটা তার মনে হলো সে যেন কোন রহস্যলোকে এসে পড়েছে—সবটাই আবছায়া

কুজ্ঝটিকাময়। আবার ডুব দিল সে সেই রহস্যলোকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে। আরক্তিম মুখে চিন্তারাশির দ্রুত সঞ্চরণের সে কি দৃশ্য! চোখের কোণ দিয়ে চাইলাম একবার আচার্যদেবের দিকে,. তিনি লক্ষ্য করছিলেন দেখলাম।

চিঠিখানা কতক্ষণ ধরে যে বিজয় পড়লো। মুঠোর মধ্যে চিঠিখানা ধরে উদাস ভাবে কড়িকাঠের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বিজয় হঠাৎ এক সময়ে লাফ দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল ঘরের সামনেকার বারান্দায়। দ্রুত পায়চারির সঙ্গে তার চিন্তারাশি আন্দোলিত হচ্ছিল—হয়তো বা সংঘর্ষ, সে সংঘর্ষে চলেছে তার আত্মপরীক্ষা।

এ দৃশ্য উপেনদাকে দেখাবার লোভ সামলাতে পারি নি। এক সময় টুপ করে উঠে তাঁকে খবরটা দিয়ে এলাম। উপেনদা এসে বললেন—ও বিজয়! ঘর ছেড়ে বাইরে অমন পায়চারি করছো কেন? মাথাটা বুঝি ধরেছে?

বিজয় জবাব দিলে—না, কিছু না, হেঃ হেঃ।

হাসির মধ্যে প্রাণ ছিল না, প্রাণটা ছিল অন্যত্র। উপেনদা একবার চোখ টিপে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

বিজয়ের সেদিন আর লেখা এগোয় না। মাত্র দু'টি প্যারা সেদিন সে কোন প্রকারে খাড়া করেছিল এবং তাতেও ফুটেছিল অসংলগ্নতা। গোপাল সান্যাল কয়েকটা লাইন কেটে একটু অদল বদল করে দিতেই, বিজয়ের কণ্ঠতালু থেকে একটা বিকৃত স্বর বার হতে লাগলো। এরকম ক্ষেত্রে বিজয়ের মর্মপীড়া আমাদের পক্ষেও ছিল পীড়াদায়ক। তার লেখায় হাত দিলেই সেদিকে চেয়ে থাকতো সে অপলক দৃষ্টিতে; এক একটি শব্দ কাটা হচ্ছে আর বিজয়ের শরীরের এক টুকরো মাংসও যেন কে কেটে নিচ্ছে। বিজয়ের সে মর্মবেদনা নিহত চক্রবাকীর শোকে শোকাতুর ঘূর্ণমান চক্রবাকের পাখার ঝটাপট শব্দ যেন—কণ্ঠতালুতে এসে তা-ই প্রকাশ পেতো।

পরের দিন বিজয়কে দেখা গেল গম্ভীর, চিন্তাকুল। গত রাত্রির আন্দোলিত চিত্তের ক্লান্তি চোখের নীচে স্থান নিয়েছে। বেশিক্ষণ সে বসেনি চেয়ারে। একটু পরেই তড়াক করে সে চেয়ার থেকে উঠে বাইরের খোলা ছাদটায় বার

কয়েক পায়চারি করে ইঙ্গিতে ডাকলো আচার্য ফণীন্দ্রনাথকে। আনুপূর্বিক ইতিহাস সে ফণীদার কাছে ব্যক্ত করে শেষটায় পকেট থেকে বার করলো একখানা খামে-আঁটা চিঠি—উপরে সেই হতভাগিনীর নাম লেখা। ভিতরের বক্তব্য ফণীদার না জানলেও চলে। মুখেই বিজয় বললে যে, সে ঠিক করে ফেলেছে হতভাগিনীর সঙ্গে সে দেখা করবেই—চিঠিতে সেই কথাই আছে লেখা।

এইবার হলো আসল বিপদ—যাকে বলে সঙ্কট। ফণীদার মুখখানা কালো হয়ে উঠলো। তাইতো, বিজয়কে রোধ করা যায় কি করে? মাথায় যখন খেয়াল চেপেছে তখন ও-যে ছুটবেই। তবু রক্ষা, যাবার আগে ফণীদাকে সে জানিয়েছে সব। এখনও আশা আছে! বিজয়কে তিনি অনেক করে বুঝালেন যে, অত তাড়াতাড়ি করা সমীচীন নয়; এ সম্বন্ধে ভালো করে বিবেচনা করা দরকার। তা ছাড়া চিঠিখানি সত্যিই ঐ হতভাগিনীর কাছ থেকে এসেছে কি না, এটাও তো জানা দরকার। সে দিকে চিন্তা করবার মতো বিজয়ের প্রবৃত্তি হয় নি কখনো। এত সরল বিশ্বাসী বলেই না ছিল আমাদের এত সুবিধা। ফণীদা ইঙ্গিতে আমাকে এক কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন—চাঁদমোন, লাও এখন ঠেলা সামলাও। বিজয় চিঠি লিখে এনেছে, দেখা করবে তার সঙ্গে। আমার নামের গোড়ার দিকে শশাঙ্কর প্রতিশব্দ চাঁদ বসে চাঁদমোহন হয়েছিল। পরে তা আরো সঙ্কুচিত হয়ে 'চাঁদমোন' দাঁড়ায় এবং ওটা বোধ করি পঞ্চশিখ ভট্টাচার্যেরই স্নেহের দান।

আমিও প্রতিদান দিয়েছিলাম পঞ্চশিখকে। তাঁর নামকরণ করেছিলাম পাঁচসিকে। এটাও বেশ চালু হয়ে গিয়েছিল সবার মুখে।

সত্যিই এইবার ভয় হলো আমার। শেষটায় কেলেঙ্কারি না হয়। বললাম ফণীদাকে, যা হোক করে ওকে রোধ করতেই হবে ফণীদা। সবটাই যে ফাঁকির ফাঁকা ফানুস এটা ওকে কোন রকমে বুঝানো দরকার। কিন্তু দোহাই আপনার ফণীদা, অপরাধীর নামটা ঘুণাক্ষরেও যেন প্রকাশ না পায়।

উপেনদাকে বললাম ব্যাপারটা সব, এদিকে ফণীদাকে পুলিশ পাহারায় বহাল রেখে।

উপেনদা বললেন—স্কেপচুরিয়াস, বিজয় পারে তা। ও যে গান্ধীর চেলা রে, সত্যাশ্রয়ী! অহিংস ভাবে সব করে ফেলবে। আটকে ফেলবার ব্যবস্থা কর এখন।

বিজয়ের স্কেপচুরিয়াস্ বিশেষণটি উপেনদা ব্যবহার করতেন নেপথ্যে।

ফণীদার এত চেষ্টা সত্ত্বেও বিজয়ের মন মানে না মানা। 'নাঃ' বলে এক সময় বিজয় ছুটলো চিঠিখানা ডাকে দিতে। ফণীদাও তাঁর স্থূল দেহটা নিয়ে ছুটলেন বিজয়ের পেছু পেছু কচ্ছপের মতো। সিঁড়ির নীচে গিয়ে তিনি ধরলেন বিজয়কে একেবারে জাপ্‌টে, হাত থেকে চিঠিখানি ছিনিয়ে নিয়ে ফেললেন টুকরো টুকরো করে। কি লেখা ছিল তাতে কে জানে। বললেন —ফেললে কেলেঙ্কারি হতো। তুমি যে চিঠি পেয়েছ তা জাল, বলবো সব কথা পরে, আজ থাক।

বিজয়কে নিয়ে ফণীদা যখন উপরে উঠে এলেন, তখন তার দিকে তাকাবার জো ছিল না। তা ছাড়া অপরাধী মন তো, যদি ধরা পড়ে যাই।

চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ মনের লজ্জা বিজয়কে সেদিন অভিভূত করেছিল। সেদিন তার হাতে আর কিছু লেখা বার হয় নি।

কিন্তু আশ্চর্য, যে প্রলয়কাণ্ড আশঙ্কা করেছিলাম তার কিছুই ঘটলো না। বোধ হয় লজ্জাই হয়ে উঠেছিল এখানে প্রচণ্ড বাধা। চিত্তবৃত্তির প্রাবল্যে বুদ্ধিভ্রংশ, ফলে চাঞ্চল্য। নিজের এই দৌর্বল্য অতঃপর তার আক্রোশকেও লজ্জিত করেছিল বোধ হয়।

এর ধাক্কা সামলাতে বিজয়ের লেগেছিল অনেকদিন। পরে সে জানতেও পেরেছিল এ দুষ্কৃতি কার। কিন্তু বিজয় সংযত হয়েছিল; আমাকে এ জন্যে তিরস্কারও সে করে নি। ক্ষমাই পরম ধর্ম—গান্ধীজীর এ শিক্ষা সে গ্রহণ করেছিল।

এই ঘটনার বহুদিন পরে একদিন কলেজ স্ট্রীট ও কলেজ রোর সঙ্গমে বিজয়লালের সঙ্গে আমার দেখা। আনন্দোজ্জ্বল মুখ তার। দীর্ঘ দেহটা যেন লঘুপক্ষ পাখির মতো। আয়ত চোখে স্বপ্নালুতা। আমার যেন কেমন সন্দেহ হলো।

বললাম—বিজয়দা, লভে পড়েছ নাকি ?

দেখলাম বিদ্যুৎ চমকের ন্যায় কি একটা খেলে গেলো তার মুখে। হেঃ হেঃ করে হেসে উঠলো বিজয়লাল। সে হাসির দীপ্তি অভূতপূর্ব। অন্তর থেকে তা এসেছিল বাইরে। তার বর্ণনা করা যায় না, তা শুধু অবাক বিস্ময়ে চেয়ে দেখতে হয়। কিছুক্ষণ আমার আপাদ মস্তক ভালো করে নিরীক্ষণ করে নিয়ে তারপর হঠাৎ আমাকে আলিঙ্গন করে উচ্ছ্বাসের মুখে সে বলে উঠলো—আজকের দিনে তোমাকে কিছু উপহার না দিতে পারলে তো এই মিলনের ক্ষণটি আমি ধরে রাখতে পারবো না ভাই।

হাতে ছিল তার কয়েকখানা বই। খস্ খস্ করে একখানা বইয়ে সে লিখে ফেললে—

"আজিকার পরম আনন্দের দিনকে স্মরণ করিয়া—হে বন্ধু, তোমার করকমলে ইহা অর্পণ করিলাম আমার আন্তরিক বন্ধুপ্রীতির নিদর্শন রূপে।

—বিজয়।

৮।৪।৩৪ কলিকাতা, কলেজ স্ট্রীট।"

আমার হাতে বইখানা দিয়ে বিজয়লাল মুহূর্তের মধ্যে বায়ুবেগে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো। মুখে সে কিছুই স্বীকার করে নি। কিন্তু তার সমগ্র আচরণে সে জানিয়ে গেলো, আজকের এই পরম আনন্দের মুহূর্তটি জীবনে খুব কমই আসে। অনন্ত, অপার মহাকালের এই মুহূর্তটির তরঙ্গ ক্ষণিকের জন্যও আন্দোলিত হয়ে বলে যায়—হে মানব, তুমি তো সেই আনন্দঘন জ্যোতির্ময় সত্তারই আনন্দময় রূপ—ভুলে যাও কেন ?

এই সূত্রে কবি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়কে (বর্তমান যুগান্তর সম্পাদক) মনে পড়ে গেল। এমনি একটি পরম মুহূর্তের বিষয়ে একটি সুন্দর, মূল্যবান কথা তিনি আমায় বলেছিলেন, যা আমার মন থেকে আজো মুছে যায় নি।

তখন তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং গুরুগম্ভীর ভাষায় নারীর বন্দনা-গান গাইছেন—পরীর দেশের প্রবেশ-দ্বারে বুঝিবা সে সম্মোহনী সঙ্গীত।

ছোট্ট-খাট্টো বেঁটে মানুষটি। বোধ হয় আমাদের প্রেমেনের চেয়েও

মাথায় ছোট। কিন্তু আশ্চর্য ছিল তাঁর দুটি চোখ। কপালের উপর আনম্র একরাশ কালো কেশের নীচে, আকর্ণবিস্তৃত সেই দুটি চোখে একটা মদালস ভাব যেন সদাই টল্‌টল্‌ করতো।

মানুষটিকে দেখলে তাঁর ভাষার ঝঙ্কারের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো কঠিন হতো। সরোজের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় - ঐটুকু মেসিন, কিন্তু আওয়াজ কি সাংঘাতিক !

বিজয়লাল অদৃশ্য হয়ে গেলো, কিন্তু যাবার আগে যে ঢেউ দিয়ে গেলো আমি সেই ঢেউয়ের দোলায় দুলতে লাগলাম। দেখলাম যে বইখানা সে আমায় উপহার দিয়েছে, তার নাম 'মনের খেলা'। লক্ষ্য করেছিলাম আরো কয়েকখানা বই সেদিন ছিল তার হাতে—সেগুলো 'সবহারাদের গান।'

বিজয়লাল ইতিমধ্যে কোথায় যে ডুব দিয়েছিল তার খবর কে রাখতো। আর সে যে-সে ডুব নয়, একেবারে মনের গহনে ডুব—সেখানে ফিরছিল সে মণিমাণিক্যের সন্ধানে। যে মাণিক সে কুড়িয়ে পেয়েছে, তাহারি খানিক কি সে আজ দিয়ে গেলো আমাকে ?

স্তব্ধ হয়ে ছিলাম কিছুকাল। সেই বিজয়লাল যে নারীর প্রসঙ্গ উঠলেই 'ছোঃ' বলে একটা অস্বাভাবিক শব্দ করে তার আরক্তিম গালে টেনে আনতো এক সঙ্কুচিত সরমের কম্পমানতা !

নতুন বিজয়লালকে দেখলাম আজ। আজ নবরূপে সে উদ্ভাসিত হয়েছে আমার কাছে। কে যেন আমার ভিতর থেকে প্রশ্ন করেছিল— লভে পড়েছ বিজয়দা ? তার উত্তর আমি পেয়ে গেছি। 'সবহারাদের গান' গেয়ে বেড়াচ্ছিল যে কবি, সে আজ উঠেছে 'সব পেয়েছি'র পর্যায়ে।

বিজয়লালকে অনেক জ্বালিয়েছি, কিন্তু তার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হইনি কখনো। অকলঙ্ক চরিত্র আর আকাশের মতো উদার হৃদয় তার। তার অপরিসীম আদর্শনিষ্ঠা, অদম্য কর্মশক্তি ও নিঃস্বার্থ ত্যাগে মনে হতো আমরা তার চেয়ে কত ছোট !

কিছুদিন পরেই জানলাম, একটি অসবর্ণা নারী হয়েছেন বিজয়লালের জীবন-সঙ্গিনী। নমস্কার করলাম বিজয়লালকে অন্তরের শ্রদ্ধা দিয়ে। যে

আদর্শকে সে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল, তাকে জীবনে প্রতিফলিত করতে সমস্ত প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার সামর্থ্য তার ছিল। এ জন্যে অবলীলায় প্রাণ পর্যন্ত সে বিসর্জন করতে পারতো, তাও বিশ্বাস করতাম।

একদিন গেলাম টালার বাড়িতে। যৌবনে উড়ে-যাওয়া পাখি এইখানে নীড় বেঁধেছে। হাসির সঙ্গে খুশির ভাব ছিল উপেনদার। বললেন—এ কৃতিত্ব আমার নয়রে। বামনীর পেটে পেটে যে এত বুদ্ধি ছিল, তা কি ভাই, বুঝতে পেরেছি কখনো? যে তিন বছর জেলে ছিলুম সেই সময় গভর্ণমেণ্ট দয়া করে তাঁকে মাসে মাসে যে মাসোহারা জুগিয়ে গেছেন, সেই টাকাটার কানাকড়ি খরচ না করে তিনি তাঁর ভাইয়ের হাতে দিয়ে গোটা টাকাটাই কোথায় যেন খাটিয়ে প্রায় ডবল করে ফেলেছিলেন। ফিরে এসে দেখলুম ব্যবস্থা তো মন্দ নয়। এ-নারী পুরুষ হলে কেষ্টবিষ্টু হতে পারতো, কিংবা সুযোগ সুবিধা পেলে রাণী রাসমণি অথবা সুলতানা রিজিয়াও হতে পারতো। ভাগ্যিস্ বামনী কলেজে পড়েন নি তাই রক্ষা! শ্যালকের ঘাড়ে ভর করে কিছুদিন লুচি, মণ্ডা আর দুটো ল্যাঙড়া আমের আস্বাদ যে গ্রহণ করবো, এ উপায়ও আর তিনি রাখেন নি। তাঁরই তাড়নায় চট্‌পট্ একটু মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে ফেলেছি ভাই।

কিন্তু সুখী পরিবারের সুখের দিন বুঝি বা ফুরিয়ে এলো। রাজনীতির আকাশে মেঘ ঘনিয়ে আসে; বাংলায় মেঘের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝড়ের আন্দোলন দেখা যায়। এই আশঙ্কার কথাটাই সেদিন বলতে গিয়েছিলাম তাঁকে।

বাংলার নেতৃত্ব নিয়ে সেনগুপ্ত ও সুভাষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন উভয় নেতার দল; নেতারা যেন ছিলেন শিখণ্ডী। সুভাষের মধ্যে উপেনদা চেয়েছিলেন রুদ্ররূপের প্রকাশ, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর সে রূপ চাপা পড়েছে বুঝিবা অপৌরুষেয় অহিংসার একটা মিথ্যা আবরণে। পিকেটিং,

বয়কট ইত্যাদি চলেছে এবং পুলিশের লাঠিও পড়ছে পিঠে, মাথায়। অহিংসার ভাষ্য এক এক সময় এমন চরমে ওঠে যে, তা মনে হয় শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী। পথের নিশানার চেয়ে বিপথে যাওয়ার ভয় থাকে বেশি। এখানে-ওখানে এক একটা বিস্ফোরণের আওয়াজ কানে আসে। উপেনদা উল্লসিত হয়ে ওঠেন। ওখানেই কি আছে তাঁর চাওয়া ও পাওয়ার নির্দেশ। উপেনদা তাও ঠিক বলতে পারেন না। কিন্তু তাঁর প্রকৃতি যে তাই গ্রহণ করেছিল; দুর্জনকে ডাণ্ডা দিয়ে ঠাণ্ডা করার নীতি তো সনাতন। সেই সনাতন নীতি ত্যাগ, তাঁর স্বধর্ম ত্যাগেরই তুল্য। ফল কি হবে এবং কবে ফলবে সে চিন্তা তাঁর নয়, কারণ মা ফলেষু কদাচন যিনি শিখিয়েছিলেন সেই সারথির শিক্ষা কি তবে ভুয়া?

এমন সময় হয়ে গেল একদিন লিলুয়ার ট্রেন দুর্ঘটনা। কত লোক মারা গেল, কত হলো আহত। তখনকার দিনে এমন দুর্ঘটনা হলে মৃত বা আহতের সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন হতো। লোকের মনে তখন রেল-কর্তৃপক্ষের প্রতি একটা ঘোরতর অবিশ্বাস ছিল। সাধারণের ধারণা এই ছিল যে, যারা দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে এই ভয়ে কর্তৃপক্ষ তাদেরকেও চালান করে দিত মৃতের দলেরই সঙ্গে কোথায় কোন্ অজ্ঞাত স্থানে। গুটিকয়েক ছাড়া হতাহতের নামও সহজে প্রকাশিত হতো না।

রেলকর্তৃপক্ষ বলতে বুঝাতো ইংরেজকেই। এমন ঘটনা ঘটলে ইংরেজ-বিদ্বেষ জেগে উঠতো সহজে। রাজনীতি ক্ষেত্রে এ ধরনের দুর্ঘটনার দাম ছিল।

লিলুয়ার ট্রেন-দুর্ঘটনার পর ফরওয়ার্ড পত্রিকায় ঐ দুর্ঘটনার এক ভয়াবহ বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল, "Horrified Spectator" এর নামে। যেন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ—হৃদয়হীনের অবর্ণনীয় নৃশংসতার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছিল তার ছত্রে ছত্রে।

ঐ বিবরণী প্রকাশের আগের দিনে নিশীথ রাত্রি পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র ছিলেন সত্য বক্সীর ঘরে।

ইংরেজ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ রেলের কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে ঐ বিবরণীর প্রতিবাদ এলো যথাসময়ে। তাঁরা জানালেন ঐ বিবরণীতে যা প্রকাশ করা

হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা, তা প্রত্যাহার না করলে তাঁরা ফরওয়ার্ড কোম্পানীর নামে ক্ষতিপূরণের দাবী দিয়ে মানহানির মামলা রুজু করবেন।

ফরওয়ার্ডের কর্তৃপক্ষ তা প্রত্যাহার করেন নি। সাধারণের মনে যে ইংরেজ-বিদ্বেষ জাগ্রত হয়েছিল তাকে পোষণ করে যাওয়াই ছিল তখন তাঁদের নীতি। সত্যের কাঠামোর উপর হয়তো রং-ফলানো হয়েছিল অনেকটা, কিন্তু তা সর্বসাধারণের গোচরীভূত করার অর্থ রাজনীতির উদ্দেশ্য পণ্ড করা। ফরওয়ার্ড কোম্পানী রেলকর্তৃপক্ষের শাসানিতে ভীত হতে রাজি হলেন না।

যথারীতি মামলা শুরু হলো। বিচারে হলো ফরওয়ার্ড কোম্পানীর লাখ টাকা জরিমানা। তখনো ক্ষমা প্রার্থনা করলে রেলকর্তৃপক্ষ এই টাকাটা দাবী করতেন না, কিন্তু সম্পাদক অচল, অটল। কেনই বা হবেন না? টাকাটা ঘর থেকে বার করে দিতে হবে একথা কে বলেছে শরৎ বোস থাকতে? ইংরেজের আইন আছে, কিন্তু আইনের ফাঁক নেই? প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার শরৎ বোসের ছিল জানা সেই ফাঁকির রাস্তা; তাঁর রাজনীতির গুরু পাকা ব্যারিষ্টার দেশবন্ধুই তৈরী করে গিয়েছিলেন এই ফাঁকির রাস্তাটা। তাঁর দূরদৃষ্টিতে দুর্দিনের দুর্দশা ধরা পড়েছিল, তাই তুলসী গোঁসাইয়ের টাকায় যে প্রেস কেনা হয়েছিল তা ছিল বেনামীতে।

যেদিন বিচারের রায় বার হলো সেদিন আমরা তো গালে হাত দিয়ে বসলাম। পরের দিন থেকে বুঝি আবার পথে ভাসতে হবে! অত টাকা দিলে কি কোম্পানী আর থাকবে? মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু বলা হলো আমাদের সবাইকেই যথারীতি অফিসে আসতে। ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হলো। গরীবের দুঃখে কি আর ইয়ারকি করবেন আমাদের কর্তারা?

এলাম অফিসে পরের দিন। হাতে এলো এক টুকরা টাইপ-করা কাগজ, তাতে লেখা আছে—তোমার চাকরি খতম! আমার একার নয়, দেখি সবারই কপাল পুড়েছে! খানিকক্ষণ বাদেই এলো আবার এক একখানা নিমন্ত্রণ পত্র—নতুন কাগজে নতুন চাকরি। ফরওয়ার্ড, বাংলার কথা, আত্ম-শক্তি এই তিনখানি গতায়ু কাগজের নবজন্ম হয়েছে, তাদের নতুন নামকরণ

হয়েছে ‘লিবার্টি’, ‘বঙ্গবাণী’ আর ‘নবশক্তি’। বাঃ রে বেটি বাঃ; শরৎ বোসের বাহাদুরি আছে বলতে হবে। তিনি রেল কোম্পানীকে অষ্টরম্ভা দেখিয়ে দিলেন!

ব্যারিষ্টার পি, কে, চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, রসময় ধাড়া এঁরা ইংরেজী বিভাগে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন। কিন্তু এঁরা ছিলেন যেন মরশুমী পাখির মতো, কিছুদিন থাকেন আবার অন্তর্ধান করেন। পি, কে, চক্রবর্তী লিখতেন চমৎকার কিন্তু লিখতেন খুবই কম; কারণ তাঁর প্রেরণা নামক মহামূল্য গুণটি প্রায়ই তাঁকে ফাঁকি দিত।

আমাদের দুঃখের দিন এলেও তখনো আমরা তেমন কিছু অনুভব করতে পারতাম না। ইংরেজের রক্তচক্ষু পড়েছে আমাদের উপর, মারণ উচাটনের যজ্ঞ চলেছিল তলে তলে কিন্তু সেদিকে তখনো আমাদের ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ মাঝে মাঝে ছোকরাদের দলে এসে এক একটা গল্প ছাড়তেন বেশ বাগবাজারী। মন্দ লাগতো না আমাদের।

প্রেমেনের দৌরাত্ম্যি চরমে উঠেছে। প্রায়ই ডুব মেরে দেয়, কখনো কখনো একটানা দু’তিন দিন আসে না। এলেও সকাল সকাল কোন্ সময় টুপ করে সরে পড়ে। কপি দিতে দিতে প্রাণ যায়। রাগটা তার উপর ক্রমেই জমে উঠছিল। একদিন ধরলাম তাকে চেপে। সেদিন ছিল সোমবার, বললাম—কি হে, শনিবারের দিন তো কখন পালিয়ে গেছ কেউ টের পায় নি; তারপর কাল একেবারে ডুব। ব্যাপারটা কি বলতো? তোমার জন্মে আমরা যে মারা যাই কেবলই কপি দিতে দিতে।

প্রেমেন রেগে জ্বলে উঠলো। ছোট দু টি চোখ পাকিয়ে সে জোর গলায় বললে—শনিবারের দিন সে সকাল সকাল গেছে বটে, কিন্তু প্রায় বারো স্লিপ কপি দিয়ে গেছে; কাল সে আসতে পারি নি, তার কারণ একটা রেস্তোরাঁতে সে বারোটা ডিমের মামলেট খেয়ে পেটটা একটু খারাপ করে ফেলেছিল। কপির সংখ্যার সঙ্গে ডিমের সংখ্যার এমন চমৎকার মিল শুনে আমরা হেসে ফেলেছিলাম।

ডাক পড়লো প্রিণ্টার অন্নদার। প্রমাণ চাই। অন্নদা উপরে উঠে

আসতেই প্রেমেন তড়বড় তড়বড় করে বকে চললো। অন্নদাকে সে কেন করে চেপে ধরেছে। শনিবারের তার দেওয়া কপি কোথায়, তা সে দেখতে চায়। তা ছাড়া, তার অভিযোগ এই যে তার লেখা প্রায়ই ছাপা হয় না; তাও সে লক্ষ্য করেছে। কেন, কারণ কি ?

অন্নদার বাড়ি ছিল খুলনা জেলায়। কালো চেহারা, দড়ির মতো পাকানো। গঞ্জিকা সেবনের ফলে বোধ হয় ঐ রকম দাঁড়িয়েছিল। প্রেমেনের অভিযোগ সব নীরবে শুনে গেল। তারপর এক সময় হেসে ফেললে।

আমাদের দিকে চেয়ে সে খুলনার ভাষায় মিষ্টি করে বললে—তা'লি ব-অলবো? সত্যি কথা ব-অলবো?

—বলো সত্যি কথা। বাধা কি?

—এই, আতে যহন কপি তাহে না বাবু, তহনই প্রেমেন বাবুর লেহা দিই। কেউ ধরতি চায় না বাবু, আমি ক-অরবো কি! অর্থাৎ হাতে যখন কপি থাকে না তখনই অন্নদা প্রেমেনের লেখা কম্পোজ করতে দেয়। কারণ কোন কম্পোজিটারই সে লেখা ধরতে রাজি হয় না—এতই বিশ্রী সে হাতের লেখা।

অন্নদার হাসিতে আমাদেরও হাসি পড়লো ফেটে। প্রেমেন কিন্তু বেহাই পেয়ে গেলো।

গোলমালে উপেনদা এসেছিলেন এ ঘরে। হেমেন্দ্রপ্রসাদও হাজির হয়েছিলেন। এমন কথা বলার ভঙ্গি বোধ হয় আর তিনি এর আগে কখনো শোনেন নি, বেচারীর বেদনাতে তাঁর সহানুভূতি এসেছিল।

অতঃপর শুরু করলেন হেমেন্দ্রপ্রসাদ: বুঝেছ উপেন, সেই যে সেবার গেলাম বিলাতে। হ্যাঁ, দেখেছি বটে একখানা লেখা। কী বলে এরা প্রেমেনের লেখা বিশ্রী—দেখলাম তো প্রেমেনের লেখা, তার তুলনায় এ তো সোনা!

সোৎসুক দৃষ্টিতে সবাই তখন চেয়েছে হেমেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে।

অতঃপর হেমেন্দ্রপ্রসাদ যে গল্প বললেন, তাতে জানা গেল লণ্ডনে অমুক বিখ্যাত সম্পাদকের সঙ্গে তিনি দেখা করেছিলেন। নাম-করা সংবাদপত্রের

সম্পাদক, নাম-করা প্রেসের সবটা তাঁকে সঙ্গে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছিলেন। এই সম্পাদকের হাতের লেখা এতই বিশ্রী ছিল যে, কোন কম্পোজিটরের বাপের সাধ্যি ছিল না তা কম্পোজ করা। তাঁর হাতের লেখা ধরবার জন্যে তাই নিযুক্ত ছিল একজন স্পেশাল কম্পোজিটর—সেই কম্পোজ করতো সে-লেখা। হেমেন্দ্রপ্রসাদ স্বচক্ষে দেখে এসেছেন সে লেখা। একখানা সাদা কাগজের উপরে কোন বোল্‌তা যেন কালি-মাখা পায়ে হেঁটে গেছে!

'বসুমতী' কাগজের অফিসের সামনে আগে ট্রামগাড়ি থামতো না। তাঁরি সম্পাদক থাকাকালীন ঐখানে ট্রাম থামাবার ব্যবস্থাও কি করে সম্ভব হলো, তাও হেমেন্দ্রপ্রসাদ শুনিয়েছিলেন একদিন। কিন্তু আজকের গল্প হলো অভিনব।

উপেনদাকে কেউ উপেন বলে ডাকে তা শুনিনি এর আগে আর কখনো। হেমেন্দ্রপ্রসাদের মুখেই শুনলাম প্রথম।

হেমেন্দ্রবাবুর গল্প শুনে উপেনদা হাসিমুখে শুধু 'হুঁ' বলে একটু বিস্ময় প্রকাশ ছাড়া মুখে আর কোন মন্তব্য করেন নি। তাঁর বিশ্বাস হলো কি না জানি না, তবে তিনি প্রেমেনের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—ওহে, তোমরা প্রেমেনের জন্যে ঐরকম একটা স্পেশাল কম্পোজিটর ঠিক করে ফেলো না।

প্রেমেনকে জব্দ করতে গিয়ে শেষটা আমরাই পড়লাম বিপদে। অতঃপর স্থির করা হলো কে কত কপি দিচ্ছে, তার হিসাব রাখা হবে। পরের দিন থেকে দেখি আমাদের আচার্যদেব সকলের লেখা জড়ো করে গজ কাঠি দিয়ে মেপে দেখছেন কার লেখা কতখানি ছাপা হয়েছে। এমনি চললো কিছুদিন। ফণীদার বিরক্তি দেখা যাচ্ছিল, আমাদের কাছেও এটা অতি বিশ্রী বোধ হচ্ছিল! এই মাপামাপি ব্যাপারটার যবনিকা টানলো শেষে সরোজ। সে ফণীদাকে এমন কিছু মাপবার ইঙ্গিত দিলে যাতে ফণীদা শুধু লজ্জিত হলেন না, ভয়ও পেয়ে গেলেন। আমরাও রক্ষা পেয়ে গেলাম।

ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে কুটিলতা সঞ্চারিত হয়েছে।

নিছক আদর্শবাদ থেকে আমরা সরে এসে দলাদলির মত্ততায় সঙ্কীর্ণ হয়ে উঠেছি। সংবাদ সাজাবার ও সংবাদ পরিবেশনের মধ্যে আমাদের শক্তির ক্রিয়া দেখতে পাই। কারো প্রাধান্য খর্ব করতে হলে তাঁর সম্বন্ধে সংবাদ অনেক সময় বিরল হয়ে আসে এবং কখনো বা তা ছাপা হয় কাগজের কোন এক কোণে ক্ষুদ্রাকার হরফের ক্ষীণ শিরোনামায়, পাছে তা ছাপিয়ে ওঠে আমাদের প্রিয় কোন ব্যক্তিকে। একটা বিশেষ দলের বিশেষ কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিবার কৌশল আমরা আয়ত্ত করে ফেলেছি। ছাপার হরফের বাণে প্রতিপক্ষকে কাত করতে পারলে উল্লসিত হয়ে উঠি।

কোন একটি বিশেষ ব্যাপার বা ঘটনাকে প্রাধান্য দিতে হলে কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার মুখপাতে মাথার উপরে দেড় ইঞ্চি দু' ইঞ্চি পরিমাণ মোটা হরফের শিরোনামা দিতে হতো—তাকে বলা হতো 'ব্যানার হেডিং।' ইংরেজের দ্বৈতশাসন ভেঙে ফেলবার চেষ্টাই তো চলছিল সেই অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবার পর থেকে। আমাদের বাণ নিক্ষেপের শিকার মিলতো কোন-না কোন দিন। এমনি একটা দিনে শরৎ বোসের উৎসাহ উচ্ছল হয়ে উঠলো। তিনি হঠাৎ মোটর হাঁকিয়ে এসে অফিসে উপস্থিত, বললেন—আজকের ব্যানার হেডিং দেবো আমিই, লেখো **Diarchy's Devilry Damned.**

পরের দিন আবার হাজির হয়ে প্যাণ্টের পকেটে বাঁ হাতখানা ঢুকিয়ে বর্মা চুরুটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেড়ে বললেন—কেমন ?

অর্থাৎ সেই ব্যানার হেডিংটা কেমন জুতসই হয়েছে তাই জেনে খুশী হতে চান তিনি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর খুশী হবেন, আর কথা আছে? আমরা সব দন্ত বিকশিত করে বললাম—চমৎকার।

এই সময় আর একটি মহিলার ভয়ে সত্য বক্সী কাতর হয়েছিলেন। এবার তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন উপেনদা, আমরা নই। এই মহিলাটিকে প্রথম

দেখেছিলাম মীর্জাপুর পার্কে (তখনো শ্রদ্ধানন্দ পার্ক হয়নি)। দেশবন্ধু সেদিনকার সভার সভাপতি। এই মহিলাটির সেই সভায় বক্তৃতা দেবার কথা ছিল। প্রায় শেষ মুহূর্তে তিনি এলেন। পরনে তাঁর ছিল আভূমিলুণ্ঠিত খদ্দরের একখানা লাল চওড়া পাড় শাড়ি, হাতে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ দোদুল্যমান। শেষ মুহূর্তে আসার সুবিধা এই যে, সমগ্র অপেক্ষমান জনতার দৃষ্টি গিয়ে পড়লো একসঙ্গে ঐ আগন্তুকার দিকে। যাঁরা তাঁকে আগে চোখে দেখেন নি তাঁরা মুগ্ধ হলেন। তাঁর বক্তৃতা কিন্তু মুগ্ধ করলো সকলকেই।

এরপর আরও কয়েকবার তাঁর বক্তৃতা শুনেছি। শেষ বক্তৃতা শুনেছিলাম এলবার্ট হলে—সেদিন তখনকার বৃটিশ পার্লামেন্টের ভারতীয় সভ্য সাকলাত-ওয়ালা ছিলেন সভার সভাপতি। চমৎকার বক্তৃতা দিয়েছিলেন এই মহিলা ইংরেজী এবং হিন্দী উভয় ভাষায়। বাঙালী মহিলার এই শক্তি সত্যিই শ্লাঘনীয়।

তারপর কলেজ স্কোয়ারের কাছে একদিন মহা হৈ-চৈ। কি হলো? কি হলো? শুনলাম ঐ মহিলাটিই কোন এক নাম-করা সাংবাদিককে তাঁর মুড়ো ছাতা দিয়ে ঠেঙিয়ে এসেছেন; কারণ ঐ ব্যক্তি মহিলাটির সম্বন্ধে কি একটা বিশ্রী মন্তব্য নাকি করে ফেলেছিলেন খবরের কাগজে।

অতঃপর উপেনদা ঐ মহিলাটির নামে সংযুক্ত পদবীটির একটুখানি অদল বদল করে, করে দিলেন 'গুণ্ডা'।

মহিলাটির কি একটা বাণী না বক্তব্য ছাপা হয় নি দেখে বার বার তাগিদ দিয়েছিলেন একসময় ফোনে। একদিন এসে সত্যবাবুর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিলেন। তথাপি ফল হয় নি দেখে দ্বিতীয় দিন আবার স্বয়ং এসে হাজির হয়েছেন। আজ আর বোধ হয় রক্ষা নেই। সত্যবাবুর বোধ হয় রণ-রঙ্গিণীর রূপ মনে পড়ে গিয়েছিল। তিনি তাড়াতাড়ি উপেনদার কাছে পালিয়ে এসেছিলেন।

মহিলাটি যেখানে বসেছিলেন সেইখানে উপেনদা গিয়ে কাগজ ও কলম তাঁর কাছে এগিয়ে দিয়ে বললেন—এই নিন, আপনার যা বক্তব্য লিখে দিন তো, নিশ্চয়ই ছাপা হবে; লিখুন আপনি, আমি আসছি একটু বাদে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। মহিলাটির লেখা আর শেষ হয় না। উপেনদা আবার উঠে গেলেন তাঁর কাছে। বিস্ময়ে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন—একি, মাত্র কয়েক লাইন লিখে আপনি বসে আছেন দেখছি! মাথাটা বুঝি ভালো নেই? তাই তো, চুলগুলোও দেখছি উস্‌কো খুস্‌কো। রোদে টো-টো করে ঘুরে সভা সমিতি করে বেড়ান, স্নান করবার সময় পান না বুঝি? মাথায় একটু ভালো করে জবাকুসুম মেখে সময় মতো নাওয়া খাওয়া করে দিন দুই বিশ্রাম নিন দেখি, তারপর আসবেন। রাজনীতি রাজনীতি করে ছুটে বেড়িয়ে স্বাস্থ্যনীতির প্রতি এমন উদাসীন হওয়া তো উচিত নয়।

লজ্জায় ও রাগে মহিলাটির চোখ মুখ লাল হয়ে গেলো! অমন ভালো বক্তৃতা করেন তিনি, কিন্তু লিখতে গিয়ে আজ এ কি হলো তাঁর! বোধ হয় ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এমন হয়। আর অপেক্ষা তিনি করতে পারলেন না। সেই যে নিষ্ক্রান্ত হলেন, আর কোন দিন এদিকে পা মাড়ান নি!

মহাকালের অনন্ত কর্মস্রোতে আমরা ভেসে চলেছি। একটানা স্রোত বেশ চলে, আবার কখনো তা বাত্যাসংক্ষুব্ধ হয়ে তরঙ্গ তোলে। এমন একটা সময় এসেছিল যখন আমাদের ছোকরাদের দলে নিম্ন চেতনার ঘাত-প্রতিঘাতের বালাই ছিল না। অর্থ, যশ, প্রতিদ্বন্দ্বিতার অশোভনতা, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের সাংসারিক বুদ্ধিগত বিচার আমাদের মধ্যে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ যে বলেছি এক এক সময় হয়তো বা কোথাও তরঙ্গ উঠতো এবং তা ছট্‌কে গিয়ে পড়তো কোথাও দূরে।

সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু এমনি একটি তরঙ্গে পড়লো ছট্‌কে। হঠাৎ একদিন আমরা তাকে হারালাম। সে গিয়ে যোগ দিলে ইংলিশম্যান পত্রিকায়। সুন্দর দোহারা চেহারা ছিল তার। গায়ের ফর্সা রঙে রক্তাভা মিলে তার স্বাস্থ্যকে উজ্জ্বল করে ধরতো। ধোপদুরস্ত শুভ্র খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবীও উড়ানি ছেড়ে ইংলিশম্যানে যোগ দিবার কিছুকাল পরে সত্যেন যখন একদিন

আমাদের ঘরে খাঁটি ইংলিশম্যানের বেশে এসে পা ফাঁক করে দাঁড়ালো, তখন আমরা তো অবাক। এক হাত তার পাত্‌লুনের পকেটে ঢোকানো, আর এক হাতে সিগ্রেট জ্বলছে!

How do you do?—বলে ধূমপানের সঙ্গে এমন চিবিয়ে আমাদের শুভাশুভের প্রশ্নটা সে বৈদেশিক ভাষায় করে বসলো যে, তা আমাদের কারো খারাপ লাগে নি। তখনকার দিনে বৈদেশিক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার ফলে সত্যেনের যে আর্থিক স্বাচ্ছল্য ঘটেছে, তা আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। তবু তার ইংরেজিয়ানার মধ্যে আমাদের প্রতি তার কোন করুণা প্রকাশ পায়নি কিংবা আমাদের মধ্যেও কোন ঈর্ষার ভাব জাগেনি। প্রাণের চাঞ্চল্যে তার বন্ধুবাৎসল্য উচ্ছল হয়ে উঠছিল। ভুলে গিয়েছিলাম সে আদর্শভ্রষ্ট হয়েছে, ভুলে গিয়েছিলাম সে ক্ষুদ্র জৈব-স্বার্থের খাতিরে আত্মিক ত্যাগের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। হাসিতে খুশিতে ইংরেজি-য়ানায় এবং বচন ভঙ্গিমায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বন্ধুদের প্রাণে পুলক সঞ্চার করে সত্যেন নিষ্ক্রান্ত হলো।

কিন্তু সত্যেন ইংরেজী আবহাওয়ায় বেশি দিন কাটাতে পারে নি। আমাদের অফিসে আনাগোনা আবার তার ঘন হয়ে উঠলো। এত পুলকের মধ্যেও কোথায় তার পীড়িত মন স্ব-স্থ হবার জন্যে যেন ক্রন্দন করছে বুঝতে পারতাম। তারপর একদিন যেমন সে হঠাৎ আমাদের বন্ধন ছিন্ন করে চলে গিয়েছিল, তেমনি হঠাৎ আবার একদিন সে আমাদের মধ্যে ফিরে এলো—নোঙর-ছেঁড়া নৌকা আবার যেন কূল পেয়েছে।

ইংরেজী ভাষায় যাকে বলে স্মার্ট সত্যেন ছিল তাই। প্রাণের প্রাচুর্যে আমাদের মধ্যে তার জুড়ি আর কেউ ছিল না—যদিও 'আমাগো ইসেকে' তার সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে আমরা একটা কাছাকাছি তুলনা খাড়া করবার ব্যর্থ চেষ্টা মাঝে মাঝে করেছি। শচীন প্রাণবান হলেও দৈহিক গুরুভারে বোধ হয় অবসন্ন এবং সেই হেতুই তার ঢিলে স্বভাব এবং একটু মদালস ভাব।

মোটা গ্রেট এন্টিক টাইপের তিন কলম হেডিং যুক্ত একটা গেলি প্রেস

ফাইলে রাখবার জন্যে একটা পিতলের শলাকায় বিঁধে হয়তো সত্যেন গেয়ে উঠলো—**La´-La´ ta re-ra´-a´-a´-a´ !**

অর্থ কি তা কে জানে ! নাচের ভঙ্গিতে তার একখানি পা ঐ সুরের ঝঙ্কারের সঙ্গে তাল রাখতো।

শচীন হয়তো বলে উঠতো—আর্-রে ইসে করো কি ?

সত্যেনের পরনে আবার ধুতি পাঞ্জাবী উঠেছে। মাথার চুলগুলি তার প্রায়ই থাকে সযত্ন আলুথালু বিন্যস্ত। ঢাকা জিলায় বাড়ি হলেও তার সেখানকার উচ্চারণ ভঙ্গিটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে, তার ক্রিয়ার শেষে 'লুম' প্রত্যয়ের বাহুল্য আর সহজে কানে বেসুরো বাজে না। তার টেলিগ্রাম সম্পাদনের ক্ষিপ্রতা অসাধারণ। সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী, কলিংবেল, চোখের উপরে ঝুলে-পড়া চুলের গুচ্ছ ঝাঁকি মেরে কপাল থেকে পিছন দিকে ছড়িয়ে দেওয়া, কলম চালাবার ফাঁকে ফাঁকে রবি ঠাকুরের দু'এক কলি গান গুনগুন করে গেয়ে নেওয়া—সবটা মিলিয়ে সত্যেন সৃষ্টি করতো এক অদ্ভুত মনোহারিত্ব। ক্ষিপ্র চাঞ্চল্য প্রজাপতির ধর্ম বলে কবিরা প্রচার করে এসেছেন, আমরা তাই সত্যেনকে ডাকতুম Butterfly বলে সত্যেন খুশি হয়ে বলতো—Really ? এই really শব্দটা তার মুখে বেশ শোনাতো। শচীনের ইসের মতো এটাও ছিল তার মুদ্রাদোষ, কিন্তু আমরা সত্যিই উপভোগ করতাম এটা।

বিকালের দিকটা থেকে সেদিন আকাশে মেঘলা মেঘলা ভাব ছিল। রাত্রি বোধ করি তখন আটটা বেজে গেছে। সত্যেনের টেবিলে টেলিগ্রামের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। কাজের লঘুতার সঙ্গে তার মনটাও হয়ে এসেছে হালকা। এমন সময় বৃষ্টি এলো আকাশ ভেঙে। আর সত্যেনকে পায় কে ? অমনি শুরু হলো তার রবিয়ানা—

"এমন দিনে তারে বলা যায়
এমন ঘনঘোর বরষায়।"

আমাদের এদিকেও প্রিণ্টার অন্নদার তেমন তাড়া নেই। রয়টার প্রেরিত বৈদেশিক সংবাদের এক চালান যা এসেছিল, তা সব শেষ করে বসে আছি। ফ্রী প্রেসের সংবাদের তাড়ার মধ্যেও এমন কিছু আর নেই, যার জন্যে ভাবনার প্রয়োজন আছে। এখনকার মতো টেলিপ্রিণ্টারের চলন তখন হয় নি। ডাক-পিওনের মতো বাহকরা এসে তখন খামে-ভরা টেলিগ্রামের তাড়া ফেলে যেতো। ফ্রী প্রেস, এসোসিয়েটেড প্রেস ও রয়টারের সংবাদ-বাহকদের মধ্যে রয়টারের পিওনের ছিল একটু আভি-জাত্য। সাইকেল থেকে বাতিটা খসিয়ে নিয়ে জুতোর খটখট শব্দ করে সে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতো—যেন ডেঞ্জার সিগন্যাল।

আমাদের ঘরের সামনেই একতলার অনেকখানি ছাদ উন্মুক্ত। বিশাল দরজাগুলি বন্ধ করতে কায়দা জানা চাই, গায়ের জোরেরও প্রয়োজন। বেয়ারা এসে বন্ধ করতে গেলে সত্যেন বারণ করলে। বৃষ্টির গুঁড়ো এসে গায়ে লাগছিল, তা লাগুক ; ঝড়ের ঝাপটা তো এখনো লাগে নি।

মতি এসে চা দিয়ে গেল আমাদের টেবিলে। তার দৃষ্টি ছিল সব সময় সজাগ। স্নেহশীলা নারীর মতো ছিল তার প্রকৃতি। শচীনদা বলতেন, বিধাতা ভুল করে তাকে পুরুষ করে পাঠিয়েছেন। সত্যেন লা গ্র্যাণ্ডি বলে উল্লসিত হয়ে ঠোঁট দু'খানা ছুঁচোলো করে চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক মেরে 'আঃ', করে উঠলো, তারপর মতির দিকে চেয়ে বললে—**That's why I love you so dearly, Mati !**

আমাদের খেলার রিপোর্টার রমেশ গাঙ্গুলী মোটা-সোটা ভারিক্কে গোছের লোক। তার চোখের চশমার কাচ দুখানা বেশ পুরু, বিজলি বাতির আলোয় আরো জলজল করে উঠছিল। খেলার মাঠ থেকে এসে সে তার রিপোর্ট শেষ করে ফেলেছিল। হাত খালি হলেই মনটা হালকা হয়। সত্যেনের সঙ্গে প্রায়ই হতো তার ইংরেজী বুলির বাণ মারামারি। তার বলার ভঙ্গিটা ছিল ফিরিঙ্গি ধরনের এবং তা ফুটতো স্বচ্ছন্দ ভাবে। একটা লম্বা বর্মা চুরুট মুখে পুরে সে এসে আমাদের মধ্যে একটা চেয়ার দখল করে থপ্ করে বসে পড়লো। সত্যেনকে সঙ্গী পেলে ঐ মোটা লোকটা কি করে যে

এমন হালকা হয়ে যেতো তা বলা যায় না। তার বসবার ভঙ্গিতে মনে হলো চুলোয় যাক রিপোর্ট আর চুলোয় যাক সব টেলিগ্রামের গাদা, আজকের দিনের এমন ঘন ঘোর বরষায় ওড়াই যাক না একটু হালকা হাওয়ায়। চায়ের পেয়ালায় দু'টি চুমুক মেরে চুরুটটা ধরিয়ে সে বললে—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ—একটি মধুর অথচ করুণ গল্প। **You may call it a story but it's the story of a life that's still burning. Belive it or not.**

রমেশ শুরু করলে :

চৌরঙ্গীতে গ্র্যাণ্ড হোটেল ছাড়িয়ে কিছুটা দূর এগিয়ে গেলে সারি সারি বাড়ির মধ্যে একখানা তেতলা বাড়ি দেখতে পাবে। ঐ বাড়িটা ছিল এক বিখ্যাত ইংরেজ ব্যবসায়ীর। দেশে-বিদেশে তাঁর কারবার। কলকাতা কেন্দ্রে ঐ বাড়িটার একতলা আর দোতলা ছিল অফিস। অনেক লোক কাজ করতো সেখানে। বলাই বাহুল্য বাঙালীর সংখ্যাই ছিল বেশি! এই বাঙালীদের মধ্যে একজন শুধু কেরানী হলেও হয়ে উঠেছিল সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ চেহারা, গায়ের রংটা কিন্তু কালো। কালো হলেও স্বাস্থ্যের গুণে লোকটিকে বেশ সুশ্রী দেখাতো।

এই শুধু কেরানীই দিনে দিনে শশিকলার মতো বেড়ে সাহেবের এমনি বিশ্বস্ত হয়ে উঠলো যে, তাকে ছাড়া আর সাহেবের চলতো না। অফিসের কাজের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই এমন অনেক ব্যক্তিগত কাজে সাহেব তাকে পাঠাতেন যত্র তত্র। লোকটিও সব কাজ অতি সুষ্ঠু ভাবে সমাধা করে আসতো। সাহেব প্রায়ই বিস্মিত হয়ে বলতেন—**Splendid! he can work wonders!**

এমন একটা কাল ছিল যখন সাহেবের নজরে পড়া মানে রীতিমত শ্লাঘার বিষয় এবং তা ছিল পরম সৌভাগ্যেরও হেতু। আর্থিক সাচ্ছল্য এবং সেই সঙ্গে নানান আরাম-বিরামের ব্যবস্থা তার হয়ে গেল দেখে, বাকি সকলের হলো ঈর্ষা। সকলেই তার দিকে কটাক্ষপাত করে নিজের নিজের ভাগ্যকে দিত ধিক্কার। সবাই তাকে সমীহ করে চলতে থাকে—কি জানি কারুর কোন বেচাল যদি সাহেবের কানে ওঠে তবেই সর্বনাশ! হঠাৎ সে যেন হয়ে

উঠলো সাহেবের পরেই ছোট সাহেব। বড় সাহেবকে বরং খুশি করা চলে, কিন্তু তার আগে ছোট সাহেবকে হাত না করলে যে নিস্তার নেই।

এ হেন অবস্থা হলে যা হয় তাই হলো এই বেচারীর, অর্থাৎ মাথাটা গেলো বিগড়ে। সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ সে ভুলে গেলো। সাহেবের আনুকূল্যে সে নিজেকে এত দূর উচ্চে তুলে ধরেছিল যেখান থেকে তার নিজস্ব ত্রুটি বিচ্যুতি আর তার কাছে অশোভন বলে মনে হতো না, তার আত্মবিশ্বাস যে আত্মবিস্মৃতির নামান্তর তা ধরবার শক্তি সে হারিয়ে ফেলেছিল। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো তাই বলছি এইবার।

বিলাতী জীবনযাত্রার মধ্যে যেটা আমাদের কাছে দুর্জ্ঞেয়, সেটা হচ্ছে সহজ স্বাচ্ছন্দ্য। মেয়ে-পুরুষের মেলামেশার সঙ্গে প্রাণবন্ত সমাজের যে দিকটা সহজে পরিস্ফুট সুন্দর, তার সঙ্গে পরিচয় আমাদের নেই বললেই চলে। এখানে ওখানে দু-চারটি ত্রুটির উল্লেখ করে আমরা যে কালিমা লেপন করবার চেষ্টা করি তার মধ্যে পাই আমাদের সুন্দরের প্রতি স্পৃহার অভাব!

সাহেব গ্রহণ করেছিলেন এই ব্যক্তিটিকে আপনার জনের মতো; তাকে দিয়েছিলেন তাঁর পরিবারে অবাধ মেলামেশার অধিকার। সাহেবের বছর কুড়ি বয়সের কন্যা লিলি ছিল অসামান্যা সুন্দরী। এমন অনেক দিন গেছে যখন সাহেব এই লোকটিকে পাঠিয়েছেন তাঁর কন্যার সঙ্গে, হয়তো কোথায় বাজারে কিছু কেনবার জন্যে কিংবা হয়তো আরো কোথাও। লিলির চাল-চলন, সংলাপ, হাসি-ঠাট্টা, কৌতুক, বিস্ময়, এমন কি মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র একটু অভিমানও তাকে এমন ভাবে আকৃষ্ট করে তুললো যে, সে ভাবতেই পারে না তার জীবনে এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটতে পারে।

লিলির কথা বলার ভঙ্গিতে ছিল যেন সঙ্গীতের মিঠে আলাপন; চলন-ভঙ্গিতে ছিল নৃত্যের লাস্য; বিস্ময়-প্রকাশে ফুটে উঠতো সুদূর কোন্ স্বপ্নরাজ্যের যেন মদির আভাস; ছোট্ট একটু অভিমানের শক্তি এমন প্রচণ্ড ছিল যে তাতে সে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেতো—মনে হতো এই মুহূর্তেই যদি তার প্রাণটা নিশ্চল স্তব্ধ হয়ে যায়, তবে বোধ হয় সে তার এই অপরাধ থেকে

চিরকালের জন্যে মুক্তি পেতে পারে। "No, no, how can I start at this late hour, you see? Couldn't you be a bit punctual?" —লোকটির মনে হতো এ তিরস্কার শোনার আগে সে মরেনি কেন। জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদের একটা টুকরো বুঝি আজ সে হারালো!

কিন্তু লিলির যে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল সহজাত, যে সৌজন্য ছিল তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গ, তাকে ভুল বুঝে বসলো এই লোকটি। সে ভাবলে লিলি তাকে ভালোবেসে ফেলেছে এবং সে ভালোবাসা ঐকান্তিক এবং নৈসর্গিক—যা সমাজ-বন্ধনের কঠোরতাকে তুচ্ছ করে দেয়; যা অন্ধ তমসার মধ্যে জ্বলে ওঠে আপনার দীপ্তিতে। আপনার মনে সে কেবলি কল্পনার জাল বুনতে থাকে। লিলি তার চিন্তাকে দিবারাত্রি আচ্ছন্ন করে থাকে, তার উদ্দেশে তার মন কেঁদে বলে—

"তুমি কি বংশী, আমি কুরঙ্গ
তুমি বহ্নি, আমি পতঙ্গ!"

লিলির সেরূপ কোন চেতনাই ছিল না, থাকবার কথাও নয়, কারণ—সে পরিবেশও কোথাও ছিল না। কিন্তু আমাদের ছোট সাহেব আপনার মনে মনে যে জাল বুনেছিল, তার মধ্যে সে লিলিকে ধরে ফেলেছিল। বলতে পারো এটা বিকার, কিন্তু এই বিকারই হয়ে উঠলো তার কাছে সত্য। এই ধারণায় যখন সে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন, সেই সময় একদিন সাহসে ভর করে সে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সরাসরি প্রস্তাব করে বসলো যে সে লিলির পাণিপ্রার্থী।

সাহেব এইরকম অসম্ভব, অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব শুনে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেলেন। তিনি কিছুক্ষণ এই প্রেমিক-প্রবরের মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইলেন। বলে কি লোকটা! তাঁরই ফার্মের একজন সামান্য কেরানী তাঁর কন্যা লিলির পাণিপ্রার্থী! এটা যে তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

সাহেব বললেন—"What do you say?"

লোকটি বললে—"I say what I mean"

সাহেব প্রথমে মনে করলেন লোকটির মস্তিষ্কের বিকার ঘটেছে।

পরক্ষণেই যে চিন্তা তাঁকে আকুল করলো সেটা এই যে, লিলি কি এই প্রস্তাবের মূলে আছে? সে কি সাড়া দিয়েছে? নইলে লোকটার এতখানি সাহস আসে কোত্থেকে? সাহেব একটু বিচলিত হয়ে উঠলেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃতি ছিল ধীর, স্থির, শান্ত; তাই তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে অতি সহজ কণ্ঠে জবাব দিলেন—**"You are serious, I see, my boy! Let me think over it. See me afterwards."**

সাহেব এই যুবকটিকে তাড়াতাড়ি বিদায় দিতে চাইলেন, কারণ তিনি তাঁর কন্যার জন্যে ইতিমধ্যে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। লিলির কাছে এই লোকটি কি সত্যিই প্রশ্রয় পেয়েছে?

সেদিন সাহেব আর বেশিক্ষণ আফিসে অপেক্ষা করেন নি। লিলির কাছে তাঁর সবটা শোনা দরকার। তাঁর জীবনে এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা কি তাঁকে সত্যিই বহন করতে হবে?

পিতার এমন অস্বাভাবিক মূর্তি লিলি আর কখনো দেখেনি। সাহেবের মুখটা নীল হয়ে গিয়েছিল, যেন কোন্ ঘোর দুর্যোগের ছায়া তাঁর মুখে ঘনিয়ে এসেছে। পিতা কি অসুস্থ? লিলি সহসা কোন প্রশ্ন করতে সাহস করেনি। একটা অজানা আশঙ্কায় তার শরীর কম্পিত হচ্ছিল।

নির্বাক পিতা খানিকক্ষণ বাদে ধাতস্থ হলেন। তারপর কন্যার মুখের দিকে চেয়ে বিস্ময়ে অথচ স্নেহের স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—**"Lily, are you ....are you betrothed?"**

Betrothed! বাবা বলেন কি? বাবা কি পাগল হয়ে গেলেন নাকি! কবে কোন্ সে প্রণয়ী তার প্রণয়ভিক্ষা করেছে, যাকে সে কথা দিয়ে ফেলেছে? কলকাতা শহরে তার স্বদেশী এমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার এ রকম ঘনিষ্ঠতা হয়েছে—তা তো সে মনে করতে পারে না। সম্প্রতি কিংবা কিছুকাল আগে কিংবা আরো অতীতে ফিরে গেলে কোন ব্যক্তিরই ছবি তো তার চিত্তে ভেসে উঠছে না। তেমন সুযোগও তার কখনো মিলেছে বলে তো মনে পড়ে না; তা ছাড়া এই চেতনাও কি তার জেগেছে? পিতার সমস্ত প্রশ্নটাই তার

কাছে ঘোর রহস্যজনক মনে হলো। "What nonsense you are talking papa !"—লিলি হঠাৎ এক সময় বলে উঠলো।

সাহেব এইবার সাহস সঞ্চয় করে তাঁর বাঙালী কেরানীর দুঃসাহসিক প্রস্তাবের কথা কন্যাকে জানালেন।

"Good Heavens ! How dare he"—লিলির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়েছে ! এই অপমান, এই লজ্জা তাকে বহন করতে হবে ? না, কক্ষনো না। সিংহীর মতো সে গর্জন করে উঠলো। পিতাকে সে পরিষ্কার জানিয়ে দিলে যে, তার মনে আজ পর্যন্ত এ ভাবের কোন ছায়াপাতও হয়নি ; আর তা ছাড়া ঐ ব্যক্তি ? এমন ঘৃণ্য ধারণা যদি তার মনে উঠতো তবে সে তনুত্যাগ করতো !

সাহেব তাঁর কন্যার কাছে আনুপূর্বিক সব শুনে আশ্বস্ত হলেন। তাঁর মুখের স্বাভাবিক ভাব আবার ফিরে এলো। কেরানীপুঙ্গবকে তিনি অত্যধিক স্নেহে তাঁর পরিবারে অবাধ মেলামেশার সুযোগ ও অধিকার দিয়েছিলেন, তার পরিণাম এই ? তাঁদের সমাজে এ ধরনের ব্যাপারে বিভিন্ন স্তর আছে —যেমন সখ্য, 'কোর্টসিপ', নর-নারীর মিলনের পারস্পরিক ইচ্ছা ও সম্মতি, অতঃপর উভয়পক্ষের অভিভাবকদের সম্মতি ও শুভেচ্ছা। শীর্ষ স্তরে উঠতে এতখানি অধ্যবসায় দরকার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে-সবের কোন বালাই-ই নেই। এক পক্ষের এ সম্বন্ধে কোন চেতনাই নেই অথচ অপর পক্ষ এতদূর এগিয়ে গেছে ! লোকটার কোন শিক্ষা নেই, সভ্যতার ধারণাও তার অদ্ভুত। কিংবা তার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটেছে, এইটাই বোধ হয় সত্য। বিলাতী সমাজ-জীবনের সঙ্গে অনভ্যস্ত এই ব্যক্তিকে তাঁর পরিবারে অবাধ অধিকার দিয়ে তিনি ভুলই করেছেন। যাই হোক, সাহেব তাঁর কন্যার অন্ধকার ভবিষ্যতের যে কল্পনা করেছিলেন তা থেকে তিনি মুক্তি পেলেন, তিনি ধাতস্থ হলেন।

পরের দিন ডাক পড়লো প্রেমিক-প্রবরের সাহেবের কামরায়। সাহেব তাকে অতি শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—"Are you serious about your proposal?"

প্রেমিক বললেন নিশ্চয়, নইলে তার জীবন-ধারণের কোন অর্থই হয়না। লিলিকে তার চাই-ই চাই।

"That's true But what about the other side?"—সাহেবের কণ্ঠ তখনো শান্ত, কোমল।

অপর পক্ষের কথা? অপর পক্ষ তার সঙ্গে হেসেছে, খেলেছে, কথা কাটাকাটি করেছে, রাগ করেছে, অভিমান দেখিয়েছে এমন কি কোথাও যাবার সময় পীড়াপীড়ি করে তাকে স্পর্শও করেছে! অপর পক্ষের চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে তার ধারণা এখনো ভুল? প্রেমিক কেরানীর দৃঢ় ধারণা থেকে বিচ্যুতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সে জবাব দিলে—অপর পক্ষও তাকেই চায়।

সাহেব তথাপি শান্ত অথচ গম্ভীর কণ্ঠে প্রেমান্ধ যুবককে বুঝিয়ে বললেন যে, তিনি তাকে তিন দিন সময় দিচ্ছেন; এই তিন দিনের মধ্যে তার মস্তিষ্ক থেকে যদি এই উদ্ভট কল্পনা দূর না হয় তবে তাকেই এখান থেকে দূর হতে হবে।

বাঙ্গালী যুবকের মস্তিষ্ক উর্বর ছিল। এই তিন দিনে তার কল্পনার শাখা প্রশাখায় ফুল ফুটে গেছে। এমন উৎকট প্রেম কেউ কখনো দেখেনি। তিন দিন পর যথারীতি সে সাহেবের কামরায় স্বয়ং উপস্থিত হয়ে বললে—"Well, Mr.—I must have Lily. She also does want me, I know."

সাহেব তাঁর চেয়ার থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন—"You are violently in love, I see. But I, too, know how to be violent."

সাহেব কঠিন হস্তে যুবককে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করলেন এবং দারোয়ানকে নির্দেশ দিলেন—এ পাগলা আদমীকো অন্দর আনে কভি মৎ দেও।

ব্যস্। প্রণয়ীর প্রণয়-সাধনার অপমৃত্যু এইখানেই ঘটলো।

রমেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে উদাস ভাবে টানতে টানতে অতি গম্ভীর ভাবে আবার শুরু করলে:

আমি বললুম প্রায় বছর বিশেক আগেকার ঘটনা। কিন্তু ভাই আশ্চর্য এই যে, ঐ বিতাড়িত, লাঞ্ছিত যুবকটির মন থেকে লিলি আজও মুছে যায় নি। লোকটি সেই থেকে প্রতিদিন সকালে এসে সাহেবের ঐ বাড়িটার দিকে কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, তারপর আরও কিছুক্ষণ পায়চারি করে চলে যায়। সুদীর্ঘ কালের মধ্যে এর বিরাম নেই। প্রথম প্রথম হয়তো এর মানে ছিল—যদি পায় সে লিলির দেখা একটি মুহূর্তের জন্য, হয় নয়নগোচর বাতাসে আন্দোলিত তার একরাশ রেশমের মতো চুল অথবা তার বিলোল দেহের স্বচ্ছন্দ সঞ্চার, কিংবা যদি আসে কানে তার এক টুকরো হাসির সুমধুর ঝঙ্কার! সাহেব শুনেছি মারা গেছে অনেক দিন হলো, আর লিলি কোথায় তা কে জানে? কিন্তু লোকটির নিত্য আসার বিরাম নেই। বিশ্বাস না হয়, যে-কোন দিন সকালে চৌরঙ্গীতে বেড়াতে এসে দেখে যেও।

আশ্চর্য এই যে রমেশের এদিনকার এই গল্পের আসরে ছিল আমাদেয় বিজয়লালও। নারীর প্রসঙ্গে সতত স্পৃহাহীন এই লোকটির কিন্তু বিন্দুমাত্র অরুচি দেখা যায় নি সেদিন; কাহিনীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে ছিল অনন্যমনা শ্রোতা। প্রকৃতির প্রভাব বোধ করি সেদিন সে আর এড়াতে পারে নি। ভিজা বাতাসের ছোঁয়া আর অবিশ্রান্ত বর্ষণের ধ্বনি হয়তো তাকে করে দিয়েছিল উদাস। হয়তো তারও চিত্তে সেদিন বেজে উঠেছিল কবির ক্রন্দনধ্বনি—

"(আজি) বরষা গাঢ়তম
নিবিড় কুন্তলসম,
মেঘ নামিয়াছে মম
দুইটি তীরে।"

রমেশ আবার একটা চুরুট ধরিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে লাগলো। এবার তার দৃষ্টি আমাদের কারো দিকে ছিল না, ছিল অন্য কোথাও।

অবিশ্রান্ত বর্ষণ এবার ক্ষান্ত হয়ে এসেছে। রোটারি মেসিনটার কর্কশ ধ্বনি এতক্ষণ চাপা পড়ে ছিল, আবার তা কানে আসে, রাত্রি তখন প্রায় এগারোটা। আমাদের ঘরের নিশাচর রজনীবাবু আর ও-ঘরের 'নাইট

এডিটর' মোহিত মৈত্র ইতিমধ্যে হাজির হয়ে গেছেন—একজন বিড়াল-ভেজা, অপরজনও তথৈবচ।

বলডুইন সাহেবের বক্তৃতার পিণ্ডি চট্‌কে কোথায় রেখেছি আর গান্ধী মহারাজের সবরমতী-আশ্রমের নয়া বিদেশিনী লীলাচঞ্চলা নাগিনী দেবীর হরিজন-সংমিশ্রণের চটকদার বিবরণীটা কতদূর গেছে, তা বুঝিয়ে যাবার তাগিদ আর বোধ করিনি।

হয়তো এর পরে আকাশে আবার দুএক'টি করে তারকা দেখা দেবে। আমাদের ভারাক্রান্ত মন হয়তো সেই দিকে চেয়েই আজকের এই বর্ষণমুখর রাত্রির করুণ কাহিনীটার নায়কের জীবনের ব্যর্থতার হেতু খুঁজবে।

সেদিন ঘরে ফিরেছি, কিন্তু ফিরবার পথে দেহের সঙ্গে মনের সংযোগ খুব কমই ছিল।

রমেশের কাহিনীটা সত্যিকার কাহিনী কিনা তার প্রমাণ নেবার জন্যে তার পরের দিন চৌরঙ্গীর ধারে ছুটবার তাগিদ বোধ করি নি। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম সে কথা।

এর ঠিক ক'দিন পরে মনে নেই। একদিন ভবানীপুরে যাবার তাগিদ ছিল। ভোরের দিককার ট্রাম ধরেছিলাম কলেজ স্ট্রীট থেকে। এসপ্লানেডের বদলি ট্রামটা হু-হু শব্দে এগিয়ে চলছিল, ভোরের মিঠে বাতাসে গা এলিয়ে দিয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ বাঁ দিকে নজর পড়তেই ছাতা হাতে একটি লোককে দেখতে পেলাম—স্থাণুবৎ সামনে এক বাড়ির দিকে চেয়ে আছে। চট করে রমেশের কাহিনীটা মনে পড়তেই আমি ট্রামটা আর একটু এগিয়ে গিয়ে থামতেই নেমে পড়লাম। ঘুরে এসে দেখি রমেশের বর্ণনার সঙ্গে লোকটির হুবহু মিল। শাদা ধবধবে একটি পাঞ্জাবী গায়ে কালোবরণ এই প্রেমিক 'লেস্‌লী হাউস' এর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

আমি প্রায় মিনিট দশেক এদিক ওদিক পায়চারি করে ফিরছিলাম ঐ লোকটির দিকে চোখ রেখে। তার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য প্রকাশ পায় নি। ঠিক একই ভাবে স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটি চেয়েছিল ঐ বাড়িটার দিকে,

মাঝে মাঝে শুধু ঈষৎ একটু হাসির কম্পন কালো মুখখানিতে কি একটা অনির্বচনীয় দীপ্তি এনে দিচ্ছিল।

ভেবে পাইনি একি তপস্যা তার। একি বিকার, না নিষ্ঠা? তার বাহ্য রূপে বিকারের কোন চিহ্ন আমার চোখে পড়ে নি। বিচিত্র মন মানুষের, এই লোকটির মন কোন্ অচল আবেষ্টনীতে বাঁধা পড়ে কিসের স্বপ্ন দেখছিল দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর?

আমি আর অপেক্ষা করি নি বেশিক্ষণ। রমেশের কাহিনী কল্পিত নয়।

দণ্ডিধারী মহাত্মা ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা করলেন; লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হলো। বিজয়লালও এই আন্দোলনে ঝম্প প্রদান করলো, একথা আগেই বলেছি এবং তারো আগে বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ আত্মকলহ দেখা দিয়েছিল তার কথাও বলা হয়েছে।

১৯৩০ এলো ঘটনাবহুল হয়ে। ডাণ্ডি অভিযান, প্রেস অর্ডিন্যান্স, সেনগুপ্তের নতুন দৈনিক সংবাদপত্র "এডভান্স", সাংবাদিকদের প্রতিবাদ বৈঠক, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ইত্যাদি।

সেনগুপ্ত দেখলেন তাঁর দলীয় মনোভাব প্রকাশের একমাত্র উপায় তাঁর নিজস্ব মুখপত্র। তাঁর দলভুক্ত যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে জে, সি, গুপ্তই সব চেয়ে শাঁসালো। বিশেষ করে তাঁরই আনুকূল্যে সাধন প্রেসের পত্তন হলো এবং ইংরেজী দৈনিক "এডভান্স" প্রকাশিত হলো এই সালের গোড়াতেই।

ফরওয়ার্ডের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয়েছিল 'লিবার্টি'রূপে আর আমাদের বাংলার কথার 'বঙ্গবাণী'রূপে—সে কথা আগেই বলেছি। ডাণ্ডি অভিযানের মধ্যে আমরা নতুন রাজনৈতিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা যেন দেখতে পাচ্ছিলাম। লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর আমাদের কর্মপন্থা কি হবে তার একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল না যেন। এই আন্দোলন কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সে বিষয়েও একটা স্পষ্ট ছবি বেশি

লোকের মনে এসেছিল কিনা তাও বলতে পারি না। তবু কিছু না-করার চেয়ে এ যেন কিছু করা এবং হয়তো এরই মধ্যে আছে শক্তির বীজ, এমনই মনে করেছিলেন অনেকে।

এই শক্তি স্ফুরণের কাজে বিশেষ করে সাহায্য করবে সংবাদপত্রগুলি সুতরাং সেগুলির কণ্ঠরোধ করা চাই! ইংরেজ কর্তৃপক্ষ তার ব্যবস্থা করছিলেন। তাঁরা করলেন প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি। লবণ সত্যাগ্রহের কোন সংবাদ ছাপা চলবে না—এই নিষেধ-আজ্ঞা দেওয়া হলো সকল সংবাদপত্রকে।

সত্যাগ্রহ চলবে, সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের লাঠি চলতে থাকবে অবাধে, কারাগারের লৌহশৃঙ্খলে বাঁধা পড়বে দলে দলে—এসব সংবাদ ছাপলে সর্বসাধারণের মনে উদ্দীপনা এনে দেবে এবং তা হয়তো এমনি বিপ্লবের সৃষ্টি করবে যার পরিণাম হবে ইংরেজের পক্ষে মারাত্মক। সিংহ-রাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার এত বড় স্পর্ধা সহ্য করা যায়? সুতরাং রাজদণ্ডের সঙ্গে রক্তচক্ষুও দেখা গেল।

গবর্ণমেণ্টের তরফ থেকে লিবার্টি, এডভান্স, আনন্দবাজার পত্রিকার কাছে টাকা আমানত রাখবার আদেশ এলো; উদ্দেশ্য এই যে, সুবোধ বালকের মতো আচরণ না করে কাগজগুলি যদি বেয়াড়াপনা করে ফেলে তবে জমার টাকাটা বাজেয়াপ্ত করা হবে।

সাংবাদিকরা অতঃপর তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হলেন। তাঁদের সমিতির বৈঠকে এই হীনতার প্রতিকারের কথা উঠলো এবং শেষ পর্যন্ত একটি সাব-কমিটি গঠন করে তার উপর ভার দেওয়া হলো যথাকর্তব্য স্থির করতে। এই সাব-কমিটি প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এক সভা আহ্বান করলেন। এই সভায় লিবার্টি, এডভান্স, আনন্দবাজার পত্রিকার তরফ থেকে জানানো হলো, গবর্ণমেণ্টের এই অবমাননা সহ্য করার চেয়ে বরং কাগজ বন্ধ করে দেওয়া ঢের ভালো। আমাদের গায়ের জ্বালা ছিল সব চেয়ে বেশি। ই, আই, রেলওয়ের সঙ্গে মামলায় আমরা অনেকটা নির্জীব হয়ে পড়েছিলাম।

আমাদের প্রতিষ্ঠানে তখন তিন তিনখানা কাগজ, আর তা ছাড়া আমরা দাগী আসামী; সুতরাং আমানতের টাকার অঙ্কও ভারি, মারা গেলেই আমরাও যে মারা পড়বো ঐ সঙ্গে। সত্যবাবু জেলে, মোহিত মৈত্র তখন লিবার্টির সম্পাদক। তিনি এবং বঙ্গবাণীর সম্পাদক গোপাল সান্যাল বিশেষ করে এই ব্যাপারে উৎসাহী হয়েছিলেন। আনন্দবাজারের তরফ থেকে মাখন সেনও ছিলেন আমাদের মতাবলম্বী। মৃণালকান্তি বসু পড়লেন বিপদে। তিনি সাব-কমিটির সভাপতি হলেও অমৃতবাজার পত্রিকায় চাকরি করেন অথচ কর্তৃপক্ষ কাগজ বন্ধ রাখার ঘোরতর বিরোধী। আমাদের পক্ষে মত দিতে গেলে তাঁকে চাকরিটা খোয়াতে হয়, তা তাঁর পক্ষে যখন সম্ভব নয় তখন কর্তৃপক্ষের মতটার উপরই তাঁকে ঝোঁক দিতে হলো। বাদানুবাদের মাত্রা তখন ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে হাতাহাতির উপক্রম হয়-হয়; আমাদের গোপাল সান্যাল গেলেন ক্ষেপে। তারপর একটা হট্টগোলের মাঝে কি যে হয়ে গেল তা বলা যায় না। মৃণালবাবুর বোধ করি চোখের চশমা গেলো ভেঙ্গে কিংবা কি যেন একটা হলো। রুচিবাদী শান্ত রামানন্দ-বাবুর জীবনে এমনতরো ঘটনা বোধ হয় আর কখনো ঘটে নি। ভদ্রলোকদের কাণ্ড দেখে একেবারে হক্‌চকিয়ে গিয়ে তিনি সভা ত্যাগ করে গেলেন। সভা পণ্ড হয়ে গেলো।

বসুমতী নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছিল। তার সম্পাদকের লাঞ্ছনা হলো মাখন সেনের হাতে শ্যামবাজারের মোড়ে। তখনকার দিনে সে একটা চাঞ্চল্যকর ঘটনা।

অমৃতবাজার পত্রিকা কিংবা বসুমতীর প্রকাশ বন্ধ হয় নি। কাগজ বন্ধ রাখার পক্ষপাতী যাঁরা তাঁরা বোধ হয় সপ্তাহ দুই কোন প্রকারে কাটালেন। দেখা গেলো এই পথে যাঁরা পা বাড়িয়েছেন তাঁরা অচিরে মরে ভূত হবেন। তবু একেবারে মরার চেয়ে বেঁচে মরাই ভালো বোধ হয়েছিল তখন। সুতরাং অমৃতবাজারের পন্থানুসরণে পুনর্মূষিক হতে হলো। ইতিমধ্যে কিন্তু উত্থান-পতনের চাকা ঘুরে গেছে।

আমাদের সত্যিকার বিপর্যয়ের শুরু বোধ হয় এইখানেই। কিন্তু তখন সে বিষয়ে সচেতন হবার মতো মনের অবস্থা আমাদের ছিল না। তখনকার দিনে রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র ছিল এইখানে, আমরা পরোয়া করি কাকে? এডভান্স তো সবে সে দিন ভূমিষ্ঠ হয়েছে। জনগণের শুভদৃষ্টি আছে আমাদের দিকে, আমাদের দাবিয়ে উপরে উঠবে কে?

আমাদের পৌর প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশন সুরেন বাঁড়ুজ্যের কল্যাণে গবর্ণমেণ্টের কবল-মুক্ত হয়েছিল। দেশবন্ধু এই প্রতিষ্ঠানকে 'ক্যাপচার' করেছিলেন ১৯২৪ সালে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যরাই এটি ক্যাপচার করে আসছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের 'মেয়র' হওয়াটা ছিল অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। সেনগুপ্তকে গান্ধীজীই দেশবন্ধুর উত্তরাধিকারী হিসাবে যে ত্রিমুকুট পরিয়েছিলেন তার মধ্যে এই গৌরবের মুকুটটিও একটি। তিনি বার পাঁচেক মেয়র হয়েছিলেন; মাঝে একবার ফস্‌কে গিয়েছিল ১৯২৮ সালে, তার কারণ বাংলা কংগ্রেসের এই দলাদলি। অকংগ্রেসী বিজয় বসু সেবার মুকুটটি নিয়েছিলেন কেড়ে। ১৯২৯ সালে সেনগুপ্ত আবার হলেন মেয়র। ভালো রে ভালো। তিনি যে পথ ছাড়তে নারাজ। আসল কথা শুধু পদ-গৌরব নয়, কর্পোরেশন হাতে এলে শক্তিও আহরণ করা যায় অনেকখানি। দলীয় লোকদের পুষ্টিসাধনের জন্যে এবং সেই সঙ্গে পৌরজনদের তুষ্টিসাধন করতে হলে এই কামদুঘা দখলে রাখা একান্ত দরকার। সুভাষচন্দ্রের অধ্যবসায় অতঃপর সফল হলো ১৯৩০ সালে।

আমরাও যেন একটা নতুন শক্তি পেলাম। মনে আছে সে সময় কর্পোরেশনের সভায় কাউন্সিলর শরৎ বোসের বক্তৃতা হলে আমাদেরও হতো সে দিন বিপদ। কেননা, তাঁর পুরা বক্তৃতা ছাপতে আমাদের কাগজের তিন চার কলম ছাপিয়ে যেতো। হয়তো এমনও হতো যে শরৎ বোসের বক্তৃতার স্থান করতে আর একটা দরকারী সংবাদকে দূরে ঠেলে রাখতে হয়, অথচ সেটাও যে যাওয়া দরকার। বিপদটা হ'তো

এইখানেই। কবি গোবিন্দদাসের মতো আমাদেরও মনের অবস্থা তখন হতো এইরূপ :—

"বালিকা যুবতী দুই,
কারে রেখে কারে থুই !"

বিপর্যয় আসুক কিন্তু আমাদের মারে কে ? আশা ছিল অনন্ত, নৈরাশ্যে অভিভূত হবার মতো তখনও যে কিছুই ঘটে নি।

এমন সময় এই ১৯৩০ সালেই আমরা আর একজন বিশিষ্ট বন্ধুকে হারালাম। তিনি হচ্ছেন নবশক্তি-সম্পাদক শচীন সেনগুপ্ত। তাঁর সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ সত্যিই বেদনাদায়ক। বিশেষ করে ব্যথিত হয়েছিলেন উপেনদা, কেন না তিনিই তাঁকে এনেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানে। তিনি পরোয়া করতেন না কাউকেই, একথা আগেই বলেছি। সম্পাদক হিসাবে তাঁর স্বাধীনচিত্ততার তুলনা ছিল না। তিনি যা সত্য বলে বুঝতেন তা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হতেন না, নির্ভীকভাবে তাঁর মতামত তিনি ব্যক্ত করতেন। কিন্তু দলগত একটা কাগজের সম্পাদককে নির্ভীকতাও যে সংযমের বাঁধে বেঁধে রাখতে হয়, তার কৌশলটা উপেন বাঁড়ুজ্যে শচীন সেনগুপ্তকে চেষ্টা করেও শেখাতে পারেন নি। চাকরিটা যে তিনি রাখতে পারবেন না, সে আশঙ্কা উপেন বাঁড়ুজ্যের যেমন হয়েছিল তেমনি হয়েছিল আমাদেরও। তাঁর সম্পাদকীয় মেজাজের দু'একটা নমুনা আগেই দিয়েছি। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর নামে জমার অঙ্কে অভিযোগ ভারি হয়ে উঠেছিল। তার জের চলেছিল অনেক দিন ধরে এবং প্রায় বছর খানেক পরে তার পরিণতি আমরা দেখতে পেলাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর শরৎ বোসের নোটিশে। নোটিশখানি অফিসের সাইকেল পিওন শচীন সেনগুপ্তের বাসায় মাসের শেষ দিন রাত্রিতে গিয়ে দিয়ে এসেছিল। নোটিশের বক্তব্য এই :—

19, British India Street, Calcutta.
30th September, 1930.

Dear Sir,

In view of the situation created by the Press Ordinance,

I have decided to effect reduction in our establishment. Among others, I have decided not to continue the post of Editor of 'Nabashakti,' as a separate entity. I regret therefore that I have to give you notice that your services will not be required from tomorrow (the 1st October, 1930). You will, of course, be entitled to one month's pay (that is for the month of October) and I am instructing the office accordingly.

I have to thank you for the services you have rendered to the Company during the period you have been Editor of 'Nabashakti' and I can assure you that it is with regret that I have to part company with you.

Yours truly,

S. C. Bose

Managing Director, Liberty Newspapers Ltd *

ভাবার্থ এই—প্রেস অর্ডিন্যান্সের ফলে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে ব্যয়-সঙ্কোচই বিধেয় বলে শরৎবাবু স্থির করে ফেলেছেন এবং এও স্থির করেছেন যে নবশক্তির সম্পাদকের পদ আর তিনি স্বতন্ত্র রাখবেন না। কাজেই পরদিন থেকে শচীন সেনগুপ্তের আর এ অফিসে আসার প্রয়োজন নেই। অবিশ্যি উপরন্তু এক মাসের বেতন তাঁকে দেওয়া হবে।

শচীন সেনগুপ্তকে বিদায় দিয়ে শরৎবাবু তাঁর সেবার কথা স্মরণ করে ধন্যবাদ জানাবার কালে দুঃখিতও হয়েছেন।

ঘটনাটি আকস্মিক হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। শচীন সেনগুপ্তকে কর্তৃপক্ষ কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর বিরুদ্ধে কি ভাবে অভিযোগ জমা হয়েছিল তা তাঁকে লিখিত সুভাষচন্দ্রের একখানি চিঠি থেকে জানা যায়।

* শ্রীরবি সেনগুপ্তের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

চিঠিখানা এই—

1, Woodburn Park,
Calcutta.
9. 10. 29.

My dear Sachin Babu,

I have been receiving complaints regarding the editorial policy of Nabashakti for some time past. I ignored these complaints at the beginning, because I frankly wanted to give you a free hand in the matter. But you have alienated so many important individuals and parties that I am forced to take action now. Your article against the Sarda Bill which goes against the policy followed by the Congress and by our paper also calls for serious notice. I shall therefore be glad if you kindly let me know what policy you have followed on the following topics :—

(1) Political
(2) Economic
(3) Literary
(4) Social

Re : literature, I understand you have taken up a point of view opposed to Sarat Babu (Chatterji).

Re : politics and economics, the propaganda carried on by Nabashakti is slightly anti-Congress. I understand that in some of the writings of this character, important individuals connected with the Congress have been ridiculed.

I have not the least desire to suppress freedom of opinion—but you will certainly realise that the editor

of a paper is not altogether a free-lance and he has to adopt a certain policy on certain important questions of the day. After I hear from you, I shall be in a position to realise how far your policy departs from ours—if at all. One thing is clear—*viz.* that our three papers must follow a uniform policy with regard to the important questions and problems.

Please treat this as strictly confidential.

Yours sincerely
Subhas C. Bose.

P. S.—kindly send me the back issues of Nabashakti from the very first issue.

S. C. B.

সুভাষবাবুর বক্তব্য এই—

কিছুকাল থেকে তিনি নবশক্তির সম্পাদকীয় নীতি সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ পাচ্ছেন। প্রথম প্রথম তিনি এসব উপেক্ষা করতেন, কেননা সম্পাদককে তিনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সম্পাদক মশায় এত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও দলকে ইতিমধ্যে হারিয়েছেন যে, শেষটায় বাধ্য হয়ে তাঁকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। সম্পাদক মশায় 'সরদা বিল' সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা কংগ্রেস এবং তাঁদের নিজস্ব সংবাদপত্রের নীতিবিরুদ্ধ, এটাও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য। কাজেই সম্পাদক মশায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাহিত্য বিষয়ক ব্যাপারে কি নীতি অনুসরণ করেন, তাই সুভাষচন্দ্র জানতে চান।

সাহিত্য বিষয়ে সম্পাদক মশায় শরৎ চাটুজ্যের নীতির বিরুদ্ধবাদী বলে তিনি জেনেছেন।

রাজনীতি এবং অর্থনীতির ব্যাপারেও নবশক্তি-সম্পাদক কংগ্রেসের

বিরুদ্ধেই কতকটা যাচ্ছেন এবং এ ধরনের কয়েকটা লেখায় নাকি তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে উপহাসই করেছেন।

অতঃপর স্থভাষবাবু বলছেন যে, স্বাধীন মত প্রকাশে বাধা দেওয়ার ইচ্ছা তাঁর আদৌ নেই, তবে সম্পাদকের এটা নিশ্চিন্ত জানা দরকার যে, তিনি একেবারে স্বেচ্ছাচারী নন, তাঁকেও বর্তমান কালের কয়েকটা প্রধান প্রধান বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট নীতি মেনে চলতে হবে। এসব বিষয়ে সম্পাদকের অভিমত জানতে পেলে তিনি বুঝতে পারবেন তাঁদের মতের সঙ্গে সম্পাদকের মতের আদৌ কোন পার্থক্য আছে কি না। বস্তুত প্রধান প্রধান বিষয় ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাঁদের তিনখানা কাগজকেই একই নীতি অবশ্য মেনে চলতে হবে।

স্থভাষবাবু নবশক্তি-সম্পাদকের নামে যে সব অভিযোগ এনেছিলেন, তা বিশ্লেষণ করতে গেলে এর পিছনকার ইতিহাস একটু জানা দরকার। যতদূর সম্ভব মনে করা যাক।

আমাদের কাগজ ছিল কংগ্রেস-পন্থী। কিন্তু কংগ্রেস-পন্থী বলেই কংগ্রেসের কোথাও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটলে সেটা উদ্ঘাটিত করতে পারবেন না, সম্পাদক এমন দাসখত লিখে দেন নি। আদর্শ ও পন্থার স্থসঙ্গতি হলে কাজ সহজসাধ্য হয়—সম্পাদকের কাজ সেইদিকে দৃষ্টি ফিরানো। কংগ্রেসের অনুস্থত কোন পন্থা জনকল্যাণের পরিপন্থী হলে সম্পাদক মশায় যদি তার উল্লেখ করে থাকেন, তবে তাঁকে কংগ্রেস-বিরোধী বলতে পারি না। দেশবন্ধু স্বরাজ দল গঠন করে গান্ধী-বিরোধী হয়েছিলেন, কংগ্রেস-বিরোধী হন নি; স্থভাষচন্দ্রও তখন কোন কোন বিষয়ে উগ্র মনোভাব পোষণ করলেও নিজেকে কংগ্রেস-বিরোধী বলে মনে করতেন না। নবশক্তি-সম্পাদক কর্মক্ষেত্রে নেমে এতখানি দুঃসাহস দেখান নি বটে, কিন্তু লেখনীর মুখেও কি এমন কিছু তিনি প্রকাশ করেছিলেন যাতে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ কংগ্রেসের বিরোধী বলা যেতে পারে? মনে তো পড়ে না।

মনে পড়ে একটা সামাজিক ব্যাপারের কথা। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে **Age of Consent Bill** সম্পর্কে একটা কমিটি বসেছিল।

সেই কমিটির সমগ্র রিপোর্টটি নিয়ে নবশক্তি-সম্পাদক তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। Age of Consent এর বাংলা হয়েছিল সহবাস-সম্মতির বয়স। যৌন সম্পর্কের ব্যাপার সুতরাং এই নিয়ে একটা হৈ-চৈ পড়ে গিয়েছিল চার দিকে। যারা 'অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়' তাঁরা হঠাৎ নীতিবাগিশ হয়ে 'ধর্ম রসাতলে গেলো' বলে চীৎকার শুরু করেছিলেন, আর যাঁরা সংস্কার-পন্থী তাঁরা একটু বেশি উৎসাহী হয়েছিলেন। এই দু'য়ের মাঝখানে যৌন-বিজ্ঞানের ছাত্র শচীন সেনগুপ্ত দেশ-কাল-পাত্রের বিচার করে এ দেশে যৌনবোধের বয়স ঠিক করবার প্রয়াসী হয়েছিলেন। আমাদের সরোজ রায়-চৌধুরী সুভাষচন্দ্রের ছাত্র, সুতরাং এ তত্ত্বে সে গুরুর মতোই ছিল অনভিজ্ঞ; শচীন সেনগুপ্ত তাকে এই সময় মাঝে মাঝে গড়ের মাঠে টেনে নিয়ে গিয়ে এই তত্ত্বকথার তালিম দিতেন। এমন সময় ঐ বিলটির উত্থাপন হওয়ায় তাঁর পক্ষে তা নিয়ে গবেষণা করা স্বাভাবিক হয়েছিল।

কিন্তু সত্যেন মিত্র ছিলেন Consent Committee-র সভ্য। শচীন সেনগুপ্তের গবেষণায় তিনি আহত হয়ে সুভাষবাবুকে এক পত্রাঘাত করেছিলেন। সুভাষবাবু অতঃপর সেই চিঠি নবশক্তি-সম্পাদককে দেখিয়ে তাঁর কৈফিয়ত দিতে বলেন। সম্পাদক মশায় বলেন, প্রবন্ধে তিনি যা লিখেছেন তার অতিরিক্ত আর তাঁর কিছুই বলবার নেই।

কিশোরগঞ্জে একবার এক হিন্দু জমিদারের বাড়িতে মুসলমান হানা দেয়। টাকাকড়ি ইত্যাদির সঙ্গে দলিল পত্রাদিও তারা লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। এটা হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বলে প্রচারিত হয়েছিল, ওখানকার কংগ্রেস কর্মীরাও বলেছিলেন তাই। শচীন সেনগুপ্ত এই সংবাদের উপর যে মন্তব্য করেছিলেন তাতে তিনি এই কথা বলেন যে, ওটা আসলে দাঙ্গা নয়, অর্থনৈতিক সমস্যায় এহেন সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, তারই সূচনা মাত্র। কিশোরগঞ্জে কংগ্রেস কর্মীরা চটে গিয়ে সুভাষবাবুর কাছে নালিশ করেন। সুভাষবাবু নবশক্তি-সম্পাদককে বললেন—কংগ্রেস কর্মীরা চটে গেলে তাঁর পক্ষে ক্ষতি হবে। সম্পাদক মশায় বললেন—আমি নাচার। যা সত্য বলে বুঝেছি তাই লিখেছি।

সুভাষবাবু শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-নীতি বলে যা উল্লেখ করেছেন তা আমদের কাছে দুর্বোধ্য, কারণ এরকম কোন নীতি তাঁর ছিল কি না তা আমাদের জানা নেই। তাঁর যা নীতি ছিল তা তো "সবার উপরে মানুষ সত্য" এবং সেই সত্যই তিনি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে প্রচার করেছেন। শচীন সেনগুপ্ত সেই নীতি থেকে ভ্রষ্ট হয়েছিলেন কি না তা বুঝতে পারি নি। কল্লোল সাহিত্য-চক্রের যে সব তরুণ শক্তিশালী লেখকের লেখায় সতেজ প্রাণধর্মের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল, তাঁদের কারো কারো কোন কোন লেখায় 'কামগন্ধ নাহি তায়' এমন সচ্চরিত্রতার সার্টিফিকেট হয়তো ছিল না, কিন্তু তাই বলে তাঁরা অপাংক্তেয় হবেন কেন? তারুণ্যের দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁরা কি অভ্যর্থনার যোগ্য ছিলেন না? বস্তুত তাঁরা অপাংক্তেয়ই হয়ে ছিলেন। একমাত্র তাঁদের নিজেদের কাগজ ছাড়া অন্যত্র তাঁদের লেখা প্রকাশিত হতো না। শচীন সেনগুপ্ত তাঁদের দলকে তাঁর কাগজের লেখক করে নিয়েছিলেন সাদরে। অতঃপর 'ভারতবর্ষ'-সম্পাদক জলধর সেনও শচীন সেনগুপ্তের নীতি অনুসরণ করেন এবং উত্তরকালের ইতিহাস না বললেও চলে। এই দলের প্রতি ব্যক্তি বিশেষের আক্রোশ শরৎ চাটুজ্যের নামে চলে যায় নি তো? কারণ, শরৎচন্দ্রও যে এই দলকে তাঁর পক্ষপুটে টেনে নিয়েছিলেন। সুতরাং অভিযোগটা দুর্বোধ্যই রয়ে গেলো।

আর একটি বড় রকমের সংঘর্ষ হয়েছিল—সেটা নবশক্তি-সম্পাদকের সঙ্গে খোদ সুভাষচন্দ্রের। ১৯২৯ সালে কলকাতায় অখিল ভারত যুব সম্মেলনের যে অধিবেশন হয়েছিল তাতে বক্তৃতা দিবার সময় সভাপতি সুভাষচন্দ্র বলেন যে, দেশে দু'টি School of Thought গড়ে উঠেছে—একটি হচ্ছে সবরমতীতে আর অন্যটি পণ্ডিচারীতে। এই উভয় স্থানের ভাব-পন্থীদের 'Propaganda' দেশের ঘোর অনিষ্ট সাধন করছে, তাঁদের চিন্তার ধারা দেশে নিষ্ক্রিয়তা ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই নিষ্ক্রিয়তাও যে কি ধরনের তারও উল্লেখ সুভাষবাবু করেন। যথা—**It is the passivism, not philosophic but actual, inculcated by these Schools of Thought against**

which I protest. বলা বাহুল্য, সবরমতী হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর আশ্রম আর পণ্ডিচারী শ্রীঅরবিন্দের সাধনপীঠ। এই আক্রমণের পিছনে সুভাষবাবুর মনে বোধ করি এই ভাবটা ছিল যে, সবরমতীর গান্ধীবাদে রাজনীতির সঙ্গে অহিংসার যে জগাখিচুড়ি আছে তা নিষ্ক্রিয়তারই নামান্তর, আর পণ্ডিচারীর আশ্রমজীবন যা, তা কেবল কর্মবিহীন সন্ন্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়—অর্থাৎ 'মায়াময়মিদং অখিলম্ !'

গান্ধীজী রাজনীতি-ক্ষেত্রে অহিংসার অবতারণা করেছিলেন এবং সকলকে কায়েনমনসাবাচা অহিংস হবার জন্যে যে প্রোপাগাণ্ডা করেছিলেন তাও ঠিক; কিন্তু তাই বলে তিনি নিষ্ক্রিয়তার উপাসক ছিলেন, এ অপবাদ তাঁকে কেউ দিতে পারে নি। তিনি দেশে যে বিপুল কর্মপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন সুভাষচন্দ্রের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ তারই ফল।

শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন যা তা কর্মকে অস্বীকার নয়, পরন্তু কর্মকেই স্বীকার এবং তার জন্যে চাই নিজের প্রস্তুতি। কিন্তু কি সেই কর্ম? নিষ্কাম নিরাসক্ত কর্ম—যা আত্মোপলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা হয়েছে ভাস্বর, সত্য। শ্রীঅরবিন্দের মত ও পথের সন্ধান যাঁরা কথঞ্চিৎ করেছেন তাঁরাই বলতে পারেন শ্রীঅরবিন্দের আদর্শ কি।

সম্পাদক শচীন সেনগুপ্ত স্বয়ং সুভাষচন্দ্রের উক্তির একটি ছোট্ট প্রতিবাদ করে বোধ হয় ঐ কথাগুলিই জানিয়ে দিলেন। অতঃপর পণ্ডিচারী থেকে কবি সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী একটি বড় প্রতিবাদ লিখে পাঠান। এই প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্রের প্রতি তীব্র ভর্ৎসনা ছিল এবং তা ছিল যুক্তির দিক দিয়ে অকাট্য। সম্পাদক মশায় সেটি সুভাষচন্দ্রকে দেখিয়ে জানতে চান, সেটা তিনি ছাপবেন কি না। সুভাষ হাঁ না কিছুই বললেন না। এতে সুভাষের মনোভাব কি তা বুঝতে পেরে সম্পাদক মশায় আর একটি প্রতিবাদ এমন ভাবে লিখলেন, যাতে শ্যাম ও কুল উভয়ই রক্ষা হয়। এই লেখাটি সুরেশ চক্রবর্তীর লেখার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে একসঙ্গে প্রকাশ করতে চাইলে এইবার সুভাষচন্দ্র সম্পাদককে মত দিলেন।

সুভাষবাবু রাজনৈতিক কর্মী অরবিন্দকে বুঝতে পারতেন, ধ্যানী

অরবিন্দকে বুঝতে পারেন নি। তাই তাঁর বক্তৃতায় Life of contemplation নিন্দনীয় হয়েছিল। কর্ম কর্ম করে ছুটাছুটি করে লাভ নেই। কর্ম হওয়া চাই জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ, তবেই তা হবে আসল কর্ম এবং সেই আসল কর্মের জন্য অরবিন্দ ধ্যানে বসেছিলেন—যোগস্থ হয়েছিলেন। সুরেশবাবু তাঁর লেখায় সুভাষচন্দ্রের উক্তি কেটে কেটে বিশ্লেষণ করে খণ্ডন করেছিলেন এবং বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দের লেখা থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন—

"সুভাষবাবু যদি অরবিন্দের যে কোন একখানা বই পড়তেন তবে তিনি পণ্ডিচারীর School of Thought এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন সে অভিযোগ আনতে তাঁর মনে হিমালয়ের সমান দ্বিধা হতো। কেননা পণ্ডিচারীর School of Thought শ্রীঅরবিন্দেরই চিন্তাধারার চার পাশে গড়ে উঠেছে। এখানে জীবনকে ত্যাগ করার কোন কথাই নেই—তবে তাকে যোগমুক্ত করার কথা আছে বটে। কেননা যোগেই মানুষ আপনার গভীরতম সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে। তাই যোগ মানে সন্ন্যাস নয়, বাণপ্রস্থ নয়, নির্বাণ নয়।"

সুভাষবাবু যুবজনসভায় সভাপতি রূপে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর চোখে ছিল 'তরুণের স্বপ্ন', তিনি নিজেও তখন তরুণ, তাই তাঁর তারুণ্যের লক্ষণ যে চাঞ্চল্য তা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর বক্তৃতায়। স্বদেশের মুক্তির জন্যে তিনি যে অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি চেয়েছিলেন অবিলম্বে গড়ে তুলতে এক নবীন ভারত—মুক্ত ও মহীয়ান ভারত—To create a new India at once free and great.

আমার কিন্তু মনে হয় সবরমতী বা পণ্ডিচারীর ভাবপন্থীদের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্র যে বিষোদ্গার করেছিলেন তা ছিল নিতান্তই বাহ্য, তাতে তাঁর আসল মনের চেহারা ঢাকা পড়েছে। সুভাষচন্দ্রের মনে তত্ত্বানুসন্ধিৎসা কম ছিল বলে আমি মনে করি না। তিনি বাল্যকালে যে বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে মত্ত হয়েছিলেন সেই বিবেকানন্দের গুরু কি জাতীয় কর্মী ছিলেন, তা সুভাষচন্দ্রের অজানা ছিল না। তবু সুভাষচন্দ্র যে অধীর হয়ে উঠেছিলেন তার কারণ আছে। কারণটা আমার মনে হয় সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক। গান্ধীজী

সংগ্রাম করতে চেয়েছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে, কিন্তু অহিংস ভাবে—এটা সুভাষের স্বভাব-বিরোধী। সবরমতীর প্রতি আক্রোশের হেতু এইখানে। আর পণ্ডিচারীর প্রতি বক্রোক্তির মূলীভূত কারণ, সুভাষের অন্তরঙ্গ বন্ধু দিলীপকুমার রায়ের পণ্ডিচারী আশ্রমে যোগদান। শুধু তাই নয়, বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী অনিলবরণ রায়ও হয়েছিলেন আশ্রমবাসী। এক জন বন্ধু, অপর জন সহকর্মী—এই দুয়ের বিচ্ছেদ-বেদনা তাঁকে বিহ্বল করেছিল, বিভ্রান্ত করেছিল।

সম্পাদক মশায় সুরেশ চক্রবর্তীর প্রতিবাদের সঙ্গে নিজের লেখাটা লেজুড় বেঁধে দিয়ে বাদানুবাদের ব্যাপারটা যদি এইখানেই দাঁড়ি টেনে ইতি করে দিতেন তবে ল্যাঠা চুকে যেতো। কিন্তু ব্যাপার হলো এই যে, সুরেশ চক্রবর্তী আবার একটি দেড় গজী প্রতিবাদ পাঠিয়ে দিলেন। এইবার সম্পাদক মশায় কিঞ্চিৎ সাহস দেখিয়ে ফেললেন। তিনি সুভাষচন্দ্রকে কিছু না জানিয়েই দিলেন লেখাটা ছাপিয়ে—যা থাকে বরাতে! বরাত যে নেহাত মন্দ তা পরে টের পাওয়া গেলো। সম্পাদকের স্পর্ধা দেখে সুভাষ-শরৎ দুই ভাই-ই রুষ্ট হলেন।

ফলটা প্রকাশ পেলো প্রায় বছরখানেক বাদে।

একটা বিষয় এখানে খুবই লক্ষ্য করবার মতো। সুভাষচন্দ্র যে স্বয়ং শচীন সেনগুপ্তের লেখা পড়তেন না এবং তিনি যে পরের মুখে ঝাল খেতেন তা স্পষ্ট। কেননা তিনি সম্পাদক মশায়ের কাছে একেবারে গোড়ার সংখ্যা থেকে কাগজ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন।

নবশক্তি-সম্পাদকের পদ আর স্বতন্ত্র রাখা হবে না শরৎবাবু এই আভাষ দিয়েছিলেন তাঁর পত্রে, কিন্তু তা যে সত্য নয় তা প্রকাশ পেলো যখন সরোজ রায়চৌধুরী শচীন সেনগুপ্তের স্থলাভিষিক্ত হলো। উপেনদা, এতে ব্যথিত হয়ে বলেছিলেন সরোজের ঐ পদ গ্রহণ করা ঠিক হয় নি, কারণ তাঁর মতে আমরা যারা শচীন সেনগুপ্তকে ভালোবাসতাম তাঁদের কেউ ঐ পদ গ্রহণ করলে তা আত্মসুখকর হবে না। শচীন সেনগুপ্তকে উপেনদাই এনেছিলেন, তাই তাঁকে হারাবার দুঃখ আমাদের চেয়ে তাঁরই হয়েছিল তীব্রতর।

শচীনদা তাঁর দম্ভ নিয়ে বসলেন হাতীবাগান বাজারের পাশে গ্রে স্ট্রীটের উপরে ঐ দোতলা বাড়িটাতে তাঁর রাস্তার দিকের ঘরখানায়। অতঃপর চূড়ান্ত দুরবস্থার মধ্যে কি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন তাঁর দেখেছি। ধূলি-মলিন উইপোকাবহুল ঘরখানার মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কাগজপত্র ও বইগুলির মধ্যে তাঁকে দেখতে পেতাম অনমনীয়—আত্মশক্তি-সম্পাদকের আত্মশক্তিতে অবিচলিত। তাঁর দম্ভ তাঁকে ছোট করে নি, তাঁকে উপরেই তুলে ধরেছে।

বিজয়লালের অন্তর্ধানের পর তার বদলে যিনি এসে হাজির হলেন তিনিও নামে বিজয়। পূর্বগামীর মতো অতটা লাল না হলেও বিজয় ছিল তাঁর ভূষণ—পূরা নামটা বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত। বরিশালবাসী, সুতরাং সত্য বক্সীর সঙ্গে হৃদ্যতা থাকা স্বাভাবিক। বুঝলাম সত্যবাবুই তাঁকে এনেছেন। বরিশালে বিজয়ভূষণের একটা ছোটখাটো ছাপাখানা ছিল এবং মফঃস্বলে চালু 'বরিশাল' নামে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রও তাঁর ছিল এবং সে কাগজে 'বরিশাল-হিতৈষী' সম্পাদকের মতো নীলাম-ইস্তাহার ছাপবার জন্যে তিনি কখনো লালায়িত হন নি, একথা তাঁর মুখে শুনেছি।

বিজয়টাই যে তাঁর ভূষণ তা দু'চার দিন বাদেই টের পেয়ে গেলাম। মুখ্যত ইংরেজী টেলিগ্রামের অনুবাদ করাটাই সহকারী-সম্পাদকের কাজ। এই কাজ বিজয়ভূষণকে দেওয়া হলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করে বেঁকে বসলেন। অবিশ্যি তাঁর বাঁকা হাওয়ার কাজটা আমাদের অলক্ষ্যেই হয়ে গেল সত্যবাবুর কাছে। সেখানে গিয়ে তিনি অভিযোগ করলেন, এই গাধার খাটুনি খাটবার জন্যে তিনি তাঁর সুদূর মফঃস্বলের কাজ-কারবার গুটিয়ে এই কলকাতা শহরে আসেন নি; বস্তুত তাঁকে আনা হয়েছে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখবার জন্যে। সুতরাং বিজয়ভূষণের ক্ষুব্ধ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। সত্যবাবু এই মফঃস্বলত্যাগীর প্রতি করুণায় বিগলিত হলেন, বিজয়ের বিজয় হলো। অতঃপর তিনি তাঁর কাম্য কর্মে প্রবৃত্ত হলেন।

মাথায় বিজয়লালের প্রায় সমান সমান হলেও বিজয়ভূষণের দেহটা অমন বলিষ্ঠ ছিল না, ছিল একটু ঢিলে গোছের। বিজয়লালের মতো অমন পৌরুষব্যঞ্জক কণ্ঠ কিংবা অট্টহাস্যও তাঁর ছিল না। তাঁর হাসিটা ছিল একটু অন্য ধরনের, আল্‌তো করে ঠোঁটে মাখানো, আর গলার স্বরটা ছিল একটু মেয়েলী ধরনের মিহি। বেশ পরিচ্ছন্ন, শান্ত, ভদ্রস্বভাব অথচ প্রখর বুদ্ধিশালী। ইংরেজীতে যাকে বলে **practical** বিজয়ভূষণ ছিলেন তাই। ভাবের ধোঁয়ায় উড়ে যেতে তাঁকে কোন দিন দেখি নি।

যাই হোক, আমার সঙ্গে বিজয়ের কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয়ে উঠলো খুব। কিছুদিন বাদেই কি একটা প্রবন্ধের জন্যে গোপাল সান্যালকে যেতে হলো জেলে। এই ফাঁকে বিজয়ভূষণের নামই বঙ্গবাণীর সম্পাদক বলে ঘোষিত হলো। গোপাল সান্যাল আর বিজয়ভূষণই এসময় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন। গোপালবাবু জেলে যাওয়ায় বিজয়ভূষণ একা পড়ে গেলেন। দু'টি প্রবন্ধ এবং গুটিকয়েক করে প্যারা লেখা তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। কাজেই বিজয়ভূষণ টেনে নিলেন আমাকে। মাঝে মাঝে নরেশ সেনগুপ্তকেও দু'একটি প্যারা তিনি লিখতে দিতেন। এই সময় দেখেছি বিজয়ভূষণ একটু অভিভাবকত্ব করতে ভালোবাসেন, উপদেশ তাঁর মুখে সব সময় লেগেই আছে। মাঝে মাঝে পীড়াবোধ করলেও কেন জানি মনে হতো বিজয়ভূষণ আমার দরদী বন্ধু—আমার প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী। তাই তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বেড়ে গেল। সরকারী ভাবে না হলেও প্রবন্ধ বা প্যারা লিখে বিজয়ভূষণকে আমি সাহায্য করতাম এবং এ অধিকার তিনিই আমাকে দিয়েছিলেন।

বছর গড়িয়ে আসতে আমরাও যেন নীচে গড়িয়ে যাচ্ছি টের পেলাম। এর আগে যা কখনো মনে স্থান পায় নি তা এখন মনে বাসা বাঁধছে। এডভান্স বেশ চালু হয়েছে, অমৃতবাজারের আবার উঠ্‌তি অবস্থা, আনন্দবাজারের অবস্থাও ভালো হয়ে উঠলো। আমাদের মধ্যেও ভাঙন ধরেছিল। এডভান্সের পত্তন হতে আমাদের ভিতর থেকে সেখানে গিয়ে যোগ দিয়েছিলেন পি. কে. চক্রবর্তী, ধীরেন সেন—সাংবাদিক মহলে তাঁদের যোগ্যতা ছিল সর্বজন-

স্বীকৃত। সুখী-পরিবারের তাঁরা ছিলেন উপরের স্তরের লোক। এই ভাঙনে আমাদের মনেও কিছুটা ভাঙন ধরেছিল বৈকি।

আমাদের কর্তৃপক্ষও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। বছরের শেষের দিকটায় হঠাৎ যেন নৈরাশ্যের ছায়া ঘনিয়ে এলো। দুর্দিনের অনিশ্চয়তার কল্পনায় শঙ্কিত হয়ে উঠি। কর্তৃপক্ষ নতুন করে পরিকল্পনা করেন, নতুন পরিবেশে নতুন সজ্জায় আবার নব উৎসাহ জাগ্রত করা যায় কি না তার বিষয়ে তাঁরা সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। তারি মাঝে আলোর একটুখানি চাকচিক্য মনকে দোলা দিয়ে ওঠে, কিন্তু বল পাইনা বুকে। সত্যিই কি এই সুখী-পরিবারের স্বপ্নসৌধ ভেঙ্গে এক দিন চুরমার হয়ে যাবে? হয়তো সেদিনের আর বেশি দেরি নেই।

আমাদের কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীটের কর্মকেন্দ্র গেলো এখান থেকে সরে অন্যত্র। ১৯৩১ সালে আমরা উঠে এলাম আপার সার্কুলার রোডে শিয়ালদহ স্টেশনের কাছে রেলওয়ে কলোনির ধারে যেখানটায় কবরখানা আছে তারই সামনে। বুঝলাম আমাদেরও কবরের দিন ঘনিয়ে এসেছে।

এই বাড়িতে আসার পর অনুবাদের বোঝা আর বেশি দিন বইতে হয় নি আমাকে এই যা সৌভাগ্য। সেটা একমাত্র বিজয়েরই আনুকূল্যে। এইবার প্রকৃত বান্ধব বলে বিজয় আমার কাছে উদ্ভাসিত হলো। অতঃপর গোপাল সান্যাল, বিজয় আর আমিই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতাম। আমাদের গণেশ—বিরজা ভট্টাচার্যও এ সময় মাঝে মাঝে সম্পাদকীয় স্তম্ভে তাঁর কলম চালিয়ে আমাদের সাহায্য করতেন। এ অঞ্চলে আসার পর বিজয় তার বাসা বাঁধলো আমারই মেসের কাছাকাছি। দু'জনে প্রায়ই এক সঙ্গে ফিরি রাত্রি দশটা-সাড়ে দশটায়। একটা অজানা আশঙ্কা মনে আসে, তাই ফিরবার পথে দু'জনে দুঃখের গান গাই, বিজয় ক্রমাগত উপদেশ বর্ষণ করে। এখন বেশ লাগে। পূর্ববঙ্গের লোক হলেও বিজয় পূর্ববঙ্গের কথার টানটা অতি অধ্যবসায় সহকারে চাপা দিয়েছিল, সহজে ঠাহর করা সম্ভব ছিল না। কথা বলবার আগেই সে 'এ-ই-ই' শব্দটা একটা সম্বোধন হিসাবে ব্যবহার করতো

বিজয়ের এই বর্ণচোরা আম হবার একটা কারণও ছিল। বরিশালবাসী হলেও সে জীবনসঙ্গিনী এনেছিল নদীয়া থেকে, বোধ করি তাঁরই প্রভাবে বিজয় বিসর্জন দিয়েছিল তার আঞ্চলিক ভাষাকে। এই ভদ্রমহিলার গর্ব প্রায়ই বিজয় আমার কাছে করতো। সত্যিই গর্ব করার মতো। অসাধারণ স্বাস্থ্যবতী ও কর্মঠা ছিলেন এই নারী। আমার মতো বিজয়ের বহু বান্ধবকে তাঁর বাসায় আপ্যায়িত করবার দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে তাঁকে; কিন্তু তাঁর প্রসন্ন মুখে কোন দিন বিরক্তির ছায়া পড়তে দেখি নি। এমন স্ত্রীরত্ন যার সে সত্যিই ভাগ্যবান। আমার নিজের জিলার মেয়ে বলে আমারও কেমন গর্ব বোধ হতো, কেমন যেন আত্মীয়তাও বোধ করতাম। অনেক দিন এই ভদ্রমহিলার হাতের তৈরি নারকেলের চিড়ে আর থানকুনির বড়া খেয়ে এসেছি। সুতরাং বিজয়ের কথা ভুলতে পারি না কিছুতেই।

ও-বাড়িতে থাকতে উৎসাহ ছিল অনেক। আমাদের কাগজের শ্রীবৃদ্ধি কিসে হবে তাই চিন্তা করতাম। লেখার প্রসাদগুণ ছাড়াও বিভিন্ন রুচির খোরাকের জন্যে বিভিন্ন বিষয়ের সন্নিবেশে আমাদের কাগজের অবয়ব সাজিয়ে তোলবার দিকে আমাদের ঝোঁক ছিল। সেই সঙ্গে এই বোধও আমাদের ছিল যে, মানুষের রুচিকে যেন আমরা বিকৃত না করি। পাঠক সমাজের মনকে উন্নত স্তরে তুলে ধরবার ভার যে আমাদেরই উপর, এ দায়িত্ববোধকে আমরা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম।

যতদূর মনে পড়ে আমাদের কাগজেই আমরা প্রথম দিনপঞ্জির সন্নিবেশ করি। একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ইত্যাদি তিথির প্রয়োজন অনেকেরই, এদিকে আমাদের খেয়াল ছিল। জোয়ার-ভাঁটার খবরও আমরা দিতাম আর সেই সঙ্গে হাওড়ার পুল কখন খোলা থাকবে, তাও আমরা জানিয়ে দিতাম, কেননা তখন হাওড়ার পুল যা ছিল তা কখন খোলা থাকবে আর কখন জোড়া লাগবে তা জানা না থাকলে হাওড়া স্টেশনগামী বহু লোককে পুলের মুখে হাঁ করে দাঁড়িয়ে চরম দুর্ভোগ ভুগতে হতো। রবিবারের কাগজটার কিছু অংশ সাহিত্য বিষয় দিয়ে ভরিয়ে তোলাতেও ছিল আমাদের আনন্দ। আজকালকার বাংলা কাগজে এসব জিনিস অতি সহজ হয়ে

গেছে। তবু বিবর্তনের গোড়ার ইতিহাসটা স্মরণ করলে পুরানো দিনের স্মৃতির মধ্যে আমাদের প্রবহমানতার আনন্দ পাই।

কবরের সামনে আসার পর থেকে কেবলই মনে হয় কবরের দিকেই বুঝিবা পা বাড়াচ্ছি। কোম্পানীর অবস্থা খারাপ দেখে শরৎ বোস দু'চারটি শাঁসালো লোককে কোম্পানীর মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা করছিলেন। এই সময় রামকৃষ্ণ মিশনের গণেন মহারাজ মিশন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সংসার আশ্রমে প্রবেশ করলেন গণেন বন্দ্যোপাধ্যায় রূপে। অবিশ্যি সন্ন্যাস-আশ্রমে থাকাকালীন তিনি সংসারধর্মই পালন করছিলেন ভালো ভাবে, তবে সেটা ছিল তাঁর প্রচ্ছন্ন। তিনি যখন প্রকট হলেন তখন হাতে তাঁর মোটা টাকা। শরৎ বোস এই টাকাটার সদ্ব্যবহার করবার জন্যে তাঁকে আমন্ত্রণ করে রোটারি মেশিন ইত্যাদি তাঁকে দেখালেনও বটে ; কিন্তু ফল হলো না কিছুই। সাংসারিক পাকা বুদ্ধিতে যিনি অত বড় একটা পরীক্ষায় পাশ করে এসেছেন মিশন থেকে, তিনি পাকা ব্যারিষ্টার শরৎ বোসকে বুঝিয়ে দিলেন যে, আদর্শের বালাই আর তাঁর নেই, এই আদর্শে মাতলে তিনি যে নতুন প্রকাণ্ড মোটর গাড়িটাতে চেপে এসেছেন তা হয়তো তাঁকে অচিরে খোয়াতে হবে।

ইংরেজী ও বাংলা বই অনেক আসতো আমাদের কাগজে সমালোচনার জন্যে। সেগুলির মধ্যে এমন অনেক বইও থাকতো যেগুলি সত্যিই মূল্যবান। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেগুলি থেকে অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি বা সংকলন প্রয়োজন হতে পারতো কিংবা আমরাও কিছু কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারি মনে করে আমরা সেগুলো দিয়ে কিছুদিনের মধ্যে একটা পাঠাগার তৈরি করে ফেলেছিলাম। দেখা গেলো কাগজের অফিসের পক্ষে এটি একটি সম্পদ এবং মনে করেছিলাম উত্তরকালে কাগজের অফিসে একটি বিরাট পাঠাগার তৈরি হবে এবং সেটা যে শুধু আমাদেরই প্রয়োজন মেটাবে তা নয়, তা অনেক গবেষককেও দেবে অনেক খোরাক। যিনি সমালোচনা করতেন বইখানি তাঁর প্রাপ্য হতো বলে পাঠাগারে বই জমাবার জন্যে সমালোচ্য বইখানির উপরন্ত আর এক কপি না দিলে সমালোচনা বার হবে না—এই নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল।

এই সমালোচনার ব্যাপারে দেখেছি খবরের কাগজে যথাযথ সমালোচনা বলতে যা বুঝায় তা প্রায়শই সম্ভব হতো না এবং এখনো যে তা হয় তাও বলা যায় না, কচিৎ কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো দু'একখানি বইয়ের প্রতি যথাযোগ্য সুবিচার করা হতো, বাকি অধিকাংশেরই ভাগ্যে সমালোচনার নামে যা বার হতো, তাকে বলা যেতে পারে পাঁচ আইনের বিচারকের রায়। এর একটা কারণও ছিল। দৈনিক কাগজ চলে বিদ্যুৎগতিতে; এই গতির সঙ্গে পাল্লা রেখে আমাদের মনকেও চালিয়ে দিতে হতো তুরঙ্গম রূপে। হাতের স্বল্প সময়টুকুকে নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে খেলিয়ে চিন্তারাশিকে ঘন করে এনে যে লেখকের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে ধরবো, সে উপায় আমাদের ছিল না কিংবা অতখানি ধৈর্য ধরাও আমাদের পক্ষে কঠিন হতো। আর একটা কথা, অনধিকারীর অধিকারও আমরা পেতাম অনেক সময়। এক একদিন দেখেছি সম্পাদক মশায় আমার হাতে খানদশেক বই ফেলে দিয়ে বললেন —অনেক দিন আটকে আছে মশায়, এগুলোর আজকেই একটা হিল্লে করুন। তার মধ্যে কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, এমনকি হয়তো বিজ্ঞানেরও বই থাকতো। আমার বিদ্যার দৌড় যতদূরই যাক না কেন, আমাকে সে দিনকার মতো সাজতে হতো সর্ববিদ্যাবিশারদ। অনেক সময়ই ভূমিকা বা উপক্রমণিকা এবং শেষের কয়েকখানা পাতা পড়ে নিয়ে চালাকির দ্বারাও যে মহৎ কার্য সাধন করা যায়, তা প্রমাণ করে দিতাম। সাংবাদিক হওয়ার একটা সুবিধা এই যে, মাত্রাজ্ঞানটা হয় টন্‌টনে। একটা বড় বিষয় নিয়েও চলনসই গোছের একটা কিছু দাঁড় করানোর শক্তি সাংবাদিকের আয়ত্তে এসে যায়, একথা অনস্বীকার্য। সাংবাদিক জীবনে অনেক বড় বড় অধ্যাপক ও পণ্ডিত ব্যক্তির লেখা আমাদের কাগজে প্রকাশ করবার সময় দেখেছি তাঁরা বিষয়বস্তুকে অপ্রয়োজনে ভারাক্রান্ত করে তোলেন, বাহুল্য বলে যা আমাদের মনে হতো তা ছাঁটাই করে আসল বস্তুকে অক্ষত রাখবার কৌশলটাকে আমরা আয়ত্ত করেছিলাম বৈকি।

কিন্তু সব উৎসাহ আমাদের স্তিমিত হয়ে আসছিল এই বাড়ীতে আসবার আগে থেকেই। উপেনদার ভিতরে যে আন্তর পুরুষ ধীরে ধীরে সন্দিগ্ধ হয়ে

সকল বিষয়ে অশ্রদ্ধা আরোপ করছিলেন তিনি যেন একটু বেশি মাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি কোন নীতিতেই আর তাঁর আদর্শের মোহ নেই। এই সময় উপেনদা কবি যতীন সেনগুপ্তের কবিতার খুব ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। প্রায়ই তাঁকে এই কবির কবিতা আওড়াতে শোনা যেতো। এই কবির মধ্যে উপেনদা যেন তাঁর অন্তরের সুরের প্রতিধ্বনি পেয়েছিলেন। ইংরাজী ভাষায় যাকে বলে 'Cynic' উপেনদা হয়ে উঠেছিলেন পুরাদস্তুর তাই। ঠিক এই সময়ে গণেন মহারাজকে নিয়ে যে মুখরোচক কেলেঙ্কারি বাজার সরগরম করে তুলেছিল, তাতে উপেনদা তাঁর প্রিয় কবির দু'টি লাইন প্রায়ই আমাদের সামনে আওড়াতেন আর বলে উঠতেন—আঃ! কি লেখাই লিখেছে—

"কে গাবে নূতন গীতা?
কে ঘুচাবে এই সুখ-সন্ন্যাস গেরুয়ার বিলাসিতা?

আমাদের সমাজে 'স্বয়ম্বর' প্রথা কোন্ কালে উঠে গেছে। বিলাতী সমাজে তার কিন্তু রূপান্তর আমরা দেখতে পাই 'কোর্টশিপে'। বিলাতী শিক্ষার মোহে আমরা যে কিছুকাল অতিমাত্রায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম তার ঐতিহাসিক নজির রয়ে গেছে। কোর্টশিপের গুণাগুণ নিয়ে এককালে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চাও হয়েছিল প্রচুর এবং বিচারবুদ্ধির দ্বারা এই প্রথাকে সমাজে গ্রহণ করবার প্রয়োজনও আমরা তখন অনেকে স্বীকার করেছি, এবং ব্রাহ্মযুগে বোধ হয় এর প্রচলনও হয়েছে বেশ। তবু বিলাতী সমাজের কোর্টশিপকে আমরা পুরাদস্তুর অধিগত করতে সঙ্কোচ বোধ করেছি। প্রণয় সংঘটনের ব্যাপারটায় বিলাতী মসলা বর্জন করে আমরা আয়ুর্বেদ মতে কিছুটা দেশী রসের ভাব্না দিয়ে তবে হজম করতে সক্ষম হয়েছিলাম। তবু উঠতি বয়সের ছেলেদের মনে এখনও ঐরূপ ধরনের একটা প্রণয়ের মোহ যে আসে না তা নয়, এই সময় ঐ ধরনের বস্তুটি যাতে সহজলভ্য হয় তার জন্যে যুক্তিটাও অনুকূল করবার পক্ষে চেষ্টা হয় অক্লান্ত। উপেনদা এর ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। মানুষী প্রেমের মধ্যে একটা নিঃস্বার্থ ভাবের আরোপ করাকে তিনি বলতেন মিথ্যাচার। যা

হবার নয় তাকে সত্য বলে প্রচার করবার দুশ্চেষ্টা তাঁর ছিল না। প্রকৃতি-চালিত মানব-সমাজে নর-নারীর প্রেম বলতে আমরা যা বুঝি 'কাম-গন্ধ নাহি তায়' একথা যাঁরা বলবার চেষ্টা করেন তাঁরা মিথ্যা কথাটাকে একটু পালিশ করে দিতে চান। আর যাঁদের মুখ দিয়ে সত্যই কথাটা বার হয়েছে, তাদের সংখ্যা 'লাখে না মিলল এক' এবং এও সত্য যে, তাঁরা মানুষদেহধারী হলেও আসলে দিব্য চেতনার কারবারী। সে রকম দু'একজনের কথা ছেড়ে দিলে বাকি আমরা সব প্রণয় ব্যাপারের যে কারবার করি তা আসলে কিন্তু একটা পারস্পরিক স্বার্থের চুক্তি ছাড়া কিছুই নয়। এই সোজা, সরল কথাটাকে কবিরা অবিশ্যি একটু রসিয়ে নেবার জন্যে চিত্তের ভাবরস সংযোগ করে দিয়েছেন। মাটির রসে যার বৃদ্ধি তাকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলে চলবে কেন ভাই? উপেনদা বলতেন—

"মরণে কে হবে সাথী?
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না
বারোটার বেশি রাতি!"

যুবক-যুবতীর পারস্পরিক সাহচর্যে যে মিলন সংঘটিত হয়, তা কি বাঞ্ছনীয় নয়?

বাঞ্ছনীয় হয়তো ক্ষেত্র বিশেষে হতে পারে; কিন্তু তাই নিয়ে কবিতার ঢুলুঢুলু ভাবে আমরা যদি সেইটাকেই সমাজের সাধারণ রীতি হিসাবে প্রচলন করি তবে তা বাঞ্ছনীয় হবে বলে আমি মনে করি না।—উপেনদার জবাব ছিল এই।

বুঝতাম এ ব্যাপারে উপেনদা সনাতন-পন্থী। কথাটা নিয়ে একটু তলিয়ে দেখতে গেলে উপেনদাকে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হতো না, তবু তাঁকে খানিকটা উস্কিয়ে দিতে পারলে আমরা পেতাম আনন্দ। তাঁর এ বিষয়ে চাঁচা-ছোলা বুলি ছিল এই:

সত্যি কথা বলবো কি ভাই, যুবক-যুবতীর প্রণয়াত্মিক মিলন বলে যে বস্তুটির জন্যে তোমরা লালায়িত আসলে কিন্তু সে বস্তুটি হলো একটি ফাঁকা কল্পনা। তোমাদের মধ্যে কোন যুবক যদি কোন যুবতীর প্রেমে পড়ে থাকো

তবে আমায় বলো ; আমি তা হলে দু'জনকে একটি ঘরে পুরে বাইরে থেকে শিকল এঁটে দেবো। ঐ ঘরেই দু'জনকে করতে হবে নাওয়া-খাওয়া, সারতে হবে প্রাতঃকৃত্যাদি, বাইরে কোথাও যেতে পারবে না। তিন দিনের মতো ঐ ঘরেই আটক, ব্যস্। দেখি বাছাধন! তখন প্রণয় বস্তুটি গলে কোথায় গড়ায়!

একদিন উপেনদার ঐ বাণী শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। সুযোগ পেয়ে বললাম—আচ্ছা উপেনদা, আপনারও তো যৌবন এককালে ছিল, আপনি কি কখনও কোন নারীর প্রেমে পড়েন নি?

—ছিল বৈকি যৌবন এবং প্রেমে কখনো পড়িনি একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে।

উপেনদা অকপটে স্বীকার করলেন যে, তিনি জীবনে দু'টি নারীর প্রেমে পড়েছিলেন। তার মধ্যে প্রথমা যিনি, তিনি ছিলেন বাংলা দেশে আগত কোন বিখ্যাত লাটসাহেবের পত্নী—শ্বেতাঙ্গিনী, সুমধুরহাসিনী, তন্বী তনুদেহধারিণী; সুদীর্ঘ নবনীত পেলব সেই দেহ, আর সেই দেহে ছিল একখানি গ্রীবা—আঃ কি তার গঠন সৌকর্য! উপেনদা বকলেন—চল্‌তি ভাষায় তাকে 'গলা' বললে তার সাংস্কৃতিক মর্যাদাকে ছোট করা হয় বলে তাকে গ্রীবাই বললুম। কম্বুগ্রীব-ট্রিব, কিংবা ঐ ধরনের শব্দ দিয়ে অনেক কবি এই রকম সৌন্দর্যময়ী নারীর রূপ বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছেন বটে, কিন্তু আমার মনে হয় পৃথিবীর কোন কবির কাব্য-শাস্ত্রে এই গ্রীবার তুলনা আমি পাইনি। উর্বশী-তিলোত্তমা-মেনকা-ক্লিওপেট্রা-হেলেন ইত্যাদি সমস্ত সুন্দরী নারীর সৌন্দর্যকে নিংড়ে নিয়ে বিধাতা যদি এই লাট-পত্নীর গ্রীবায় সংযোগ করে দিতেন তথাপি এমনটি দাঁড়াতো কি না বলতে পারি না; কিন্তু আমার মনে হয় এই নারীর গ্রীবা সৃষ্টির সময় বিধাতা এক সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা নিয়ে নেমেছিলেন। একে বর্ণনা দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করা বৃথা, শুধু দেখা আর দেখা আর দেখা—দেখে অন্তরের মধ্যে সেই সৌন্দর্যকে ধরে উপলব্ধি করা আর উপভোগ করা। দোদুল্যমান ঈষৎ লালাভ একটি টোপা খোপার নীচে ঐ গ্রীবার বঙ্কিম ভঙ্গিমা কল্পনার অতীত। ঐ নারী যদি আমার দিকে

পিছন ফিরে থাকতেন আর আমি তাঁর ঐ খোপার নীচেকার দেহাংশটুকুর বঙ্কিম ভঙ্গিমা অনন্তকাল ধরে দেখে যেতুম তবুও আমার তৃপ্তি ম্লান হতো না। এটাকে তোমরা কি প্রেম বলবে বলো। আমার কিন্তু ঐ ভাবের মধ্যে আর কোন ভাবের পীড়া ছিল না, সুতরাং আমার অন্তর পীড়িত হয় নি। আমার অন্তরে যে আর একটি দৃষ্টি আছে তাই দিয়ে যদি এখনো সেই গ্রীবা দেখি তবে একটা শান্ত সৌন্দর্যের মধ্যে আমি ডুবে যাই।

লাট-পত্নীর গ্রীবানুরাগী উপেনদা সত্যিই মিনিটখানেকের জন্যে বোধ করি অন্তরে ডুব দিলেন। সেখানে তাঁর সূক্ষ্মানুভূতি হয়তো নৈঃশব্দ্যে ধ্বনিত হয়ে উঠলো —আঃ!

অতঃপর আবার তিনি বলে গেলেন:

শোন এবার দ্বিতীয়ার কথা। একবার পণ্ডিচেরীর পথে মাদ্রাজে রয়ে গেলুম এক দিন। সেখানে এক বন্ধুর অনুরোধে একটি মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ করতে হয়েছিল। কিছুতেই ছাড়বেন না তিনি। বললেন, এমন অসাধারণ মহিলার সঙ্গে যদি আমি আলাপ করে না যাই তবে কি যে আমি হারাচ্ছি তা নাকি কল্পনাও করতে পারি না। এ রকম তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী নারী নাকি জগতে সুদুর্লভ।

বন্ধুর অনুরোধ এড়াতে না পেরে গেলুম বুদ্ধিশালিনীর কাছে। তিনি যখন আমাদের সামনে আবির্ভূতা হয়ে অভ্যর্থনা করলেন তখন ভয়ে প্রায় আড়ষ্ট হয়ে মনে মনে চীৎকার করে উঠে ডাকলুম—ত্রাহি মাং জগদম্বে। এ কি দেখালে মা!

অস্থিচর্মসার শীর্ণা, কালো, কুৎসিত একটি নারী; মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল ফেঁপে রয়েছে। একখানি পোড়া কাঠের মাথায় যাত্রার দলের ধার-করা চুল বসিয়ে দিলে যেমনটি দেখায় ঠিক তাই। আলাপ করবার সমস্ত উৎসাহ আমার নিমেষে যেন উবে গেল! ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্যে পা দুটোকে আর টেনে তুলতে পারছিলুম না। তবু যখন এসে পড়েছি তখন

আর নিস্তার নেই, কোন রকমে দায় থেকে উদ্ধার হতে হবে, নইলে যে ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

পোড়া কাঠ অতঃপর মুখ খুললেন। বললেন আমাদের তিনি বিশেষ করেই চেনেন তবে সে চেনাটা অশরীরী, চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য এই তাঁর প্রথম। আলাপের ধরনটা অভিনব। প্রথমে কিছুক্ষণ তিনিই তাঁর বক্তব্য বলে যাচ্ছিলেন আর আমি প্রাণের দায়ে হাঁ-হুঁ করে দন্ত বাহির করবার চেষ্টা করছিলুম। আমার আড়ষ্টতা কিছুক্ষণ বাদেই কেটে গেল। কথা বলার এবং কথা আদায় করবার এ অপরূপ ভঙ্গিমা সত্যই নারীর কথা দূরে থাক, পুরুষের মধ্যেও বড় বেশি দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। অকস্মাৎ আমার দেহের অন্তরালের বিদ্রোহী, বিরূপ পুরুষটি যেন সচেতন হয়ে উঠলো। নাঃ, এ নারী তো সাধারণ নারী নয়। ধীরে ধীরে সাহস সংগ্রহ করে আমি আলাপে প্রবৃত্ত হলুম। উঃ ক্ষুরধার বুদ্ধির সে কি চাকচিক্য! বিষয়বস্তুকে সহজে আয়ত্তের মধ্যে এনে ফেলে তার বিভিন্ন দিক উদ্‌ঘাটন করে জলের মতো যুক্তির তারল্যে তাকে গলিয়ে দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। অবাক হয়ে গেলুম এই নারীর মানসিক ঐশ্বর্যে।

প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ধরে ঐ নারীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলুম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। তন্ময় হয়ে গিয়েছিলুম তাঁর বাকচাতুরিতে আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির শরচালনায়। তারপর যখন বাইরে এলুম তখন পা দুটো যন্ত্রচালিতবৎ চলছিল বটে, কিন্তু কে যে চালাচ্ছিল তা জানি না। আমার মন কিন্তু এদিকে উড়ে চলেছিল লঘুপক্ষ হয়ে কোথায় কোন্ সৌন্দর্যপুরীতে যেখানে ঐ নারীর হৃদয়ের অনন্ত বর্ণচ্ছটা দিগদিগন্তে সৃষ্টি করে চলে অনন্ত মোহাবেশ! আমার মনে হয়েছিল এত বড় সুন্দরী নারী পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোথাও নেই।

মহিলাটি আজন্ম কুমারী। তাঁর পরিচয় পেলুম তিনি প্রখ্যাতনামা সরোজিনী নাইডুর সহোদরা—নাম মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়। শ্যামা পাবলিশিং হাউস তিনি চালাতেন, সেখান থেকে অনেক ভালো ভালো বই প্রকাশিত হতো।

এত কুৎসিত রমণী অথচ এত বড় সৌন্দর্যের আধার পৃথিবীতে বিরল। সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমার ধারণা ভাই, সেই দিন থেকে বদলে গেছে।

তখনকার দিনে তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ করে 'কল্লোল' চক্রের লেখকদের অনেকেই আসতেন আমাদের এখানে, একথা আগেই বলেছি। তাঁদের আত্মপ্রচার উদ্দেশ্যে কিংবা কোন বিশেষ একটা মতলব সাধনের মানসে যে তাঁরা আসতেন, তা নয়। তাঁদেরও আমাদের সম্পর্কটা হয়ে উঠেছিল হৃদয়ের। বোধ করি এটা অত্যধিক নিবিড় হয়েছিল তার একটা প্রধান কারণ হলো বয়সের সমতা; আর দ্বিতীয়ত তাঁদেরই এক জন সহধর্মী ছিল আমাদের সহকর্মী। কিছুক্ষণের জন্যে আমাদের বৈকালিক বৈঠকটা সঞ্জীবিত হয়ে উঠতো তাঁদের কল-কল্লোল ধ্বনিতে। নির্মল, স্বচ্ছ রসের বন্যা বয়ে যেতো; এর উৎস ছিল উভয় তরফের হৃদয়ের ক্ষেত্রে।

খ্যাতনামা, বয়স্ক সাহিতিক যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে দেখেছি ডাঃ দীনেশ সেন ও শরৎ চাটুজ্যেকে; ডাঃ দীনেশ সেনের মাথায় ছিল আধাবাবরী ধরনের শুষ্ক, রুক্ষ একরাশ চুল, তাতে কোনদিন তেল পড়তো বলে মনে হতো না। গায়ে থাকতো লর্ড ক্লাইভের আমলকার ধরনের আজানুলম্বিত মোটা একটি কোট; পায়ে মোজা এবং গলায় গরম কম্ফর্টার জড়ানো—সে কিবা গ্রীষ্ম আর কিবা শীত। সে এক অদ্ভুত বেশ, ছয় ঋতুকে গুঁড়িয়ে কেন যে তিনি একটা ঋতুতে এনে দাঁড় করিয়েছিলেন তার কারণ জানতে পারি নি কোন দিন। কোন কোন দিন আসতেন একটি নাতিকে সঙ্গে নিয়ে—যেন বরের পাশে কোল-বর। বাংলা সাহিত্যের গবেষণা বিভাগে প্রেমেন মিত্র ছিল তাঁর সহকারী—সরকারী হিসাবে নয়, বে-সরকারী। প্রেমেনের এ কাজটা ছিল নিছক বৃত্তিগত, চিত্তের যোগ তাতে ছিল না বড় বেশি। তবু প্রেমেনের প্রতিভা তার মধ্যেও প্রকাশ পেতো; ডাঃ সেন তাই প্রেমেনের প্রতি ছিলেন আকৃষ্ট। আমাদের এখানে তাঁর শুভাগমনের হেতুর মধ্যে বোধ হয় এটাও একটি।

শরৎ চাটুজ্যে আসতেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর মমত্ব বোধের দরুণ। সাহিত্যের আসর থেকে টেনে এনে তাঁকে রাজনীতি-ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর স্বরাজ দল গঠনের সময়। দেশবন্ধুর অসাধ্য কাজ ছিল না। তিনি সে সময় অনেককেই এক ঘাটে জল খাইয়েছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন কিছুকালের জন্য কলম ছেড়ে খদ্দরধারী হয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানের সভা-সমিতিতে ঘুরছিলেন। দেশবন্ধুকে যেমন তিনি শ্রদ্ধা করতেন তেমনি স্নেহ করতেন সুভাষচন্দ্রকে। তাঁদের উভয়ের কাছে তিনি আশা করেছিলেন বাংলার স্বকীয়তার উদ্বোধন ও রক্ষণ। বাংলা দেশের কোন বিখ্যাত নেতা কিন্তু সে সময় দেশবন্ধুর বিরোধী হয়েছিলেন; যদিও তাঁর কণ্ঠ ও লেখনী অগ্নিবর্ষী হতে পারেনি তখন, তথাপি দেশবন্ধুর কাজে তা বাধাস্বরূপ বলে মনে হয়েছিল। উক্ত বিখ্যাত নেতা তাঁর মুষ্টিমেয় কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে পরিচিত হয়েছিলেন 'নো-চেঞ্জার' অর্থাৎ অচলায়তন বলে। গান্ধী প্রদর্শিত পথ ছাড়া নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে—এই ছিল তাঁদের ধারণা।

দেশবন্ধুর কর্মপন্থার সমালোচনা করতে গিয়ে উক্ত নেতা বোধ হয় শরৎচন্দ্রের প্রতিও কি একটা কটূক্তি করেছিলেন একবার। তাতে শরৎচন্দ্র হয়েছিলেন ভীষণ ক্রুদ্ধ, রাগ আর তাঁর পড়ে না কিছুতেই।

সেবার পূর্ববঙ্গে একটা সভার অধিবেশনের পর শরৎচন্দ্র তাঁর নির্দিষ্ট আবাসে ঘন ঘন পায়চারি করছিলেন; তাঁর মন অস্থির, চিত্ত চঞ্চল; তাঁর প্রতি উক্ত নেতার সেই উক্তিটা তাঁকে বিক্ষুব্ধ করেছিল।

অদূরেই ছিলেন হেমন্ত সরকার। শরৎচন্দ্র তাঁকে কাছে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—হেমন্ত, খুন করবো অথচ আইনের কবলে পড়বো না, এমন পন্থা বাত্‌লাতে পারো?

—কি রকম?

—এই ধরো অমুককে আমি খুন করতে চাই অথচ আমাকে কেউ ফাঁসিতে লট্‌কাতে পারবে না।

হেমন্ত সরকার হেসে উঠলেন। বল্‌লেন—দাদা, উপন্যাসে হয়তো

সম্ভব হতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগতে তা কি করে সম্ভব তা তো বলতে পারি না।

—ও কিরণ! কিরণ! শরৎচন্দ্র কিরণশঙ্কর রায়কে ডাকছিলেন। তিনিও ছিলেন কাছেই। অতঃপর তাঁকেই তিনি বললেন—তুমি তো ভাই, ব্যারিস্টারি পাশ করেছিলে শুনেছি। বলতে পারো খুন করে রেহাই পাওয়া যায় কি করে?

কিরণশঙ্করও অবাক হয়ে গেলেন এই প্রশ্নে। রসিক বলে তাঁর খ্যাতি থাকলেও শরৎচন্দ্রের এই বদ-রসিকতায় তিনি তাঁর প্রতিভা দেখাতে পারলেন না আদৌ।

শরৎচন্দ্র বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—দূয়ো! তুমি ব্যারিস্টারি পাশই করেছো, প্র্যাক্‌টিস্ করো নি কোন দিন—একথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম।

অতঃপর শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর শরণ নিলেন। ভীষণ আক্রোশের একটা কৃত্রিম চাঞ্চল্য প্রকাশ করে দেশবন্ধুকে বললেন,—দাশ সাহেব, আপনি তো পাকা ব্যারিস্টার। আচ্ছা, আপনাদের শাস্ত্রে এমন কিছু আছে যাতে খুন করলেও খুনী আইনের কবলে পড়ে না?

দাশ সাহেবও হতভম্ব হয়ে গেলেন। খুনী যে, সে খুনের দায়ে পড়বেই, তবে খুনী বলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে খুন করেনি এটা অবিশ্যি তিনি যদি তাঁর ব্যারিষ্টারী বুদ্ধির দ্বারা প্রমাণ করতে পারেন তা হলেই খুনীকে বাঁচাবার একটা পন্থা হতে পারে, নতুবা প্রত্যক্ষ খুনের দায় থেকে তিনি কি করে খুনীকে রক্ষা করতে পারেন তা তাঁর সর্বশাস্ত্র মন্থন করলেও তো মিলবে না।

শরৎচন্দ্র অতঃপর তাঁর নিজ প্রতিভা প্রকাশ করলেন—দাশ সাহেব! বৃথাই ব্যারিস্টারি করলেন এত দিন! ধরুন, অমুকের (মানে ঐ অচলায়তনের) ঘাড়টা যদি আমি মট্‌কে একটা ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিই, তবে লোকে ওটাকে দাঁড়কাক ছাড়া আর কিছু মনে করবে কি? আর, দাঁড়কাক মারলে কেউ খুনের দায়ে পড়ে?—বলুন তো মশায়!

শরৎচন্দ্র গম্ভীর। দাশসাহেব হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন—তাঁর সঙ্গে আর সবাই। শরৎচন্দ্রের রসিকতা যাঁরা শোনেন নি বা তার ধরনটা দেখেন নি, তাঁরা সে রস থেকে বঞ্চিত। বিক্ষোভের উত্তাপ এম্‌নি করে রসে গলিয়ে দেওয়া ছিল তাঁর স্বধর্ম।

মনে আছে শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁকে প্রথম জনসভায় সম্বর্ধিত করবার বিরাট আয়োজন হয়েছিল ঘটনাচক্রে আমাদের তরফ থেকেই। পরিকল্পনাটা প্রথম এসেছিল 'কল্লোল'-চক্রের সাহিত্যিকদের মাথায়। কিন্তু তাঁরা দেখলেন তাঁদের দলের একক চেষ্টায় এই বিরাট আয়োজন সম্ভব নয়। বিশেষ করে প্রয়োজন এর জন্যে সংবাদপত্রের সহযোগিতা। ফরওয়ার্ড প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আত্মিক যোগের কথা কলোল-চক্রের অজানা ছিল না, তাই স্বভাবতই এই প্রতিষ্ঠানের কথা তাঁদের মনে পড়েছিল।

সেদিন ছিল রবিবার। ইংরেজী দৈনিকে সেদিন কোন কাজ নেই। আমাদের বাংলা বিভাগ খোলা ছিল। কল্লোল-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ তাঁর প্রস্তাব নিয়ে এলেন। আমাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা যে এ উদ্যোগে থাকবে, এটা বলাই বাহুল্য। অতঃপর এলবার্ট হলে নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সভাপতিত্বে যে সভা হলো, তাতে সম্বর্ধনা-সমিতি গঠিত হয়ে গেলো। প্রমথ চৌধুরী সভাপতি; আমাদের 'বাংলার কথা'-সম্পাদক গোপাল সান্যাল সম্পাদক; কল্লোল-সম্পাদক দীনেশ দাশ এবং বাতায়ন-সম্পাদক অবিনাশ ঘোষাল যুগ্ম সহ-সম্পাদক আর ইন্দ্র বিদ কোষাধ্যক্ষ। সম্বধনা সমিতির উল্লেখযোগ্য সভ্যদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আর কিরণশঙ্কর রায়।

চারিদিকে সেবার সাড়া পড়ে গেলো। একটি প্রভাবশালী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের প্রচারমূল্য তখন অনেক। প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতিও সেবার শরৎচন্দ্রকে সম্বর্ধনা করবার আয়োজন করেছিলেন। তাছাড়া ছোট ছোট আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শরৎ-প্রীতি সেবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু যাঁকে সম্বর্ধনা করার অয়োজন হয়েছিল ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে,

যথাকালে সেই বরেণ্য ব্যক্তিকে আর পাওয়া যাচ্ছিল না। সকলের মনে উদ্বেগ আর আশঙ্কা। কথা ছিল সকালের দিকে তিনি কলকাতায় হাজির হবেন। প্রথমে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের সভায় যোগ দিয়ে তারপর আসবেন আমাদের এখানে অর্থাৎ ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হলে। এইখানকার সভাটাই বিরাট। ছোট-ছোট আর সব প্রতিষ্ঠান আমাদের এখানেই মিলে গিয়েছিল। কিন্তু বেলা দশটার সময়ও যে তাঁর কোন খোঁজ নেই!

'কালি-কলম'-সম্পাদক মুরলীধর বসু ছুটলেন হাওড়া স্টেশনের দিকে। প্রয়োজন হলে হয়তো তাঁকে ছুটতে হবে 'সামতা-বেড়' লক্ষ্য করে রূপনারায়ণের তীরে। শরৎচন্দ্রের বাড়ি তখন সেইখানেই, কলকাতায় তখনো তাঁর বাড়ি হয়নি।

বেলা এগারোটার সময় নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ফোন করে জানালেন, শরৎচন্দ্র হাজির হয়েছেন এবং তাঁরই কাছে আছেন। বাঁচা গেলো, একটা দুর্ভাবনা গেলো!

ইন্‌স্টিটিউট হলটি লোকে লোকারণ্য। ভিতরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় বাইরের রাস্তায় উৎসুক জনতা চেয়েছিল এই দিকে। লাউড স্পীকারের প্রচলন হয়নি তখন এখনকার মতো। সুতরাং শ্রুতিসুখকর কোন কিছুর আশা ছিল না এই জনতার। তবু যদি এই বিশেষ দিনের বিশেষ আয়োজনের ক্ষেত্রে এই বিশিষ্ট অতিথিকে একবার চোখে দেখা যায়।

শরৎচন্দ্র যখন হাজির হলেন তখন বেলা দুটো গড়িয়ে গেছে। হলে প্রবেশের মুখে শরৎচন্দ্রের পিছনে প্রথমেই নজরে পড়লো এক জোড়া গোঁফ। রাধামাধব! ওযে আমাদের নরেনদা—কবি নরেন্দ্র দেব। ছবির ব্যাক-গ্রাউণ্ডটি ছিল ভালো। আশে-পাশে ছিলেন সুবোধ রায়, মুরলীধর আর বেহালার মণি রায়। শরৎ-ভক্ত মণি রায়ের মোটরখানা সেবার কাজে লেগেছিল খুব।

শরৎচন্দ্র আসন গ্রহণ করলেন। কোকিল-কণ্ঠ দিলীপ রায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো—

> কোন্ শরতে পূর্ণিমা চাঁদ আসিলে এ ধরাতল।
> কে মথিল তব তরে কোন্ সে ব্যথার সিন্ধুজল॥

দুয়ার-ভাঙা জাগল জোয়ার ঐ বেদনার দরিয়ায়।
আজ ভারতী অশ্রুমতী মধ্যে দুলে টলমল ॥
কখন তোমার বাজল বেণু প্রাণের বংশী বট-ছায়।
মরা গাঙের ভাঙা ঘাটে ঘট ভরে গোপিনী দল ॥
বিদ্যুতের বাঁকা হাসি হাসিয়া কালো মেঘে।
আসিলে কে অভিমানী বহায়ে মরুতে ঢল ॥
লয়ে হাতে জিয়ন-কাঠি আসিলে কে রূপকুমার।
উঠল জেগে রূপকুমারী আঁধারে ঐ ঝলমল ॥
আকাশে চকোরী কাঁদে তড়াগে চাহে কুমুদ।
ঝরুক আঁখির শেফালিকা ছুঁয়ে তব পদতল ॥

গানটির রচয়িতা কবি নজরুল ইসলাম স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তখনকার দিনের যুবসমাজে নজরুল ও দিলীপকুমারের জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ।

কথাকে সুরের তরঙ্গে খেলিয়ে একটা অনবদ্য চিত্র শ্রোতার মনের পর্দায় এঁকে দিবার অতুলনীয় ক্ষমতা ছিল দিলীপকুমারের। বেশ মনে পড়ে সুরকার দিলীপকুমার সেদিনকার সভায় যে শিল্পীর স্তবগান করলেন, তিনি যেন কোন্ দূর অলকাপুরী থেকে নেমে এসেছেন ধরায় অতিথি হয়ে; তাঁরই সঙ্গে ঝরে পড়েছে সেই অলকাপুরীরই সুরের নির্ঝর।

ইন্‌স্টিটিউটের বিরাট হলটির উপরে, নীচে, আশে-পাশে সর্বত্র সমবেত জনতা স্তব্ধ, নিশ্চল। সকলের একাগ্র দৃষ্টি এবার পড়েছে সম্মানীয় অতিথির দিকে—যে অতিথি বাঙালী সমাজের হৃদয় জয় করে নিয়েছেন স্বল্পকাল মধ্যে, অতি সহজে।

একটি শান্ত, স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে। এইবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী পাঠ করা হবে। রবীন্দ্রনাথ এই সভায় স্বয়ং উপস্থিত থেকে সভাকে গৌরবোজ্জ্বল করতে পারবেন না, এটা আশঙ্কা হয়েছিল আগেই। যাই হোক, আমাদের উৎসবের দু'দিন আগে তাঁর আশীর্বাণী পৌঁছেছিল প্রমথ চৌধুরীর কাছে।

অতি নিরীহ, শান্ত প্রকৃতির লোক প্রমথ চৌধুরী। তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ শুনলে মনে হতো না জীবনে কখনো কোন চাঞ্চল্য তাঁর প্রকাশ পেয়েছে। পকেট থেকে কবিগুরুর লেখাটুকু বার করতে তাঁর বিলম্ব হচ্ছিল, হয়তো তাঁর সঙ্কোচ ছিল এই বিরাট জনতাকে কি করে শুনাবেন কবির বাণী তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠে। এই দ্বিধা-সঙ্কোচ লক্ষ্য করে ছুটে এলেন কবি যতীন বাগচী, আমাদের বর্তুলাকার গিরিজাদা (কবি গিরিজাকুমার বসু) আর ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত, ডি-এল। কবির আশীর্বাণী নিয়ে সে প্রায় 'ডুয়েল' বললেও চলে। কারণ তখন—

ধরি নট-ঠাট কে করিবে পাঠ
তারি লাগি কাড়াকাড়ি।

'বীরবল' নামধেয় ব্যক্তিটির মসী চালনা থেকে যাঁরা তাঁর অসি চালনা সম্বন্ধে একটা মস্ত ধারণা পোষণ করতেন তাঁদের সে ধারণা দূর হয়ে গেলো। বীরবলের বীরত্ব দূরে থাক, বলই ছিল না গায়ে। কবিগুরুর আশীর্বাণী নিয়ে যখন কাড়াকাড়ি চলছিল হীনবল বীরবল তখন হতবাক হয়েছিলেন। দীর্ঘবাহু ডাঃ নরেশ সেনগুপ্তের জয় হলো। সুউচ্চ গম্ভীর কণ্ঠে তিনি পাঠ শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী—

"শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মাননা সভায় বাংলা দেশের সকল পাঠকের অভিনন্দনের সঙ্গে আমার অভিনন্দন বাক্যকে আমি সম্মিলিত করি। আজও সশরীরে পৃথিবীতে আছি, সেটাতে সময় লঙ্ঘনের অপরাধ প্রত্যহই প্রবল হচ্ছে, সে কথা স্মরণ করবার নানা উপলক্ষ সর্বদাই ঘটে, আজ সভায় সশরীরে উপস্থিত থেকে সকলের আনন্দে যোগদান করতে পারলুম না, এও তারি মধ্যে একটা। বস্তুত আমি আজ অতীতের প্রান্তে এসে উত্তীর্ণ —এখানকার প্রদোষান্ধকার থেকে ক্ষীণ কর প্রসারিত করে তাঁকে আমার আশীর্বাদ দিতে যাই, যিনি বর্তমান বাংলা সাহিত্যের উদয়-শিখরে আপন প্রতিভা-জ্যোতি বিকীর্ণ করলেন। ইতি—২৯শে ভাদ্র, ১৩৩৫।"

বলা বাহুল্য, অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির স্বরচিত সম্বর্ধনা অতঃপর তাঁর পক্ষে পাঠ করা কল্পনাতীত। সেটাও পঠিত হলো বকলমে।

তারপর পাঠ করা হলো সর্বসাধারণের তরফ থেকে রচিত অভিনন্দন পত্র। রচনা করেছিলেন স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রূপার পাতে খোদাই করা হয়েছিল মীনে-করা নীল অক্ষরগুলি—

"শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

হে বন্ধু, তোমার ত্রি-পঞ্চাশৎ জন্মদিনে আমরা—তোমার গুণমুগ্ধ দেশবাসী—তোমাকে অভিনন্দিত করিতেছি। বাঙালীর দুঃখ-দৈন্যভরা জীবন তুমি মধুময় করিয়া তুলিয়াছ; আমাদের হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভয়-ভাবনা আজ তোমার গুণে অমর। শিল্পী তুমি, তোমাকে নমস্কার করি।

যে-প্রেম নর-নারীর তুচ্ছ জীবনকে মহিমান্বিত করে, মর্তে স্বর্গ সৃজন করে, কলঙ্ককে চন্দনসম জ্ঞান করে, যে প্রেম মৃত্যুকেও অতিক্রম করে—হে কবি, তুমি সেই সর্বহারা প্রেমের জয়গান করিয়াছ। প্রেমিক তুমি, তোমাকে নমস্কার।

আত্ম-ভোলা অস্থির সন্তান খেলার শেষে যেমন ছুটিয়া আসিয়া জোর করিয়া মায়ের কোল দখল করে, বঙ্গবাণীর আদরের ধন তুমি, তেমনি করিয়া প্রবাসের খেলা শেষে আজ শ্যামা জননীর কোল অলঙ্কৃত করিয়াছে। তুমি আয়ুষ্মান হও, তোমার লেখনী জয়যুক্ত হউক।—আজ তোমার স্বদেশবাসীর ইহাই কামনা। ইতি—রবিবার, ৩১শে ভাদ্র, ১৩৩৫।"

এই অভিনন্দন-পত্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রকে উপহার দেওয়া হয়েছিল একটি সোনার ফাউন্টেন পেন, গরদের জোড় আর একটি সুন্দর রূপার গড়গড়া।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের অভিনন্দন পত্রগুলিও তাঁকে দেওয়া হলো। পড়তে গেলে সময় লাগতো। আর বেশি সময় ব্যয় করা ঠিক নয়। শরৎচন্দ্রের দিকে তখন সবাই চেয়ে আছে, তাঁর ভাষণ শুনবার জন্যে। তা ছাড়া অতক্ষণ ধূমপানে বিরত থাকা যে শরৎচন্দ্রের পক্ষে কী মারাত্মক ব্যাপার তা কেবল তিনিই অনুভব করতে পারছিলেন। ভাষণ পাঠের দায়িত্বটুকু কোন রকমে সেরে দিতে পারলে যেন তিনি বাঁচেন। বিরাট সভায় সম্মাননায় অনভ্যস্ত, ভীত, লাজুক শরৎচন্দ্রের সে কি যে অস্বস্তি! উৎসবটা শেষ হলে যেন তিনি

হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। বিজয়লাল প্রভৃতি আমরা কয়েকজন ছোট ছোট কবিতায় শরৎ-বন্দনা করেছিলাম। লিখে ফেলেছিলাম অলক্ষ্যে, কিন্তু তা এই বিরাট জনতার সমক্ষে পাঠ করতে হবে, এ আমি কল্পনাও করি নি। অপরের কথা জানি না, আমি দাঁড়িয়ে উঠলে যে একটা কেলেঙ্কারি করে ফেলতাম তা নিশ্চয়। পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতো আর হাতের কাগজখানি মাটিতে হয়তো লুটাতো। পড়তে হবে না জেনে আমার দ্রুত হৃদকম্প দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় এসে গেলো। মনে মনে বললাম—আঃ! বাঁচালে মধুসূদন।

উৎসুক জনতার মনে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় আনন্দ সঞ্চার করে শরৎচন্দ্র এইবার দাঁড়িয়ে উঠলেন। বেশভূষায় পারিপাট্যহীন শরৎচন্দ্রের গায়ে ছিল একটা সাদা খদ্দরের 'চাইনা' কোট। তাঁর ক্ষুদ্র অভিভাষণটুকুর প্রাঞ্জলতা অননুকরণীয়। ধীরে সেটুকু পাঠ করার সময় জনতার দিকে চাহনি তাঁর খুব কমই নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র বক্তা নন, শিল্পী; শিল্পীর অনবদ্য ভাষা তাঁর ভাবকে ফুটিয়ে তুলেছিল সহজে। সাহিত্যের বিচারে তাঁর বক্তব্য যে সত্যকে প্রকাশ করেছে তা কালবিশেষের সীমাবদ্ধ আংশিক সত্য নয় তা চিরকালের। বলেছিলেন তিনি—

"এই যে অনুরাগ, এই যে আমার জন্মতিথিকে উপলক্ষ করে আনন্দ প্রকাশের আয়োজন, আমি জানি এ আমার ব্যক্তিকে নয়। দরিদ্র গৃহে আমার জন্ম, এই তো সে দিনও দূর প্রবাসে তুচ্ছ কাজে জীবিকা অর্জনেই ব্যাপৃত ছিলাম, সেদিন পরিচয়ের আমার কোন সঞ্চয়ই ছিল না। তাই তো বুঝতে আজ বাকি নেই—এ শ্রদ্ধা নিবেদন কোন বিত্তকে নয়, বিদ্যাকে নয়, উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোন অতীত দিনের গৌরবকে নয়, এ শুধু আমাকে অবলম্বন করে সাহিত্য-লক্ষ্মীর পদতলে ভক্ত মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদন।

সাহিত্যের দিক দিয়ে এ মর্যাদার যোগ্যতা কি আমি সত্যই অর্জন করেছি? কিছুই করি নি একথা আমি বলব না। কারণ, এত বড় অতি বিনয়ের অত্যুক্তি দিয়ে উপহাস করতে আমি নিজেকেও চাই নে, আপনাদেরও না। কিছু আমি করেছি। বন্ধুরা বলবেন, শুধু কিছু নয়,

অনেক কিছু, তুমি অনেক করেছ ; কিন্তু তাঁদের দলভুক্ত যাঁরা নন, তাঁরা হয়ত একটু হেসে বলবেন, অনেক নয়—তবে সামান্য কিছু করেছেন। এইটিই সত্য এবং আমরাও তাই মানি। কিন্তু তাও বলি যে সে সামান্যের উর্ধ্বস্থ বুদ্বুদ্ আর অধঃস্থ আবর্জনা বাদ দিলে অবশিষ্ট যা থাকে কালের বিচারালয়ে তার মূল্য লোভের বস্তু নয়।

এ যাঁরা বলেন আমি তাঁদের প্রতিবাদ করি নে। কারণ তাঁদের কথা যে সত্য নয় তা কোন মতেই জোর করে বলা চলে না। কিন্তু এর জন্যে আমার দুশ্চিন্তাও নেই। যে কাল আজও আসে নি, সেই অনাগত ভবিষ্যতে আমার লেখার মূল্য থাকবে, কি থাকবে না সে আমার বর্তমানের সত্যোপলব্ধির সঙ্গে এক হয়ে মিলতে না পারে, পথ তাকে তো ছাড়তেই হবে। তার আয়ুষ্কাল যদি শেষ হয়েই যায়, সে শুধু এই জন্যেই যাবে যে আরও বৃহৎ, আরও সুন্দর, আরও পরিপূর্ণ সাহিত্যের সৃষ্টিকার্যে তার কঙ্কালের প্রয়োজন হয়েছে। ক্ষোভ না করে বরঞ্চ এই প্রার্থনাই জানাবো, আমার দেশে আমার ভাষায় এত বড় সাহিত্যই জন্মলাভ করুক, যার তুলনায় আমার লেখা যেন একদিন অকিঞ্চিৎকর হয়েই যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আমার সর্বদাই মনে হয়। হঠাৎ শুনলে মনে ঘা লাগে তথাপি একথা সত্য বলেই বিশ্বাস করি যে, কোন দেশের কোন সাহিত্য কখনো নিত্যকালের হয়ে থাকে না। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মত এরও জন্ম আছে,পরিণতি আছে, বিনাশের ক্ষণ আছে। মানুষের মন ছাড়া তো সাহিত্যের দাঁড়াবার জায়গা নেই, মানব-চিত্তেই তো তার আশ্রয়, তার সকল ঐশ্বর্য বিকশিত হয়ে উঠে। সেই মানব-চিত্তই যে এক স্থানে নিশ্চল হয়ে থাকতে পারে না। তার পরিবর্তন আছে, বিবর্তন আছে,—তার রসবোধ ও সৌন্দর্য বিচারের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই এক যুগে যে মূল্য মানুষ খুশি হয়ে দেয়, আর এক যুগে তার অর্ধেক দাম দিতেও তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না।

ছেলে বেলায় আমার ভবানী পাঠক ও হরিদাসের গুপ্তকথাই ছিল একমাত্র সম্বল। তখন কত রস, কত আনন্দই যে এই দুইখানি বই থেকে

উপভোগ করেছি তার সীমা নেই। অথচ আজ সে আমার কাছে নীরস। কিন্তু এ গ্রন্থের অপরাধ, কি আমার বৃদ্ধত্বের অপরাধ তা বলা কঠিন! অথচ এমনি পরিহাস, এমনই জগতের বদ্ধমূল সংস্কার যে, কাব্য-উপন্যাসের ভাল-মন্দ বিচারের শেষ ভার গিয়ে পড়ে বৃদ্ধদের পরেই।

সৃষ্টির কালটাই হলো যৌবন কাল—কি প্রজা সৃষ্টির দিক দিয়ে, কি সাহিত্য সৃষ্টির দিক দিয়ে, এই বয়স অতিক্রম করে মানুষের দূঢ়তর দৃষ্টি হয়তো ভীষণতর হয়, কিন্তু কাছের দৃষ্টি তেমনি ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। প্রবীণতার পাকা বুদ্ধি দিয়ে তখন নীতিপূর্ণ কল্যাণকর বই লেখা চলে, কিন্তু আত্ম-ভোলা যৌবনের প্রস্রবণ বেয়ে যে রসের বস্তু ঝরে পড়ে তার উৎসমুখ রুদ্ধ হয়ে যায়। আজ ৫৩ বছরে পা দিয়ে আমার এই কথাটাই আপনাদের কাছে জানাতে চাই।"

বক্তব্য শেষ করে শরৎচন্দ্র মুরলীধর, দীনেশ দাশ প্রভৃতির দিকে করুণ ভাবে চাইছিলেন। তাঁর বহুক্ষণ ধূমপানে বিরত থাকার অবস্থাটা তাঁর ভক্তবৃন্দের বুঝতে বাকি রইলো না। যে স্থানে তিনি বসেছিলেন সেটা রঙ্গমঞ্চই বলা চলে। একটু আড়ালে গেলেই যেন 'গ্রীনরুম' পাওয়া যায়। কয়েক মিনিটের জন্যে ছাড়া পেয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর নেশার পর্ব শেষ করে এলেন। দিলীপকুমারের কণ্ঠে আবার ধ্বনিত হলো—

"তুমি যে মধুকর কমল-বনে
আহরি আন মধু আপন মনে,
গোপন বেদনার অমিয় রাশি
কর তা সবাকার পরম আপনার
অমর কর সেই চরম ধনে।"

ইত্যাদি—

কীর্তনের সুরে মধুর স্তুতিগান। আর মধুরতর লেগেছিল এই গানের আখর—

"ওগো মধুকর
কমল-বনের মধুকর

ওগো কমল দুলাল সব ত্যজি তুমি
বেদন-কমল মধুকর।"
ইত্যাদি—

রচনা করেছিলেন নিরুপমা দেবী। প্রখ্যাতা উপন্যাস লেখিকা নিরুপমা দেবী নন, ইনি কবি নিরুপমা। রাণী নিরুপমা দেবী নাম্নী যে মহিলা কবিতা লিখতেন ইনি সেই নিরুপমা। কোচবিহার রাজপরিবারের বধূ হিসাবে ইনি রাণী বলে পরিচিতা ছিলেন। কিন্তু আমরা যখন তাঁকে শরৎ-সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত দেখলাম তখন আর তিনি রাণী নন, শুধু বাণীর উপাসিকা, রাজ-পরিবার ত্যাগ করে সাধারণ পরিবারে নেমে এসেছেন। তবু রাণীর ন্যায় রূপের ঐশ্বর্য তাঁর ছিল। কাজলকালো চোখ দুটো ছিল যেন 'পরশয়ে শ্রুতি' আর সে চোখে ছিল মদিরতার চেয়ে অগ্নিশিখার আভা।

সেদিন শরৎচন্দ্র বিদায় নিলেও আসর ভাঙেনি অনেকক্ষণ। দিলীপকুমারের কণ্ঠে নজরুল রচিত বাংলা গজল গান শুনেছিলাম সেইদিনই প্রথম।

এরপর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত শরৎচন্দ্রকে দেখেছি কয়েকবার আমাদের অফিসে। খদ্দর-বেশী কথাশিল্পীর রাজনৈতিক আলোচনা চলতো সুভাষচন্দ্র বা সত্য বক্সীর সঙ্গে পরিহাসের পথ ধরে! তখন বোধ হয় তিনি হাওড়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। বলতেন, সুভাষটা তাঁকে সাক্ষীগোপাল করে কেন যে বসিয়ে রেখেছেন তিনিই জানেন; যা কিছু করেন হরেন ঘোষ, তিনি চলেন বকলমে। শরৎচন্দ্রের সহকর্মী হরেন ঘোষ ছিলেন অক্লান্ত কর্মী, এমন ফলাকাঙ্ক্ষাহীন শান্ত কর্মী খুব কমই দেখেছি।

শেষ বার শরৎচন্দ্রকে ফরওয়ার্ড অফিসে দেখেছিলাম যখন তাঁর "শেষপ্রশ্ন" উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয়েছে সেই সময়। একদিন সত্য বক্সীকে সঙ্গে করে তাঁর ঘর থেকে বার হয়ে আমাদের ঘরে ঢুকে হঠাৎ বললেন—ওহে শেষপ্রশ্নটা এত খেটেখুটে লিখলাম, লোকে তেমন নিতে পারলে না।

তাঁর সেদিন আলুথালু বেশ। মুখে ক্ষুণ্ণতার ছাপ। পাঠকসমাজে রসগ্রাহী মনের সাড়া না পেয়ে তাঁর চিত্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। কোথাও কোথাও শেষপ্রশ্ন সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনাও করা হয়েছিল তখন।

কারো কারো মুখে এমনও শুনেছিলাম যে, রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার লাবণ্যকে টেক্কা দিবার জন্যে শরৎচন্দ্র শেষপ্রশ্নে কমলকে সৃষ্টি করেছিলেন আর তাঁর এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য তিনিও যে রবীন্দ্রনাথের মতো 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল' হতে পারেন তা দেখানো! কথাটার মধ্যে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি থাকলেও একথা ঠিক যে শরৎচন্দ্র ছিলেন আসলে হৃদয়ের কারবারী, তাই আমরা তাঁকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলাম; হৃদয় ছেড়ে যখন তিনি মাথায় উঠেছিলেন তখন যেন আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, আর তাঁকে খুঁজে পাইনি। হৃদয়ের মাধুর্য-রসে বুদ্ধির কাঠিন্য মিশিয়ে নিতে আমাদের মন সরেনি, শরৎচন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সূর্যের খরতাপ যেন খাপ খায় না। কমলের মোটর চলেছে উদ্দাম বিদ্যুৎগতি। কোথায়? প্রশ্নটা সেইখানে। কিন্তু এ প্রশ্নের কি শেষ আছে? মানুষের বিচিত্র মনের বিচিত্র প্রশ্নের অন্ত কোথায়? মনের গতি যেখানে রুদ্ধ, মন যেখানে হয়ে এসেছে স্থির, শান্ত সেখানে তো প্রশ্নের কোন অবকাশই নেই। সেই প্রশান্ত নিশ্চলতার মধ্যে কি কমল ডুব দিয়ে এক অনির্বচনীয়তার ইঙ্গিত দিতে পেরেছে না সে কেবলই ছুটে চলেছে উদ্দাম, উত্তাল? এ প্রশ্ন আবার ঘুরে ঘুরে আসে?

পাঠকদের সংশয় শরৎচন্দ্রকে পীড়িত, সংক্ষুব্ধ করেছিল।

অধ্যাপক যাঁরা আসতেন আমাদের এখানে তাঁদের মধ্যে দু'জনকে মনে পড়ে বিশেষ করে—রাজকুমার চক্রবর্তী আর ডাঃ সুরেন সেন, এম-এ, পি-এইচ-ডি। প্রথমোক্ত ব্যক্তির আনাগোনা ছিল প্রায় নিত্য; কারণ রাজনীতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায় তাঁর কাজও ছিল যেন সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলা। আমাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠলে তাতে দ্রুত প্রচারকার্যের সুবিধা ছিল। এদিক দিয়ে তাঁর স্বভাবের কৃত্রিমতা প্রকাশ পায় নি, আসতেন তিনি তাঁর সহজ সম্পর্কের জোরে। আমাদের মুখপত্র যে দলের তিনিও ছিলেন সেই দলভুক্ত। আমাদের সংসর্গে তাঁর এত ঘনভাবে আসার আরও একটা বড় কারণ ছিল।

তিনি ছিলেন আজন্ম কৌমার্যব্রতধারী। গৃহে তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। অধ্যাপনা শেষ করে ঘরে ফিরে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দেবার আগে তিনি কোন দিন কোন কোমল হস্তের চুড়ির ঠুন্-ঠুন্ আওয়াজ কানে শুনতে পান নি কিংবা কোন শিশুর কল-কাকলিতে তাঁর চিত্ত স্নেহরসে আপ্লুতও হয় নি কোন দিন। ঘরে তাঁর মন বসতো না, তাই আসতেন ছুটে আমাদের কাছে। এক এক দিন সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কাটিয়েও শেষে ফিরতেন আমাদের সঙ্গে। আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে এসে বিজয়ভূষণ ও আমার সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতো।

সখের সাংবাদিকতাও ছিল তাঁর একটি নেশা। মাঝে মাঝে আমরা তাঁর সাহায্য নিতাম শিক্ষা বিষয়ক ব্যাপারে। অমায়িক, সরল ও বন্ধুবৎসল ব্যক্তি ছিলেন এই রাজকুমার চক্রবর্তী।

ডাঃ স্থরেন সেন শুধু যে বরিশাল জিলার লোক ছিলেন তা নয়, তিনি বিজয়ভূষণের স্বগ্রামবাসীও। অশ্বিনী দত্তের 'ভক্তিযোগ' এঁদের উভয়ের পড়া ছিল কিনা জানি না, তবে এঁদের আত্মিক যোগ দেখে মুগ্ধ হতাম। শুধু এঁদের ক্ষেত্রেই নয়, বরিশালবাসী অনেকের মধ্যেই এই যোগ দেখে আমার মনে হতো অশ্বিনী দত্ত তাঁর জিলাবাসী সকলকে একটি মাত্র যোগেই দীক্ষা দেন নি, তিনি ছিলেন অনেক যোগের দীক্ষাগুরু।

ডাঃ স্থরেন সেন থাকতেন তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে। ট্রেনে যাতায়াত করতেন। সার্কুলার রোডে আমাদের অফিস পড়তো তাঁর স্টেশনে যাওয়ার পথে। এই সময়টা তাঁর দেখা মিলতো।

শিক্ষা বিষয়ে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন জটিল ব্যাপারে প্রবন্ধ লিখতে হলে অনেক সময় তাঁকেও অনুরোধ করতো বিজয়।

বাংলায় প্রবন্ধ লেখার অভ্যাস তাঁর তেমন ছিল না। তবু বিজয়ের অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করেন কি করে? বক্তব্য তাঁর কিছু অপ্রাসঙ্গিক হবে না, সেইটুকুই আমাদের চাই প্রধানত।

যথাসম্ভব দ্রুত প্রবন্ধ শেষ করে হাতের ব্যাগটি তুলে নিয়ে তিনি কেটে পড়বার মতলবে উঠে দাঁড়ালেন একদিন। অধ্যাপক মহাশয় তাঁর একটানা

লেখার মধ্যে কোথাও থামেন নি। কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ির কোন বালাই নেই কোথাও।

বিজয় প্রবন্ধটি হাতে নিয়েই বললে অধ্যাপক মশায়কে—এই-ই! করেছেন কি! পাঙ্কচুয়েশন করে দিয়ে যান।

বিজয়ের তো আব্দার মন্দ নয়। প্রবন্ধ পেয়েছে সেই তো যথেষ্ট, আবার পাঙ্কচুয়েশন চায়।

ডাঃ সেনের অতখানি ধৈর্য ছিল না, আর সময়ও ছিল না হাতে।

বললেন—আর-রে আম্-মা-র এদিকে ট্রেন ফেল হইয়া যায়, তুমি বলো পাঙ্কচুয়েশন করিয়া দিতে! পাঙ্কচুয়েশন করমু কি?

ডেলী প্যাসেঞ্জার না হলে ডেলী প্যাসেঞ্জারের ট্রেন ধরবার তাড়া হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। বিজয়কে ঠিকঠাক করে নেবার অবাধ অধিকার দিয়ে ডাঃ সেন দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ভারি মজার লোক ছিলেন এই ডাঃ সেন। তাঁর হাসিমুখের পরিহাস-পটুতা আকর্ষণীয় ছিল। বিজয়ের মতো তিনি বর্ণচোরা হবার চেষ্টা করেন নি কোন দিনই। নলিনীরঞ্জন সরকারের মতো তিনিও তাঁর আঞ্চলিক ভাষাকে ব্যবহার করতেন অবাধে এবং সুধী সমাজেও। কেবল বুঝতে পারতাম না একটা বিদেশী ভাষার উচ্চারণেও তাঁর আঞ্চলিক ছাপ দেওয়াটা। ইংরাজী 'য়্যাডিশনাল' শব্দকে 'এডিশনাল' রূপে রূপান্তরিত করতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করতেন না। আর 'য়্যাসিস্টাণ্ট' এর চেয়ে 'এসিস্টাণ্ট'-এর সাহায্য পেলেই তিনি খুশি হতেন বেশি।

আর একজন লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল কিছু দিনের জন্যে আমাদের ওখানে। তাঁর আবির্ভাবটা যেমন আকস্মিক, তিরোভাবটা তেমনি সকরুণ।

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় অন্তত কলম তিনেক ভরাতে হতো একটা বিশেষ প্রবন্ধ দিয়ে। এই বিশেষ প্রবন্ধ আমাদের সংগ্রহ করে রাখতে হতো। এখনকার মতো লেখককে দক্ষিণা দেওয়ার রেওয়াজ তখনো চালু হয়নি তেমন, সুতরাং লেখকের তরফ থেকে দাক্ষিণ্যের অভাব ছিল; এই অভাবটা আমরা পরিপূর্ণ করে নিতাম কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখা বেমালুম উদ্ধৃতি

হিসাবে দিয়ে কিংবা কোন ইংরেজী প্রবন্ধের অনুবাদ ছাপিয়ে। বিজয়লাল মাঝে মাঝে আমাদের সাহায্য করতো, সে কথা আগেই বলেছি; কিন্তু সেটা ছিল তার খেয়াল, সেই খেয়ালের বশেই সে হতে পারতো মৌলিক এবং সে রকম মৌলিক হওয়াটাও ছিল তার কৌলিক ধর্ম। আমাদের সে রকম কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা অধ্যবসায় না থাকায় বিরক্তি বোধ করেছি। আমাদের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যে সম্পাদক গোপাল সান্যাল আবিষ্কার করেছিলেন এক লেখককে। কি ভাবে তিনি এই লেখকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তা জানি না, তবে আমাদের সঙ্গে যখন তাঁর সাক্ষাৎ হলো তখন তাঁর দু'একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়ে গেছে আমাদের কাগজে। সম্পাদক মশায় নিজেই সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব বহন করেছিলেন। প্রবন্ধের ভাষা এক রকম চলন-সই আর বিষয় ঐতিহাসিক—তাও আবার হাজার, দেড় হাজার বছর আগেকার ব্যাপার। কাজেই বিষয়বস্তু নিয়ে পাণ্ডিত্য দেখাবার অবসর আমাদের ছিল না। লেখকের পক্ষে তাই আমাদের চোখে ধূলো দেওয়া সহজ ছিল।

সুদীর্ঘ, রোগা, পাংশু চেহারা ছিল এই লেখকের। তাঁর টেরা-চোখের দৃষ্টি সম্পাদকের দিকে কিংবা আমাদের মধ্যে যে-কোন এক ব্যক্তির দিকেই পড়েছে বলে মনে হতে পারতো। এমন হয়েছেও দু'চার দিন। ঘরে ঢুকে হয়তো কোন প্রশ্ন তিনি করলেন একজনকে আর আমরা জবাব দিয়ে বসলাম যুগপৎ জন পাঁচেক।

লেখকের নামের পিছনে জুড়ে দেওয়া থাকতো একটা মস্ত ডিগ্রী—পি-এইচ-ডি। কোন্ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এই মহামূল্য উপাধিটি লাভ করেছিলেন জানি না, তবে তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্যে ভক্তি বশত আমরাও তাঁর নাম ছাপাবার সময় নামের গোড়ায় লাগিয়ে দিতাম ডাঃ। ডাঃ লেখক এজন্যে খুশি থাকতেন। নামের মোহে মোহাবিষ্ট লেখককে পেলে আমাদের কাগজের পৃষ্ঠা ভরে যেতো। এক্ষেত্রে লাভটা ছিল উভয় পক্ষের—উভৌ উভাভ্যাম্।

কিন্তু একদিন ডাঃ লেখক হঠাৎ ধরা পড়ে গেলেন। তিনি এক প্রবন্ধ

পাঠিয়েছিলেন, উদ্ধৃতির বাহুল্য দেখে মূল্যবান প্রবন্ধটি একটু মন দিয়ে পড়া শুরু করলাম। লেখকের উদারতা ছিল, তিনি তাঁর প্রবন্ধের মাল-মসলার জন্যে অপর লেখকের কাছে ঋণ স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন নি দেখলাম। কিন্তু বিপদ হলো প্রথম উদ্ধৃতির পরে দ্বিতীয় উদ্ধৃতির এক কোণে বন্ধনীর মধ্যে দেখলাম লেখা আছে Ibid গ্রন্থ, ১১৬ পৃঃ। Ibid গ্রন্থ! ওঃ হরি! নিচে চেয়ে দেখি আরো গোটা কয়েক বন্ধনীশোভিত স্বীকৃতি!

বুঝলাম লেখক একই ইংরেজী গ্রন্থ থেকে তাঁর প্রবন্ধের মাল-মসলা সংগ্রহ করেছেন তাই Ibid গ্রন্থের এত উল্লেখ।

সম্পাদক গোপাল সান্যালকে বললাম—ও মশায়, আপনি এই Ibid গ্রন্থ আর কত কাল চালাতে বলেন বলুন তো?

—কি রকম?

—এই দেখুন মশায়।

বন্ধনী-আবদ্ধ Ibid গ্রন্থের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তিনি হেসে ফেললেন। ডাঃ লেখকের এতখানি অজ্ঞতা তিনি ভাবতে পারেন নি। স্বয়ং এই লেখকের আবিষ্কারক বলে তিনি লজ্জিতও বোধ করলেন। কুপিত হয়ে প্রবন্ধটি ছেঁড়া-কাগজের ঝাঁপিতে ফেলে দিয়ে বললেন—আর নয়, এইবার ইতি দিন।

অতঃপর ইতি যে কি ভাবে দিলাম সেইটাই বলছি এবার। সম্পাদক মহাশয় কুপিত হওয়ায় সুবিধা হলো এই যে, আমরা এবার যে ব্যবস্থাই করি না কেন তাতে তাঁর অন্তরের সম্মতি পাওয়া যাবে।

প্রবন্ধটি ছাপা হলো না দেখে কয়েক দিন বাদে লেখক স্বয়ং উপস্থিত হলেন তাগিদ দিবার মানসে। সম্পাদকের পাশের চেয়ারখানা দখল করে তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে প্রবন্ধটি সম্বন্ধে ফলাফল জানতে চাইলেন। সম্পাদক ভ্রূক্ষেপ করলেন না, কোন কণ্ঠও যেন তাঁর শ্রুতিগোচর হয় নি এমনি ভাব দেখিয়ে তিনি তাঁর কলম চালাতে লাগলেন অতি দ্রুত ভাবে খস্-খস্-খস্। অপর সকলের মধ্যেও কারো মুখে কোন কথা নেই—সবাই যেন শশব্যস্ত। প্রবন্ধ-লেখক সকলেরই কাজের তাড়া দেখে ভাবলেন এখন কথা বলা ঠিক

নয়, তিনি বরং ইংরেজী কাগজের ওদিকটা একটু ঘুরে এসে পরেই তাঁর জিজ্ঞাস্য জেনে যাবেন।

কিন্তু ঘুরে এসে যা তিনি দেখলেন তাতে তাঁর চক্ষু স্থির হয়ে গেলো। তিনি যে চেয়ারটিতে আসীন ছিলেন সেটি উল্টে রাখা হয়েছে। এদিকে-ওদিকে বারকতক হতভম্বের মতো চাইলেন, কিন্তু কারো কোন সাড়া নেই, মুখে কোন কথা নেই। সম্পাদক মশায়ও এমন নির্মম!

দু'দিন আগে যাঁর আদর ছিল, দু'দিন বাদে তাঁর এমন লাঞ্ছনা—এটা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি! ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ করে আরো খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন। যাবার বেলায় সেদিন তাঁকে কেউ পিছু ডাকে নি।

এমন করুণ রসাত্মক ঘটনা দু'একটি ঘটে যেতো। কিন্তু এক্ষেত্রে যেন বড্ডই বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। ছোক্‌রার দলের কাণ্ডই আলাদা। তাদের বন্য উল্লাসে প্রকাশ পেয়েছিল নিতান্তই ছেলেমানুষি—যাকে বলে প্রগলভতা।

তখনকার দিনে আমাদের এখানে তরুণ সাহিত্যিকদের অবাধ আনাগোনা ছিল নিতান্তই একাত্মবোধের দরুন, একথা আগেই বলেছি। সেই আনাগোনার মধ্যে মাঝে মাঝে আবির্ভূত হতেন তখনকার সদ্যখ্যাত নাট্যকার মন্মথ রায়। তিনি আবির্ভূত হলেই তাঁর পাশে দেখা যেতো তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর বন্ধু শিল্পী ও শিশু-সাহিত্যিক শ্রীঅখিল নিয়োগী ওরফে শ্রীঅ। অসম অবয়বধারী দুই ব্যক্তির এমন বন্ধুত্ব আমাদের চোখে বিচিত্র বোধ হতো। বিশাল শাল্মলীতরুর ছায়ায় যেন ক্ষুদ্র আকন্দ বৃক্ষটি। প্রায় সাত ফুট দীর্ঘ দেহ এই মন্মথ রায়ের। বাঙালীর মধ্যে এমন সুশ্রী, সুগঠিত দেহ খুবই বিরল, সীমান্ত গান্ধীর রাজ্যে মানাতো ভালো; কিন্তু সে দেশে ঐ দীর্ঘ আয়ত চোখের কমনীয়তা ফুটতো কি না সন্দেহ। মিষ্টভাষী, বিনয়ী, সদালাপী এই মন্মথ রায় তাঁর বামনাকার বন্ধুকে নিয়ে আসতেন হয়তো তাঁর নতুন কোন নাটকের অভিনয়ে আমন্ত্রণ করতে কিংবা অভিনয়ান্তে আমাদের অনুকূল অথবা প্রতিকূল মনোভাবের আভাস নিতে। "Made to order" নাটক

লিখবার নাকি অসাধারণ শক্তি ছিল তাঁর, একথা শচীনদা বলতেন। নাট্য নিকেতনের কর্তা প্রবোধ গুহ নাকি এক বার তাঁকে ঘরের ভিতর বন্দী করে সপ্তাহখানেকের মধ্যে এক নাটক রচনা করিয়ে নিয়েছিলেন। খুব সম্ভব সে নাটকখানির নাম 'খনা'।

১৯২৯-৩০ সালে যে দুই জন জগদ্বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর নৃত্যকলা দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল তাদের নাম যথাক্রমে উদয়শঙ্কর আর ম্যানা পাভলোভা। এক জন প্রাচ্যের আর অপরা পাশ্চাত্যের প্রতীক।

খবরের কাগজওয়ালাদের সুবিধা ছিল এই যে, তাঁরা এসব ব্যাপারে আমন্ত্রিত হতেন সম্মানীয় অতিথিরূপে। কারণ তাঁদের কলমের দাক্ষিণ্য বা বিরূপতার শক্তি ছিল অনেকখানি। কে না চাইতো তাঁদেরকে হাতে রাখতে? বিশেষ করে অর্থ অনর্থ নিয়ে যাঁদের মাথা ঘামাতে হতো তাঁদের কাছ থেকেই খাতিরের ভাগটা পাওয়া যেতো বেশি মাত্রায়। উদয়শঙ্করের নৃত্যকলা দেখবার আয়োজন যাঁরা করেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল যথারীতি।

মনে আছে কোন সিনেমা কোম্পানী থেকে আমরা পেয়েছিলাম 'সিজন-পাস' অর্থাৎ সর্ব ঋতুতে ছিল আমাদের সমান অধিকার। বারো মাসে তেরো পার্বণ হলে ঐ সিনেমা কোম্পানীর প্রদর্শনীতে সগর্বে হাজির হবার অবাধ অধিকার আমাদের ছিল।

সাধাসাধি করলেও কোন দিন যাবার প্রবৃত্তি হয়নি ঐখানে, একথা নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি। কিন্তু উদয়শঙ্করের বেলায় আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারি নি। দেশে-বিদেশে তাঁর নৃত্যকলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কাগজে পড়তাম; মনটা তাই প্রথমেই তৈরী হয়েছিল, চাক্ষুষ দেখার প্রলোভন হয়ে উঠলো উদগ্র।

নিউ এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে যেদিন প্রথম তাঁর নৃত্যাভিনয় দেখি সেদিন দেশী-বিদেশী দর্শকের সংখ্যা হয়েছিল অগণিত। তিল ধারণের স্থান ছিল না কোথাও। অভিনয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমবেত দর্শকবৃন্দের এমন

বিস্ময়কর আচরণ আমার জীবনে কখনো প্রত্যক্ষ করি নি। সকলে স্তব্ধ, প্রশান্ত; একটি নৃত্যাভিনয়ের পর অবসর কালের মধ্যেও কারো মুখে কোন কথা ফোটে নি—চারি দিকে যেন নিস্তরঙ্গ স্তব্ধতা, মাটিতে একটা সূচ পড়লেও তার আওয়াজ কানে আসতো।

অভিনয়ান্তে দেখেছি সেই অগণিত লোকের বহির্গমনে কোন সোরগোল নেই। সবাই যেন ভেসে চলে গেলো এক নিস্তব্ধতার অবারিত বন্যাস্রোতে।

সার্থক হয়েছিল সেদিনকার ঐ নৃত্যাভিনয় দর্শন। সেই নৃত্যকলার সৌন্দর্য ফুটেছিল অন্তরের উপলব্ধিতে, ভাষা তাকে প্রকাশ করতে পারে না; সুতরাং সমালোচনার প্রয়োজন ছিল না সেদিন।

শান্ত জনতার নৈঃশব্দ্য প্রমাণ করে গেলো উদয়শঙ্করের পারদর্শিতা।

কি যেন একটা মোহে আবিষ্ট হয়ে ছিলাম কিছুকাল। এমন উচ্চাঙ্গের নৃত্যকলা দেখি নি আর কখনো। রঙ্গালয়ে বা এখানে-ওখানে যে নৃত্যাভিনয় দেখেছি এর পূর্বে তাতে চটুল লাস্যে একটা তরলিত হৃদয়াবেগ বা ঐ রকম একটা কিছু হয়তো মনকে দোলা দিয়েছে ক্ষণিকের জন্যে; তাকে পোষণ বা লালন করতে পারি নি অন্তরে। উদয়শঙ্কর যে ভাবের তরঙ্গ তুলেছিলেন উপভোগ করেছিলাম তার হিন্দোল। তাই যেদিন তাঁর দ্বিতীয় বার নৃত্যাভিনয় হলো কিছুদিন পরেই, সেদিন ছুটে গেলাম আনন্দে।

কর্পোরেশন অফিসের উত্তর-পূর্ব কোণে পিকচার প্যালেসে এবারকার আয়োজন (এখন যেখানে 'এলিট' সিনেমা)। এবার আমার সঙ্গী ছিলেন বিজয়ভূষণ। পাশাপাশি বসেছিলাম আমরা দুই বন্ধু। একটু বাদেই যিনি আমার বাঁ দিকের আসনটি দখল করলেন তিনি একটি খাঁটি মেমসাহেব। একটু আড়ষ্টতা বোধ করেছিলাম, কিন্তু দেখলাম তিনি তাঁর পাশেই আসীন একটি বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। এইবার ভালো করে চাইতেই দেখি মেমসাহেব আমাদের খ্যাতনামা অধ্যাপক বিনয় সরকারের পত্নী, কথা তিনি বলছিলেন তাঁর দেবরের সঙ্গে। শাড়ির বদলে গাউন তাঁর পরনে থাকায় প্রথমটা তাই খেয়াল হয় নি।

সেদিনকার নৃত্য-সূচীতে নতুন আরো কয়েকটা বিষয় সন্নিবেশিত

হয়েছিল। সুন্দরী তরুণী সিমকী ছিলেন উদয়শঙ্করের নৃত্যসঙ্গিনী। পুরাতন বিষয়ের পুনরাভিনয় আবার দেখলাম, সেই একই আনন্দ-হিল্লোলে হিল্লোলিত মন তবু ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল নতুনের আস্বাদ গ্রহণে।

বসন্ত সমাগমে পুরাতন পৃথিবীর জীর্ণতা কেটে গেছে। চারি দিকে সবুজের সমারোহ মন্দানিলে হিল্লোলিত; পল্লবিত তরুশাখায় পাখিদের কাকলিতে শোনা যায় নব জীবনের বন্দনা-গান; প্রান্তরে, কান্তারে পুষ্পভারে আনম্র বৃক্ষরাজির মৃদু সৌরভ ভেসে আসে;—নবোদ্ভিন্ন যৌবনের সে সৌরভ। সিমকী এবং তাঁর সঙ্গিনী অন্যান্য বালাদের নৃত্য-লাস্যে রূপায়িত হলো এই বসন্ত-সমাগম। নব সৃষ্টির আনন্দ-উল্লাসে আকুল মন উড়ে চলেছিল কোথায়!

স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে এলেন গঙ্গা—অনন্ত প্রাণসঞ্চারিণী গঙ্গা। তাঁর স্নেহধারায় সিঞ্চিত শ্যামা পৃথিবীর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তারপর কত যুগ যুগান্ত বয়ে গেছে; দিক দিগন্তে প্রবাহিনী গঙ্গার কূলে কূলে ফুটে উঠেছে গাঙ্গেয় সৌন্দর্যের অফুরন্ত ফুল। মুগ্ধ বিস্ময়ে মানুষ তাই গঙ্গার স্তব গান করেছে যুগ যুগ ধরে—সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ।

মানুষের অন্তরের উৎসারিত এই স্তুতি তরঙ্গায়িত হলো নর্তকী সিমকীর দেহে। পূজারিণীর পূজার্ঘ ভেসে গেলো যেন এক অপার্থিব আনন্দলোকের দিকে। অচঞ্চল দর্শকবৃন্দ বিস্ময়ে অবাক হয়েছিল। হঠাৎ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হলো এক নারীর বিস্ময়াবিষ্ট কণ্ঠ ধ্বনিতে—Oh-h! She is a goddess!

ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত হল-ঘরটি আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। যে দৃষ্টি ছিল এতক্ষণ শুধু পাদপ্রদীপের সামনে নৃত্যশীলা নারীর দিকে, তা এখন ফিরাতেই দেখি আমার ঠিক পাশের মহিলাটি অর্থাৎ অধ্যাপক বিনয় সরকারের পত্নীই হৃদয়াবেগে তাঁর আসন পরিত্যাগ করে দণ্ডায়মানা হয়েছেন। তাঁরই কণ্ঠের ধ্বনি এসেছিল আমার কানে—তিনি আত্মভোলা হয়েছিলেন। সিমকীর নৃত্যাভিনয় সার্থক হয়েছিল।

য়্যানা পাভলোভার নৃত্যাভিনয়ের আয়োজন হয়েছিল ফার্স্ট এম্পায়ারে। এখানেও দেখেছি বসন্ত ঋতুর বর্ণচ্ছটা, দেখেছি হংস-নৃত্য। মুগ্ধ হয়েছি, কিন্তু

তৃপ্তি পাই নি। গ্রীক ভাস্কর্যের সঙ্গে ভারতীয় ভাস্কর্যের যে তফাত পাভলোভার নৃত্যকলার সঙ্গে উদয়শঙ্করের নৃত্যকলার ঠিক তেমনি তফাত। একটি ক্ষণিকের মোহে আচ্ছন্ন, আবিষ্ট, বিহ্বল, চঞ্চল; অপরটি সুদুর্লভের ইঙ্গিতে নিবিড় স্থৈর্যে বিধৃত। একটি আপন পরিবেশের মধ্যে ঘুরে ঘুরে মরে; অপরটি আনে তার পরিবেশের মধ্যে ঊর্ধ্বলোকের সংবাদ।

পায়ের আঙুলের ডগায় দেহের ভারার্পণ দেখেছি পাভলোভার; সার্কাসের কোন ব্যায়াম-বীরের কাছে তার চেয়েও নিপুণতর ভঙ্গিমা হয়তো দুর্লভ নয়। পুষ্পাধারে পুষ্পচয়নে পাভলোভা যে মত্ততা ফুটিয়েছিলেন তাতে বসন্ত এসেছে মনে করতে পেরেছি, কিন্তু অনন্তের আভাস পাই নি। তাঁর নৃত্যলাস্যে যেন ছিল উৎক্ষিপ্ত কামনার দুর্দমনীয় আকর্ষণ। তাতে—

"অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা।
নাচে রক্তধারা!"

এডভান্স পত্রিকায় যাঁরা যোগ দিলেন তাঁদেরও আগে বোধ হয় আমরা চপলাকান্তকে হারিয়েছিলাম। চপলাকান্ত ধাপে ধাপে আইনের পরীক্ষা পাশ করে মোটা টাকা আয়ের আশায় আইনজীবী হবেন বলে সরে পড়েছিলেন এখান থেকে। আইনের ব্যবসা কিন্তু তাঁর ধাতে সয়নি, তাই যাতে তিনি নেশা করেছিলেন তা-ই উত্তরকালে তাঁর পেশা হয়ে রইলো। * আমাদের আচার্য ফণীন্দ্র মুখুজ্যে কবরের পাশে আর পা বাড়ান নি; তিনি গিয়ে জুটলেন অতীত যুগের কাব্যবিশারদের সাপ্তাহিক পত্রিকা হিতবাদীতে। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ এ বাড়িতে আসার কিছুকাল পরে ইউনাইটেড প্রেস নামক এক সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে দিল্লী-সিমলা করতে লাগলেন!

আমাদের রসরাজ কোম্পানীর রস শুকিয়ে আসছে দেখে অন্যত্র রস সংগ্রহের জন্যে যোগ দিল গিয়ে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায়। চোখের সামনে দেখছি 'একে একে নিবিছে দেউটি!'

কবরের সামনে আসার পর বিপর্যয় যেন ঘন ঘন ঘটতে লাগলো। আমার ব্যক্তিগত আর্থিক ক্ষতিও হলো এইখানে আসার পর। নবশক্তি-সম্পাদক সরোজ রায়চৌধুরী তার কাগজে 'দূরবীণে দুনিয়া' শীর্ষক একটি কলম আমাকে দিয়ে লেখাতো এবং তার জন্যে যে উপরন্তু দক্ষিণার ব্যবস্থা সে আমার জন্যে করেছিল, তাও বন্ধ হয়ে গেলো। আমার দুঃখের কথা বলছিলাম। সে দুঃখ আরো বেড়ে গেল সরোজের জেল হওয়ায় এবং তা অতি তুচ্ছ কারণে। 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল'-এর রচয়িতা রবি মৈত্রের এক কবিতা ছেপেছিল সরোজ। ক্ষুদ্র কয়েকটা লাইনের মধ্যে নাকি এমন মারাত্মক রকমের বীররসের অবতারণা করে ফেলেছিলেন কবি, যে, তাতে ইংরেজ রাজত্বের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হবার কারণ ছিল। সম্পাদক এই কবিকে প্রশ্রয় দিয়ে অপরাধ করে ফেলেছেন নিশ্চয় এবং তা রাজদ্রোহের আওতায় পড়ে। সুতরাং সরোজের শ্রীঘর বাসের ব্যবস্থা হলো। তাকে হারিয়ে সত্যই দুঃখ বোধ করেছিলাম।

আমার রুটি মারা গেলেও কিন্তু নাট্যসমালোচক চন্দ্রশেখরের খুঁটি উপড়ে পড়েনি। বুঝলাম সিনেমা-থিয়েটারের ক্ষুধা এখন তীব্রতর হয়েছে অনেকেরই মনে, কাজেই তার খোরাক জোগাতে হবে। আমাদের বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিক উভয় কাগজেই তিনি ছিলেন নাট্যসমালোচক। 'চন্দ্রশেখর' কিন্তু আসল নাম নয়, আসল নাম মনোজেন্দ্রনাথ ভঞ্জ। বাপরে কি দাঁত ভাঙ্গা নাম! বোধ করি, এই হেতুই তিনি নিজেকে ছদ্মনামে চালু করেছিলেন এবং এই নামেই হয়েছেন খ্যাত। দিব্যি সুদর্শন চেহারা —আলাপে আপ্যায়নে এবং রুচিবোধে তিনি আরো সুন্দর হয়ে উঠতেন। তাঁর একটা মস্ত গুণ দেখেছি—তিনি সব সময় গাঁটের কড়ি খরচ করে থিয়েটার-সিনেমা দেখতেন, কখনো কোন থিয়েটার বা সিনেমা কোম্পানীর অনুগ্রহ গ্রহণ করতেন না, পাছে তাঁর সমালোচনা পক্ষপাতদোষদুষ্ট হয়ে পড়ে। এক দিন তাঁর নিজস্ব পাঠাগারে একরাশ সিনেমা-থিয়েটারের টিকেট দেখে অবাক হয়েছিলাম। বললেন তিনি পক্ষপাতিত্বের অপবাদ খণ্ডনের জন্যে ওগুলি তাঁর দলিল।

একে এটর্ণির জামাই, উপরন্তু নিজেও এটর্ণি হতে চলেছেন তখন। কাজেই ঐ বাত্তিক তাঁকে পেয়ে বসেছিল।

এত দিনে তাঁর পাঠাগারে সিনেমা-থিয়েটারের টিকিটের পাহাড় হয়েছে কি না তা বলতে পারবো না।

ফরওয়ার্ড কোম্পানীর শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছিল। আর একটি লাঠির ঘায়ে তাকে ধরাশায়ী করতে পারলেই ইংরেজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। এ জন্যে ইংরেজ মহাপ্রভুর চক্রান্তের অন্ত ছিল না। সত্য বক্সী জেল থেকে ফিরে এসে আবার কাগজের কর্ণধার হয়েছেন, উপেন বাঁড়ুজ্যে তখনো আছেন; আর সুভাষচন্দ্র, শরৎ বোস ইত্যাদি তখনো নায়ক। কাজেই 'মরিয়া না মরে রাম' এই অবস্থা যখন, তখন ইংরেজ এক নতুন মতলব আঁটলেন। প্রেস অর্ডিনান্সের বলে ইংরেজ বসালেন এক প্রেস অফিসার—তাঁর কাজ হলো কাগজগুলোকে সায়েস্তা করে তাঁবে রাখা। প্রথম প্রেস অফিসার যিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁর নাম টাফ্‌নেল্ ব্যারেট। ছোক্‌রা বয়সের টাট্‌কা আই-সি-এস। তিনি এসেই টের পেয়ে গেলেন আমাদের মধ্যে উপেন বাঁড়ুজ্যে নামক যে ব্যক্তিটি আছেন তিনি বোমার যুগের বিপ্লবী, দ্বাদশ বর্ষ কালাপানি ভোগ করেও তাঁর কিছুমাত্র চৈতন্যলাভ হয় নি, লেখায় তাঁর বিদ্রূপের বিষাক্ত শর, অতি সাংঘাতিক লোক, বুদ্ধি তাঁর ক্ষুরধার। সাহেব এ-হেন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে উৎসুক হয়ে বার দুই তাঁকে আমন্ত্রণ করে পাঠালেন। কিন্তু উপেন বাঁড়ুজ্যে বললেন বয়ে গেছে তাঁর, সাহেব শূয়োরের প্রেমের কাঙাল তিনি নন। মহম্মদ যখন পর্বতের কাছে যেতে রাজি হলেন না তখন পর্বতই এক দিন এলেন মহম্মদের কাছে আলাপন করতে আমাদের অফিসে।

সাহেব ভেবেছিলেন তিনি তাঁর চাক্ষুষ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁর পদ-দায়িত্বের বিষয়টি তুলে প্রকারান্তরে তাঁর শাসন-দণ্ডটির কথাটা উপেন বাঁড়ুজ্যেকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাবেন। কিন্তু বাঁড়ুজ্যে সে পাত্রই নন। সাহেবকে কথা বলবার সুযোগ বেশি না দিয়ে তিনি করলেন সনাতন রীতিতে আলাপন শুরু। সাহেবের ঘর-বাড়ি কোথায়,

কেমন সেখানকার লোকজন, সাহেবের দেশের বাড়িতে কে কে আছেন, কেমন করে ঘরকন্না চলে ইত্যাদি যাবতীয় প্রশ্নে সাহেবকে একেবারে জর্জরিত করে শেষটায় বলে উঠলেন—ও সাহেব! তুমি এখনো বিয়ে করোনি, মাই গুড্ গ্যাড্! তাঁর বিস্ময়ের ভঙ্গিটা এমন হলো যে আশে-পাশের অপর দু'জন সম্পাদকও হাসি চাপতে গিয়ে তাঁদের চাপা হাসিকে ফাটিয়ে ফেললেন! সাহেব লজ্জিত হয়ে মাথা নিচু করতেই বাঁড়ুজ্যে তাঁকে এই সময় হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা, সাহেব, তুমি তো সভ্য-ভব্য দেশের মানুষ, তোমাদের দেশে পুলিশ এসে খবরের কাগজের সম্পাদককে কি লিখতে হবে তা বলে?

সাহেব এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন—**You are a dangerous fellow, you refuse to be trapped, I see.** (আপনি দেখছি সাংঘাতিক লোক, ফাঁদে পা দিতে চান না।)

টাফ্নেল ব্যারেটকে যে এ রকম 'টাফ্ ফাইট্' (অর্থাৎ আল্লার সঙ্গে কল্লার লড়াই) দিতে হবে তা তিনি ভেবে আসেন নি আগে থেকে।

সাহেব সেই যে চম্পট দিলেন, আর এই দুর্মুখের সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেন নি।

-

সূর্য অস্তাচলে যাবার আর বেশি দেরি নেই। তবু এই পড়ন্ত বেলায় আবার নতুন করে দু'একটি বন্ধু জোটে। এঁদের মনে তো কোন আশঙ্কা ছিল না। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার কাল থেকে তার বর্ধিষ্ণু অবস্থা এবং শেষটায় তার ক্ষয়িষ্ণু অবস্থাটাও আমরা যে চোখে দেখেছি, সুতরাং আমাদের বেদনা ছিল নাড়ির টানের মতো তীব্র। নতুন যাঁরা এলেন আসরে ঝালর ঝুলানো সাজ-সজ্জার বৈভব তাঁরা দেখতে পান নি বটে, তবু তাঁদের তো এটা আসরই, হোক্ না এর আয়োজনের অপ্রাচুর্য, প্রাণের প্রাচুর্যে এঁরাই যে এখানে এক দিন ফুল ফুটাতে পারবেন না, সে কথা কে বলতে পারে?

এলেন হেমচন্দ্র নাগ, শচীন্দ্রলাল ঘোষ, বিজন সেনগুপ্ত, সুবোধ রায়, নীহাররঞ্জন রায় (অধুনা ডাঃ)।

হেমবাবু ইংরেজী কাগজে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন। তিনি মানুষ হিসাবে ছিলেন উপেন্দ্র নিয়োগী মহাশয়ের সগোত্র—নির্বিরোধ, শান্তস্বভাব, ধীর, স্থির। আপন কর্তব্যটুকু অর্থাৎ প্রবন্ধ লেখা ছাড়া আর কোন চাঞ্চল্যে সাড়া দেওয়া তাঁর ছিল স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁর মুখের সামনে উপর দিককার গোটাকতক দাঁত বিদ্রোহ করে বাইরে এমনি ভাবে বেরিয়ে এসেছিল যে, দেখলে কালী করালবদনীর ভয়াবহতা আসতো মনে; কিন্তু আশ্চর্য এই, এই বহিঃপ্রকাশের অন্তরালে ছিল এক নির্মল, স্বচ্ছ হৃদয় যার তুলনা সহজে মিলে না। অভিজাত কুলের সিগারেটের চেয়ে দীনা, হীনা, মলিনা বিড়ির প্রতিই তাঁর আসক্তি ছিল বেশি; তাই তাঁর দন্তাঘাতে (ওষ্ঠাধরে নয়) নিপীড়িত হতো বিড়িই। সেই গজদন্তের মাঝখানে আশ্চর্য রকম কৌশলে বিধৃত বিড়িটি ফুকতে ফুঁকতে যখন তিনি প্রবন্ধ লিখতেন—সে হতো এক অপূর্ব দৃশ্য! তাঁর তন্ময়তায় অনেক সময় অর্ধদগ্ধ বিড়িটা স্খলিত হয়ে পড়তো কাগজের উপর।

শচীন্দ্রলালকে আমাদের বাংলা কাগজে দিনকতক অনুবাদের কাজ ও দু'একটা সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে দেখেছিলাম। ওদিকে ইংরেজী কাগজে টেলিগ্রাম সম্পাদনার কাজেও তাঁকে হাত পাকাতে দেখেছি সে সময়। কিছু দিনের মধ্যে দেখা গেলো বাংলার চেয়ে ইংরেজীতেই তাঁর দখল বেশি। তিনি ছিলেন ইংরেজীতে এম-এ। শেষে পাকাপকি ভাবে বহাল হলেন ইংরেজী কাগজে। প্রাণের প্রাচুর্যে ছিলেন তিনি সদা উচ্ছল। সব সময় থাকতো তাঁর হাতে একখানা ইংরেজী নভেল, নয়তো কোন জ্যোতিষ শাস্ত্রের বই। টেলিগ্রাম সম্পাদনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি নিবিষ্ট হতেন তাঁর বইয়ের পাতায়। দেখলে মনে হতো লোকটি কাজে ফাঁকি দেওয়ার ওস্তাদ; কিন্তু আসলে তা নয়, কাজ তাঁর হাতে খুব কমই থাকতো পড়ে—দ্রুতগামী ছিল তাঁর কলম আর নিখুঁত ছিল তাঁর কাজ।

আমার সঙ্গে শচীন্দ্রলালের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল খুব। ডাকতো সে আমাকে 'চাঁদদা' বলে। কথা বলতো আমাদের প্রিণ্টার অন্নদার ভাষায়।

বললাম হয়তো—ও শচীন, তুমি নাকি আজ নভেল ছেড়ে কলম ধরোনি ?

কেডা ব-অল্‌চে—বলে শচীন মুখ তুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসতে থাকে। তারপর সবটা শুনে শেষটায় "ছ্যাড়ে দাও মনে" বলেই আঙুল-ঢুকানো নভেলের পাতাটা খুলে আবার তাতে নিবিষ্ট হলো।

বিজন সেন ছিলেন আত্মভোলা, অগোছালো লোক। বেশভূষার পারিপাট্য তাঁর ছিল না আদৌ। খুস্কিভরা মাথার চুলেও হয়তো চিরুণী পড়তো না অনেক দিন। গায়ের ময়লা জামাটার দিকেও ছিল না তাঁর ভ্রূক্ষেপ। ইংরেজী সাহিত্যের এম-এ হয়েও তিনি টেলিফোন করতে পারতেন না, ধরতেও তাঁর হতো আতঙ্ক। টেলিফোন করার প্রয়োজন হলে অনেক সময় ডাকতেন আমাদের কাউকে। আর, কেউ টেলিফোনে ডাকলে বাধ্য হয়ে যদি তাঁকেই ধরতে হতো তবেই হতো বিপদ। আরো বিপদ হতো যদি টেলিফোন-বক্তা হতো হিন্দুস্থানী, কারণ তিনি হিন্দী ভাষার এক বর্ণও বুঝতেন না। অকস্মাৎ 'রিসিভার'টা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে তিনি পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় অসহায় ভাবে বলে উঠতেন—কয় কিরে মশ্‌শয়, কিছুই-ই বুঝি না!

সরল, হৃদয়বান পুরুষ ছিলেন এই বিজন সেন। পরিচ্ছদের মালিন্য তাঁর অন্তরকে মলিন করে নি কোন দিন। আমাদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবার আগে 'ফরওয়ার্ড' কাগজে সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি ইংরেজী প্রবন্ধে তাঁর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল।

কবি সুবোধ রায় ছিল আমার পুরানো বন্ধু। বারীন ঘোষ এবং সুকুমাররঞ্জন দাশ সম্পাদিত "নারায়ণ" মাসিক পত্রে আমরা উভয়ে কবিতা লিখতাম, তাই আমাদের বন্ধুত্ব হয়েছিল আগেই।

বেঁটে লোকটি। দেহের তুলনায় তার মাথাটা ছিল অত্যধিক ভারী আর মুখখানা ছিল তেমনি চ্যাটালো। রংটা ফর্সা হলেও কি একটা কঠিন রোগে অকালে পেকে তামাটে হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চেয়ারে বসে থাকলে তার নিম্ন দেহাংশের আন্দাজ পাওয়া যেতো না আদৌ। উঠে দাঁড়ালেই

দেখা যেতো তার কাঠির মতো সরু সরু হাত আর পা। হাতের আঙুলগুলি কিন্তু ছিল শিল্পীর মতো আর পায়ে কোন চীনা সুন্দরীর জুতো পরিয়ে দিলেই চলতো।

সুবোধ রায়ও শচীন্দ্রলালের মতো কিছুদিন আমাদের সঙ্গে বাংলা লিখে ভর্তি হয়েছিল গিয়ে ইংরেজী কাগজে। মাঝে কিছুদিনের জন্যে সরোজ রায়চৌধুরী জেলে গেলে তার জায়গায় নবশক্তির সাম্পাদকও সে হয়েছিল। সকল দলে ভিড়ে পড়ে আড্ডা জমিয়ে তোলায় তার কৃতিত্ব ছিল বেশ। রাজহাঁসের টানা প্যাক্ প্যাক্ ডাকের সঙ্গে হাডু-ডু-ডু খেলোয়াড়দের চল্-মার-কিৎ-কিৎ ধ্বনি মেশালে যে অদ্ভুত আওয়াজ হয় সুবোধ রায়ের হাসিতে ছিল সেই আওয়াজ। সে হাসতে পারতো এবং হাসাতেও জান্তো। কাজেই সকলের সঙ্গেই সে জমে উঠেছিল অতি অল্প দিনে এবং সহজে।

'কল্লোল' দলীয় সাহিত্যিকদের ভাঙ্গা অংশের মুখপত্র 'কালি-কলম' এর পৃষ্ঠায় সুবোধ রায়ের রসাল মন্তব্যে ভরা 'আর্টের আটচালা' উপভোগ্য ছিল তখন অনেকের কাছে।

নীহাররঞ্জন রায় এসেছিলেন রবিবারের ইংরেজী কাগজের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক হয়ে। তিনি খুব বেশি দিন ছিলেন না আমাদের মধ্যে। ডাঃ বিমলাচরণ লাহার সেক্রেটারিগিরি সেরে তবে আমাদের কাজে দিতেন হাত। আসতেন প্রায় বিকেলের দিকটায়, তাও সব দিন নয়। শুনতাম তিনি কর্পোরেশনের "মিউনিসিপ্যাল গেজেট" সম্পাদক অমল হোমের সম্পর্কীয় ভাই। পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্যে ও পরিচ্ছন্নতায় তিনি যে সে সম্পর্ক কোনদিন মলিন করেন নি, তা চোখে দেখেছি। তাঁর চেহারায় ছিল নারীসুলভ কমনীয়তা ও সৌকুমার্য। কণ্ঠটিও ছিল মিহি। হাস্লে তাঁর হাসিতে বেজে উঠতো একটা তরঙ্গায়িত কুলুকুলু ধ্বনি। এবং সেই সঙ্গে তাঁর চোখের দু'টি পাতা হয়ে আসতো অর্ধনিমীলিত। নিন্দুকরা বলতো তাতে স্বতঃস্ফূর্ততা নেই, আছে কষ্টসাধ্য অভ্যাসলব্ধ একটা প্রয়াস যাকে নাকি বলা যায় শান্তিনিকেতনী ঢঙ্। সিল্কের অথবা চোস্ত আদ্দির গিলে-করা পাঞ্জাবীর উপর গলা জড়িয়ে একটা সিকি ইঞ্চি কালো কুচকুচে

ফিতে নেমে এসে তাঁর বুক-পকেটের একটা প্রান্ত-দেশের গর্তে লুকিয়ে থাকতো। ভাবতাম বুঝিবা সেটা চশমার বাহক। আমাদের ভুল ভেঙে সেটা এক দিন প্রকাশ করলে একটা ছোট্ট হাতঘড়িকে। রাবীন্দ্রিক প্রভাব এড়িয়ে তিনি এনেছিলেন এতে স্বকীয়তা। স্বল্পকাল তিনি আমাদের মধ্যে থাকলেও এটা অকপটে স্বীকার করবো যে, তিনি তাঁর স্বভাবের কোমলতায় ও মাধুর্যে হয়ে উঠেছিলেন আমাদের সকলেরই অতীব প্রিয়। দুর্দিনের আশঙ্কায় ক্লিষ্ট আমাদের মধ্যে তিনি সঞ্চার করেছিলেন কিছুদিনের জন্যে প্রাণের রস। বর্ত্তমানে তিনি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক।

নীহাররঞ্জনের সঙ্গে মনে পড়ে গেলো আমাদের মাদ্রাজী বন্ধু ভেঙ্কটরমণের কথা। গোড়ার দিকে তার কথা বলতে একেবারে ভুলে গেছি, তার কারণও আছে। কারণ, ভেঙ্কটরমণ আমাদের মধ্যে থেকেও ছিলেন না; কখনো দেখতাম তিনি অকস্মাৎ উধাও, আবার কখনো বা তাঁর অকস্মাৎ আবির্ভাব! কি ভাবে যে তিনি আমাদের সম্পাদক-গোষ্ঠীর মধ্যে এক জন ছিলেন তাও ভালো করে কোন দিন জানতে পারি নি তবু অতি মধুর সম্পর্ক তাঁর ছিল আমাদের সঙ্গে। মাদ্রাজীদের মধ্যে অমন সুপুরুষ খুব কমই চোখে পড়ে। তাঁর বলিষ্ঠ দেহের স্বাস্থ্যও ছিল লোভনীয়। পরিচ্ছন্নতায় তাঁর রুচিও ছিল ঠাকুরবাড়ির অভিজাত শ্রেণীর। দেখলে তাঁকে বাঙালী ছাড়া আর কিছু মনে করা সম্ভব ছিল না। ইংরেজী ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা হতো আমাদের। সাধারণ মাদ্রাজীর কথা বলার ভঙ্গি এবং উচ্চারণও তিনি করে নিয়েছিলেন কিছুটা মার্জিত। তথাপি সেই সময়টায় কেবল তাঁকে বাঙালী বলে মনে করা সম্ভব ছিল না। তাঁর রেশমী পাঞ্জাবীটার উপর কচিৎ কখনো তিনি আধ ইঞ্চি চওড়া চকোলেট পাড়ের উড়ানি উড়িয়ে ও পায়ে মাদ্রাজী সাণ্ডাল চড়িয়ে দক্ষিণ ভারতের দাক্ষিণ্য প্রকাশ করতেন।

ভেঙ্কটরমণকে উপেনদা ডাকতেন ঠ্যাং-কাটা বলে। ভেঙ্কটরমণ হাসতেন তাতে। ঠ্যাংকাটার অর্থ এক দিন তাঁকে তর্জমা করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর আমরাও তাঁকে সম্বোধন করতাম ঐ নামে। অত বড় একটা দীর্ঘ নামকে ছোট করে আনায় সুবিধা ছিল বৈকি। রাগ নামক

রিপুটি বিধাতা বোধ করি তাঁকে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। মুখখানা ছিল তাঁর সদা হাস্যময়। কোন রসিকতা শুনে হাসলে তিনি সে হাসি চাপা দিতে চাইতেন মাত্র একটি আঙুলের ছোঁয়ায়; তাতে আঙুলটা তাঁর সুদীর্ঘ নাসিকার ডগা স্পর্শ করে হাসিটাকে ভাগ করে দিত দু'ভাগে। ঘোরতর নিরামিষাশী রূপে তিনি মাদ্রাজী ব্রাহ্মণের শুচিতা রক্ষা করে চলতেন, কিন্তু তাই বলে তাঁর কোন গোঁড়ামি ছিল না। আমাদের ম্লেচ্ছ আহার্য দর্শনে ছিল না তাঁর কিছু মাত্র ঘৃণা বা সঙ্কোচ। একদিন তাঁর বাসায় নিমন্ত্রিত হয়ে আমরা কয়েক জন পেঁয়াজ-লঙ্কা-দেওয়া লবণাক্ত হালুয়ার সঙ্গে চা পান করে মনে মনে তৌবা তৌবা করলেও মুখে বলে এসেছিলাম 'ওয়াণ্ডারফুল'।

বোস পরিবারের অপার স্নেহ লাভ করেছিলেন ভেঙ্কটরমণ। আমাদের মধ্যে থাকাটা যেমন ছিল তাঁর রহস্যজনক, তেমনি এক দিন তাঁর অকস্মাৎ অন্তর্ধানও হলো রহস্যজনক।

আর এক জনের কথাও ভুলে গিয়েছিলাম ঠিক এই কারণে। তাঁরও আমাদের মধ্যে থাকাটা কিংবা যথার্থ বলতে গেলে প্রাত্যহিক না হোক, সপ্তাহে অন্তত দু'চার দিন এসে ক্ষণকালের জন্যে থাকাটা কিংবা মাঝে মাঝে একেবারেই না-থাকাটা ছিল আরো রহস্যজনক। এই ব্যক্তির নাম ছিল অবিনাশ সেন—বরিশালের বিখ্যাত নেতা সতীন সেনের বৈমাত্রেয় ভাই।

গলার স্বর কর্কশ, এবং তাঁর কথা বলার ভঙ্গিটা ছিল এত দ্রুত যে, তার অধিকাংশই হতো দুর্বোধ্য, সুতরাং তাঁর মুখের সামনে দাঁড়ানো দায় হতো। তাঁর বচন-ভঙ্গির সঙ্গে কিন্তু হাতের লেখার সঙ্গতি ছিল বেশ। মাঝে মাঝে হাতে লিখে রিপোর্ট দিতেন। সে লেখা ছিল আমাদের চীফ রিপোর্টার ইলিয়ট সাহেবের হাতের লেখার স্বগোত্রীয়—কাকের-ঠ্যাং বকের-ঠ্যাং।

কিসে তিনি আঘাত পেয়েছিলেন এবং কোথায় তাঁর ব্যথা ছিল জানি না, কিন্তু সব কিছুকে নস্যাৎ করাটা বোধ হয় এসেছিল তাঁর সেই বেদনা থেকে। বলতেন তিনি—তামার যেখানে চল্, খাঁটি সোনার আদর সেখানে করবে কে?

পুরাতন কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এসেছে লক্ষ্য করছিলাম। ও-বাড়ি থেকে স্থানান্তরিত হবার আগেই অনেকের মন ভেঙে গিয়েছিল। নতুন যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের নবীন উৎসাহে তবু মাঝে মাঝে ক্ষীণ আশা ঝলক দিয়ে যেতো। তরুণদের আশাবাদী মন সেই ঝলকে আবার নতুন করে স্বপ্নের জাল বুনতো।

১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহ শুরু হবার যখন তোড়জোড় চলছে তখন বাংলা কংগ্রেসের কর্ণধারদের মনে দ্বৈত ভাব। সেনগুপ্ত-সুভাষের ক্ষমতা আহরণের লড়াইয়ে সুভাষ তখন কেল্লা দখল করে ফেলেছেন অর্থাৎ প্রাদেশিক কংগ্রেসের মসনদে তিনি তখন সমাসীন। কেল্লা সুরক্ষিত করবার জন্যে যুগান্তর ও অনুশীলন দলের সৈন্যদের নিয়ে তখন টানাটানি চলতো দু'দলে। সেই সময় কর্মী-সঙ্ঘ নামে একটি দল গঠিত হয়েছিল, তাঁরা সকল দলকে মিলিত করে একযোগে কাজ করবার পক্ষপাতী। এই দল বাংলার পঞ্চ-পাণ্ডবকে আয়ত্তে আনতে না পারায় সেনগুপ্তকে সাহায্য করছিলেন। চরখা-পন্থীরাও সকলে ঢলে পড়েছিলেন সেনগুপ্তের দিকে, কেননা গান্ধীজীর কৃপাকটাক্ষ ছিল সেনগুপ্তের উপর। লবণ আইন ভঙ্গ করবার মানসে সেনগুপ্ত সত্যাগ্রহী দল গঠন করে ফেলেছিলেন এবং এই দলের নাম দিয়েছিলেন কর্মপরিষদ। তিনি স্বয়ং এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে তোড়জোড় করেছিলেন। পুরাদমে সত্যাগ্রহ চালাবার সে কি উৎসাহ! কিন্তু বাংলার মাটির এমনি গুণ যে, সঙ্গে সঙ্গে মিথ্যাগ্রহও শুরু হয়ে গেলো চট্টগ্রামে। অনন্ত সিং-এর নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হলো।

ইংরেজ শাসকবর্গকে উড়িয়ে দিবার জন্যে বাংলার বিপ্লবীদের এটা হয়তো একটা ছেলেমানুষী পরিকল্পনা; কিন্তু এই পরিকল্পনার মধ্যে কোন মহতী শক্তি নিহিত আছে কি না তা নিয়ে তাঁরা কোন সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হন নি কোন দিন। শুধু দেশাত্মবোধের জ্বালা ছিল তাঁদের বুকে আর সেই বোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চেয়েছিলেন তাঁরা তাঁদের স্বদেশবাসীকে। হয়তো তাঁদের এ প্রচেষ্টা ছিল তুচ্ছ, কিন্তু এই তুচ্ছতার মাঝেও যে কত পরমাণবিক শক্তি স্ফুরিত হয়ে বিচ্ছুরিত হলো দিকে দিকে তার খোঁজ কে রেখেছে?

বিপ্লবীদের স্বদেশবাসীর মনোজগতে গিয়ে লাগলো সেই তুচ্ছতার বিপুল ভাব-তরঙ্গের আঘাত! কে বলতে পারে উত্তরকালের স্বাধীন ভারতের পুষ্টির একটি কণা যোগায় নি এই চট্টগ্রামের বিপর্যয়?

তখনকার দিনে ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত সম্পাদিত 'স্বাধীনতা' সাপ্তাহিক পত্রে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বার হলো—'সাবাস চট্টগ্রাম!' সে প্রবন্ধে ছিল আগুন জ্বালাবার মন্ত্র। ফলে 'স্বাধীনতা'র অপমৃত্যু ঘটলো।

চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা যে আগুন জ্বালালেন কি ভাবে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বাঙালীর মনে, তার চিত্র পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল না। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে এক জনসভায় অধ্যাপক নৃপেন বাঁড়ুজ্যে তাঁর বক্তৃতায় ভাবাবেগে অধীর হয়ে 'স্বাধীনতা' পত্রেরই প্রতিধ্বনি করলেন—চট্টগ্রাম! চট্টগ্রাম! ধন্য চট্টগ্রাম!! বিপ্লবীদের কর্মে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন বস্তুত তখন সবাই।

এই সূত্রে মনে পড়ে গেলো দেশমান্য নেতা সেনগুপ্তের কথা। রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতা হিসাবে তিনি যে সুভাষের চেয়ে অধিকতর চতুর ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ব্যাপারে। কূটনীতির কোটরে আশ্রয় নিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে আত্ম-গোপন করবার কৌশল তিনি আয়ত্ত করেছিলেন ভালো ভাবেই। অর্থাৎ নেতা হতে হলে সুবিধা মতো যে কৃত্রিমতার খোলস পরবার কায়দায় দোরস্ত থাকা দরকার, তা সেনগুপ্তের ছিল। সুভাষচন্দ্র এ বিদ্যায় পারদর্শী হতে পারেন নি কোন দিন। তাই তিনি 'জাতির পিতা'র মনোরঞ্জন করতে না পেরে শেষে জাতিচ্যুত হয়ে দেশ ছাড়া হতে বাধ্য হয়েছিলেন। মনে রাগ থাকলেও মুখে কি করে হাসি মাখাতে হয়, যাকে দেখলে গা জ্বলে যায় তার সাক্ষাতে কি ভাবে ঢলে পড়তে হয়, যাতে বিশ্বাস নেই তাতেও আশ্বাসের হেতু খুঁজে বার করতে হয় কেমন করে—সে সব কলায় পারঙ্গম যিনি না হতে পারলেন, তাঁকে যোগ্য নেতা বলি কি করে? সত্য বলে যা বিশ্বাস করি তা সোজা ভাবে প্রকাশ করে তাতে অটল থাকার নাম গোঁয়ারতুমি। এই গুণ বা দুর্গুণ থাকবার দরুন সুভাষচন্দ্র আখ্যা পেয়েছিলেন গোঁয়ার-গোবিন্দ।

যাক্ সে কথা। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কথায় ফিরে আসা যাক। ঘটনার পর দিন সারা কলকাতা খবরের কাগজের ফেরিওয়ালাদের কোলাহলে সরগরম। চায়ের টেবিলে বসে চায়ের এমন মুখরোচক অনুপান ভাগ্যে জোটে না সব দিন।

সেনগুপ্ত সাহেবের কণ্ঠে "নেলি! নেলি!" ধ্বনিত হয়ে উঠছিল। তাঁর আনন্দ-উদ্বেল চিত্তের কোন প্রশ্ন ছিল না, তবু তা চাইছিল কোন প্রিয়জনকে সে আনন্দের ভাগ দিতে। নেলী খাশ মেমসাহেব হলেও ছিলেন হিন্দু রমণীর মতো অসাধারণ ধৈর্যশীলা, পতিব্রতা নারী। স্বামীর জন্যে অনেক লাঞ্ছনা তাঁকে সইতে হতো নীরবে। স্বামীর ডাকে ছুটে এলেন কাছে, কিন্তু স্বামীর কোন প্রশ্ন নেই, স্বামীর মুখে কোন কথা নেই—শুধু সে এক অপরূপ হাসি! কাগজখানা নেলীর সামনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেনগুপ্ত সাহেব অধীর চাঞ্চল্যে দ্রুত ইতস্তত পায়চারি করতে লাগলেন। এমন সময় কারা আসে ওরা?

প্রমোদ ঘোষাল না? হ্যাঁ, তিনিই তো এবং তাঁর সঙ্গে আরো জন পাঁচেক—সব অখিল বঙ্গ ছাত্র-সম্মেলনের ছেলেরা, সেনগুপ্ত সাহেবের পরম ভক্তের দল। মহোল্লাসে সেনগুপ্ত সাহেব তাঁর ভক্তবৃন্দকে আহ্বান করলেন কাছে। সকলের মুখেই হাসির ভাষা ছিল এক। প্রশ্নোত্তরের দিন আজ নয়, আজ শুধু প্রসন্নতার উৎসব।

সেনগুপ্ত সাহেব তাঁর চেয়ারে বসেই সাম্‌নেকার টেবিলটার উপর প্রচণ্ড এক মুষ্ট্যাঘাত করে বললেন—**Bravo Chittagong! I'm proud that I belong to it.**

টেবিলের কোণে রক্ষিত পেয়ালা ও কেট্‌লি সমেত 'ট্রে টি ফুটবলের মতো উপরের দিকে নেচে উঠে ভূলুণ্ঠিত হলো; ফলে পেয়ালা ও কেট্‌লি ভেঙে হলো চুরমার! মেঝের উপর বিক্ষিপ্ত চীনা মাটির টুকরাগুলিতে আজ আর ধ্বংসের বেদনা নাই—আছে নূতনতর সৃষ্টির নবাঙ্কুরের সঙ্কেত!

—বেয়ারা! চা লাও!

সাহেবের এমন খুশ্‌মেজাজ বেয়ারা দেখে নি অনেক দিন।

নবাগত ছাত্রবৃন্দের সঙ্গে সেদিন চায়ের মজলিসের আলোচনায় সেনগুপ্ত সাহেবের মুখে ধ্বংসাত্মক বিপ্লবের বিচিত্র ব্যাখ্যা শুনা গিয়েছিল।

কিছুক্ষণ বাদে ছাত্রগণ প্রসন্ন মনে বিদায় নিলেন।

অথ পট-পরিবর্ত্তন :

এবার যাঁরা এলেন তাঁরা সব গান্ধী-মার্কা। খাঁটি খদ্দরশোভিত দেহে আড়ম্বরের লেশমাত্র ছিল না কারো। কায়েনমনসাবাচা অহিংস হবার দুশ্চেষ্টায় তাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন বলে খ্যাত হয়েছিলেন। তবু তাঁদের মধ্যে ছিলেন এক জন যিনি অতীত কালে অনুশীলন দলের এক জন মস্ত চাঁই হিসাবে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতেন অনেকেরই। সেই দূর দিনের অপকীর্ত্তি এখনো তাঁর মনের কোণে কোথাও বাসা বেঁধে আছে কি না তার খোঁজ নেবার সাহস করতে পারেন নি সেনগুপ্ত সাহেব।

এই দল সামনে এসে দাঁড়াতেই সেনগুপ্তের মুখের চেহারার আশ্চর্য রকম পরিবর্তন হয়ে গেলো। সে মুখে কোথা থেকে এলো যেন এক বিষণ্ণতার কালো ছায়া—জাতির ভবিষ্য দুঃখের অনন্ত দুশ্চিন্তার ভারে আনত, বিমর্ষ সে মুখ!

সেনগুপ্তের মুখ থেকে নিঃসৃত হলো গভীর দুঃখের আর্তনাদ—ওঃ!

উল্লাসের চাঞ্চল্য কোথাও নেই। আগন্তুকদের সঙ্গে সেনগুপ্ত সমভাবে ম্রিয়মান!

এই পতিত জাতির উদ্ধারের আর আশা নেই। অহিংসার মহামন্ত্রে যারা দীক্ষিত হতে পারলে না, অত্যাচারিত হয়েও যারা ক্ষমাশীল হবার চেষ্টা না করে প্রতিহিংসা রূপ তুচ্ছ মানবধর্ম পালনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে সেনগুপ্ত আকুল হলেন।

বিপ্লবীদের ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে আনার ভার এখন নিতে হবে তাঁদের। দেশবন্ধুর বাংলাদেশ সর্বভারতের কাছে হেয় হবে—এ তিনি সইতে পারবেন না, পারবেন না। বিপ্লবীরা দেশাত্মবোধে তাঁদের চেয়ে হীন একথা তিনি বলছেন না, শুধু তাঁদের পথটা যে বিপথ, একথা তাঁদেরকে বুঝাতে হবে স্পষ্ট করে। বুঝাতে হবে যে, হিংসা দ্বারা হিংসাই হবে জাগ্রত; আর

সেই হিংসার অনলে ভারতবর্ষ পুড়ে হবে খাক। যে আশা আসন্ন সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে ধরেছে তা অতঃপর হবে সুদূর।

সহানুভূতির দ্বারা সেনগুপ্ত স্থান করে নিলেন আগন্তুকদের হৃদয়ে।

বেয়ারা অতঃপর বৈকালিক সভার জন্যে 'মিটিংকা কাপ্‌ড়া' ঠিক করে রাখার আদেশ পেয়ে গেলো।

উদারচেতা, ত্যাগী, দেশপ্রেমিক সেনগুপ্ত ছিলেন রাজনীতিবিদ হিসাবে কলা-কুশলী। রাজনীতি ক্ষেত্রে অভিনয়েরও প্রয়োজন আছে, এ বোধ সুভাষচন্দ্রের ছিল না, কাজেই এক্ষেত্রে সেনগুপ্তের তুলনায় তিনি ছিলেন 'সি' টিমের খেলোয়াড়।

আমরা সার্কুলার রোডের যে পুরানো বাড়িটাতে এসে উঠেছিলাম তার রূপের গৌরব না থাকলেও তার সৌরভ ছিল। নতুন বাড়িতে সৌরভের আশা করবার আগে তার জৌলুস দেখে খুশি হয়েছিলাম। শুনেছিলাম সেটি কোন সৌখীন মুসলমান ভদ্রলোকের বাড়ি। ভাড়া দেওয়ার জন্যে যে এ বাড়ি তৈরি হয়নি তার প্রমাণ ছিল। ফটক খুলতেই সাম্‌নে কেয়ারি-করা ছোট্ট একটি ফুলের বাগান চোখে পড়তো। দোতলা বাড়িটাতে স্থানের অভাব হয়নি। ঘরগুলিকে খবরের কাগজের অফিস করে তুলতে গিয়ে দোতলার বড় হল-ঘরটার রূপান্তর কিন্তু কিছুতেই সম্ভব হয়নি। নর্তকীর মতো আঁকা-বাঁকা ভঙ্গিমা তার, আর বিচিত্র রঙে রঞ্জিত। শুনেছি এটা নাকি নাচঘরই ছিল—কত পুর-সুন্দরীর নূপুর নিক্কণ এখানে নাকি মরে গিয়ে নিশার গগনকে কাঁদিয়েছে। বাড়ির মালিক নবাবের বংশধর কি না জানি না তবে তাঁর মনে যে নবাবীয়ানার রং ছিল, তা ঘরের রংদার দেওয়ালে দেওয়ালে প্রস্ফুট।

কিন্তু আমাদের মনের রং চলে যাচ্ছিল, কারণ ভাঙাভাঙির ব্যাপারটা চলেছিল অনেক দিকে। সুভাষচন্দ্র যখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সেই সময় উপেনদা এক দিন অকস্মাৎ আমাদের মধ্য থেকে অন্তর্হিত হয়ে কর্পোরেশনের গরুর গাড়ির গাড়োয়ানদের কর্তা সেজে বসলেন। আমাদের প্রতিষ্ঠানের সমস্ত আনন্দের উৎস যেন এক দিনে শুকিয়ে গেলো। মনে হলো

যেন হঠাৎ দীপ নিবে গেছে! সরোজ জেল থেকে ফিরে এসে আর বসবার জায়গা পাচ্ছিল না। সুবোধ রায় ইতিমধ্যে নবশক্তি-সম্পাদকের স্থান দখল করে বসেছিল। সরোজ পুনর্দখল না পেয়ে হতভম্ব হয়ে গেলো, শেষটা গোসা করে রইলো দূরে। কর্তৃপক্ষ বললেন আর ঝঞ্ঝাটে দরকার নেই। ম্যানেজার দত্ত সাহেবের সহকারী তারানাথ রায়ই ঐ কাগজ অনায়াসে চালিয়ে নিতে পারবেন, সুতরাং অযথা ব্যয় বহন না করে ব্যয় সঙ্কোচ করাই ভালো। হলোও তাই। তারানাথ রায় ছিলেন রোমীয় যুগের ষাঁড়ের লড়াইয়ের পক্ষপাতী। তিনি যে স্বল্পকাল সম্পাদক রূপে দেখা দিলেন সেই সময়ের মধ্যে কল্লোল চক্রের দুই প্রথিতযশা সাহিত্যিকের মধ্যে লাগিয়ে দিলেন লড়াই। একজন প্রচ্ছন্ন থেকে অপরকে প্রকট করলেন সাহিত্যিক চোর রূপে। বিলাতী কাহিনীর ইংরেজী অংশের উদ্ধৃতির পাশে বাংলা অনুবাদ মিলিয়ে নিতে বলা হলো পাঠককে। তুমুল বাগবিতণ্ডা চললো এই নিয়ে কিছু দিন। এই অপ্রীতিকর ব্যাপারে এক পক্ষের লেখা বহন করে আনতো তখন স্ফুটনোন্মুখ সাহিত্যিক ভবানী মুখোপাধ্যায়। সে ছিল আমাদের বাংলা কাগজের দিল্লীস্থিত সংবাদদাতা। কলকাতার আবহাওয়ায় না এলে নাকি সাহিত্যিকপনা বৃদ্ধি পায় না, তাই সে কলকাতায় ছুটে আসতো প্রায়ই। আমাদের কাগজের অফিসে এলে তাকে অত্যন্ত লাজুক বলে মনে হতো। ষোল থেকে কুড়ি পর্যন্ত বয়স যাদের তাদেরকে উপেনদা অনেক সময় জিজ্ঞেস করতেন—হ্যাঁরে তুই তরুণ, না যুবক? এই ব্যঙ্গের মধ্যে এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ষোল থেকে আঠারোর মধ্যে কেউ থাকলে আমরা তাকে মারাত্মক তারুণ্যের কোঠায় ফেলে দিতাম। ভবানীর যখন এই দশা চলেছে তখন দিল্লী থেকে সে 'সাহিত্যের কমলবনে' নাম দিয়ে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখে নবশক্তিতে। এই পত্রে 'কল্লোল' ও 'শনিবারের চিঠি'র উল্লেখে তারুণ্যপ্রাপ্ত ভবানীর প্রাণের টান নাকি কল্লোলের দিকে যাওয়ায় শনিমণ্ডল হয়েছিলেন ক্ষিপ্ত। ভবানীর দুষ্টবুদ্ধি যাই থাক, তার মিষ্ট প্রকৃতির প্রতি আমরা স্বভাবতই আকৃষ্ট হয়েছিলাম। যতদূর মনে পড়ে 'নয়াদিল্লী' কথাটা চালু করেছিল ভবানীই।

ভবানী গল্প লেখা শুরু করলে, এমন কি উপন্যাসও।

এখনো ভাবতে বিস্ময় লাগে সেদিনের সেই ছোট্ট ছেলেটি কেমন করে ধীরে ধীরে আমাদের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। তার স্বচ্ছ হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতি শুভ্র যেন সে নবনী। তাই আজো তার বন্ধুত্ব অটুট।

আমাদের ভাঙন ধরেছিল অনেক দিকে। এক একটা ব্যবস্থা হয়, কিন্তু তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান হয়ে উঠি। নবশক্তির ম্যানেজার-সম্পাদক তারানাথ রায় একদিন যেমন আমাদের বিস্ময় সৃষ্টি করলেন; তেমনি তাঁকে বিস্মিত করেই আবার একদিন সরোজ রায়চৌধুরী তাঁর মসনদে পুনরায় দখলী স্বত্ব পেলো। কিন্তু সেও বেশি দিনের জন্যে নয়। সরোজ ছিল আমাদের সুভাষচন্দ্র ও কিরণশঙ্কর রায়ের অতীব স্নেহের পাত্র।

ভাগ্যচক্র অলক্ষ্যে যে-সংবাদ প্রতিষ্ঠানের মৃত্যু রচনা করে চলেছিল তার আকস্মিকতা সম্বন্ধে সচেতন না হলেও অবশ্যম্ভাবিতা সম্বন্ধে একরূপ নিঃসন্দেহ ছিল প্রায় সবাই।

এই সময় দেখেছি বাইরে থেকে এক পিওন এসে কিছু দিন লেখা দিয়ে যেতো সম্পাদক গোপাল সান্যালের হাতে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হিসাবে তা ছাপাও হতো মাঝে মাঝে। পরে জানতে পারলাম ঐ প্রবন্ধের লেখক স্বয়ং আনন্দবাজার-সম্পাদক সত্যেন মজুমদার। এটা আমাদের পক্ষে খুব গৌরবজনক না হলেও নলিনীরঞ্জনের খাতিরে তা প্রকাশ করতে হতো—যদিও সব দিন নয়। আনন্দবাজারের "দধিকর্দম" স্তম্ভের লেখক রবি মৈত্রকেও চাপানো হয়েছিল এই সময় আমাদের ঘাড়ে। ইনি স্বয়ং আসতেন আমাদের অফিসে লেখা নিয়ে। এঁকে আগেও দেখতাম কথাসাহিত্যিক পরিমল গোস্বামীর সঙ্গে সরোজের ঘরে আড্ডা দিতে। তখন পরিমল গোস্বামী সরোজের কাগজের প্রায় নিয়মিত লেখক। শুষ্ক, বিশীর্ণ পাণ্ডুর চেহারা—দেখলে মনে হতো যেন গভীর বেদনায় পরিম্লান। কিন্তু অন্তরে কোথায় ছিল তাঁর রসের গোমতী উৎস, যার ধারা বয়ে এসেছে

উত্তরকালে তাঁর রস-রচনায়। সে কথা যাক। সত্যেন মজুমদার ও রবি মৈত্রের এই ব্যাপারটা অপ্রীতিকর হলেও রবি মৈত্র তাঁর চরিত্র-মাধুর্যে আমাদের অনেককে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। রবি মৈত্র আনন্দ-বাজারের সঙ্গে প্রকাশ্য ভাবে জড়িত না হওয়ায় তাঁকে আরো সহজে আমরা গ্রহণ করতে পেরেছিলাম। সরোজ ও আমার সঙ্গে তাঁর ভাবটা জমেছিল বেশি। রবি মৈত্র প্রতিভাবান লেখক ছিলেন। 'শনিবারের চিঠি'তে তাঁর "মানময়ী গার্লস্ স্কুল" রঙ্গনাট্য পড়ে আমরা খুশি হয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা হওয়ার কিছুদিন বাদেই ঐ হাস্যরসের নাটকটি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হলো দেখে আরও খুশি হয়েছিলাম।

দরিদ্রের বন্ধু রবি মৈত্রের জীবন ছিল অনাড়ম্বর। আত্মভোলা এই মানুষটি হাসিতে খুশিতে ছিলেন সদা আনন্দময়। এক দিন মহা উৎসাহে তিনি চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন সরোজকে ও আমাকে তাঁর বাসায়। ইটালী অঞ্চলে তাঁর বাসায় সকাল আন্দাজ আটটার সময় আমরা দুই বন্ধুতে গিয়ে হাজির। রবির কিন্তু তখনো ঘুম ভাঙে নি। তাঁকে জাগিয়ে তুলতেই বললেন—ওঃ কাল রাত্তিরে ভাই, ঘুম হয় নি ভালো। অতিথি-অভ্যাগতের প্রতি তাঁর এরূপ নিরাসক্তি দেখে ভয় হলো। চায়ের নেমন্তন্নটা কি তা হলে মাঠে মারা যাবে নাকি! রবি ছাড়া আর বিশেষ কাউকে তো চোখে পড়ে না। নিজেরাই তোড়জোড় করে নেবো নাকি নেমন্তন্নের পালাটা শেষ করে? দু'জনে যুক্তি করছিলাম।

ভুলুয়া! ভুলুয়া!—ব্যস্ত হয়ে রবি হাঁক দিলেন।

একটা পরিচারক তা হলে আছে বোধ হচ্ছে।

ঘরের ওধারটার এক কোণে রবি ছুটে যেতে আমরা তাঁর অনুসরণ করলাম। দেখলাম এক ব্যক্তি উনুন ধরিয়েছে, সেই ভুলুয়া। উনুনটা জ্বলেও উঠেছিল।

এই! জল বসিয়ে দে।—বলেই রবি একটা হিন্দুস্থানী লোটা ভুলুয়ার দিকে এগিয়ে দিলেন। রবি নিজেই কিংবা তাঁর পরিবারের কোন ব্যক্তি হরিদ্বারে তীর্থযাত্রায় গিয়ে লোটাটি সেখান থেকে সংগ্রহ

করেছিলেন কি না জানি না, এ বিষয়ে তাঁকে কোন প্রশ্ন অবিশ্যি করি নি।

অতঃপর রবি আমাদের দু'জনকে নিয়ে এসে বসালেন তাঁর বৈঠকখানায়। বৈঠকখানা মানে তাঁর শোবার ঘরের পাশে একফালি ঘর; সেখানে দুটো বেঁটে আলমারি আর খান দুই ভাঙা চেয়ার; আলমারিতে দেখলাম ঠাসা বই, দামী বইও কিছু ছিল।

দুইটি মূল্যবান চেয়ার আমরা দখল করে বসলাম। রবি এসে বসলেন আমাদের পাশেই একটা ছোট টুল নিয়ে। বলা বাহুল্য, এই দুই ভাঙা চেয়ারের সামনে একটি টিপয় বসানো ছিল। টিপয়টি রবি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন তাও জানি না। এটি ছিল খোদ মোরাদাবাদ মার্কা আর তার উপরকার থালার পরিধি এতখানি যে দশ জন লোক বৃত্তাকারে বসে তাতে চায়ের পেয়ালা বসিয়ে আরামে চা পান করতে পারে।

রবি সোৎসাহে গল্প শুরু করে দিলেন। আমাদের অস্বস্তি ও আশঙ্কার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ তাঁর ছিল না। মানময়ী গার্লস স্কুলের অভিনয়, চটকলের মজুরদের দুরবস্থার কথা এবং এমনি আরো কত কি। পাশের ঘরটার মেঝের উপর একটা ছেঁড়া মাদুর ও আধ-ময়লা বালিশ চোখে পড়ছিল। সমস্তটা মিলিয়ে আমরা রবির ঐশ্বর্যের তারিফ করছিলাম।

খানিক বাদেই ভুলুয়া তিনটি কলাই-করা মগ নিয়ে এসে আমাদের সামনে সেই ধূলিধূসর মোরাদাবাদ-মার্কা টিপয়ের উপর বসিয়ে দিলে। হরিদ্বার-মার্কা লোটার ভিতরই চায়ের পাতা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তা থেকে আমাদের চায়ের পেয়ালায় চা বর্ষিত হলো। মগরূপী পেয়ালার কোন কোন অংশের কলাই ছুটে গিয়ে ভিতর থেকে আত্মপ্রকাশ করছিল কালোবরণ লোহা।

একখানা রেকাবিতে গণ্ডা দুই লেড়ে বিস্কুট সাজিয়ে এনেছিল ভুলুয়া। রবি টুপ করে তা থেকে একখানা বিস্কুট তুলে নিয়ে তাঁর মগের ভিতর ছেড়ে দিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন—খাও, চমৎকার লাগে।

এমন অবলীলায় তিনি বললেন এই কথাগুলি যে, কোনরূপ প্রতিবাদ করবার সাহস হয়নি তখন যদিও আমাদের চিত্ত চমৎকার হয়েছিল। এই

পালা কতক্ষণে সাঙ্গ হবে তাই ভাবছিলাম মনে মনে। এমন রাজকীয় চা-পান জীবনে আর কখনো হয়নি। এই নেমন্তন্নের বিষয়ে যদি ঘুণাক্ষরেও টের পেতাম আগে তবে কি আর এ অঞ্চলে পা বাড়াই!

রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে সেদিন রবির শ্রাদ্ধ করেছিলাম দুই বন্ধুতে। প্রথমেই আমাদের মুখ থেকে যুগপৎ বেরিয়ে এসেছিল এই মন্তব্য—থার্ডক্লাশ!

রবির প্রথম গল্পের বই "থার্ডক্লাশ" তখন বাজারে বেশ চালু হয়ে লেখকের খ্যাতি ছড়িয়েছিল। নামটা তাই সহজে মুখে এসেছিল মন্তব্য রূপে।

কিন্তু রবি ছিলেন এই সব নিন্দা-প্রশংসার উর্ধ্বে। তিনি আপনার চার দিকে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে তার মধ্যে আত্মসমাহিত হয়ে থাকতেন যে, সেটা চোখে পড়তো না সহজে।

সেদিন আমাদের চা-পানের ঈপ্সিত বিলাস এমন দৈন্যে পর্যবসিত হলো বলে মুখে দুঃখ করলাম বটে, কিন্তু ঘরে ফিরে এক শান্ত মুহূর্তে মনের পর্দায় দেখতে পেলাম রবির এক ছবি—উসকো খুসকো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল; লোকটির দ্বিধাবিভক্ত মনের এক অংশ যেন একরাশ অসংলগ্নতার মধ্যে ছড়ানো, আর অপর অংশ যেন প্রশান্ত, নিশ্চল। হঠাৎ দেখলে লোকটিকে পাগ্‌লাটে বলে বোধ হওয়াটা নিতান্ত অস্বাভাবিক ছিল না। বাইরের কর্মব্যস্ততার মধ্যে থেকেও তাঁর উদাস, নিরাসক্ত মন এমন একটি কেন্দ্র আশ্রয় করে থাকতো যেখানকার স্বচ্ছতা কখনো মলিন হবার নয়।

রবির এই চরিত্রের মাধুর্য ধীরে ধীরে প্রকট হয়েছিল আমাদের কাছে। পরে জানতে পেরেছিলাম বহু দরিদ্রের তিনি ছিলেন বন্ধু। তাঁর উপার্জিত অর্থের অনেকাংশই যেতো দুঃস্থদের দুঃখমোচনে!

আমাদের চায়ের আসরের পরে বেশি দিন কাটে নি। অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় এক দিন বর্ষিত হলো রবির মৃত্যু-সংবাদ। স্তব্ধ হয়ে ছিলাম কিছুকাল। সদ্য মধুর স্মৃতিতে ঘেরা এই বন্ধুর সরল খেয়াল-খুশির মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে একটা গভীর বেদনা-বোধের সঙ্গেও পেয়েছিলাম দূর কোন এক রাজ্যের একটা অনাস্বাদিত সুরের রেশ।

ভাগ্যের এমনি বিড়ম্বনা, শেষটায় আমাকেই করতে হয়েছিল "বঙ্গবাণী"র সম্পাদকীয় স্তম্ভে রবির স্মৃতি-তর্পণ।

লেখাটা এখন হয়েছে যেন দায় সারা। স্তূপীকৃত টেলিগ্রামের রাশির মধ্যে কত দেশের কত বিচিত্র জীবন-ধারা আঁকা-বাঁকা পথ ধরে গেছে; সেই সব পথ আবিষ্কার করবার আনন্দ এক দিন ছিল প্রচুর। এখন আনন্দের বদলে এসেছে বিরক্তি। গতানুগতিক ভাবে শুষ্ক কর্তব্যের বোঝাটা বহন করি কোন ক্রমে।

কাজ এক দিন ছিল, তার সঙ্গে অকাজও ছিল তেমনি। অকাজের ভিতর দিয়েও আসতো কাজে নতুনতর প্রেরণা; তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি এখন। উপেন বাঁড়ুজ্যের কথা ছেড়েই দিলাম। শৃঙ্গার রসের রসিক চপলাকান্তও নেই যে দুটো সংস্কৃত শ্লোক শুনি; বিজয়লাল নেই, সুতরাং কে আর আমাদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে দিয়ে ঘুরপাক খাইয়ে স্বাস্থ্যচর্চা করাবে? মাঝে মাঝে দু'চার জন ছুটে যেতাম খেলার মাঠে। এই রকম গেছি এক দিন। সেদিন প্রেমেনও ছিল আমাদের সঙ্গে। খেলার মাঠে দুই যুধ্যমান দলের কোন একটির পক্ষ কখন কে অলক্ষ্যে নিয়ে ফেলে তা বলা শক্ত। সেখানে গিয়ে নিরপেক্ষ কেউ থাকে কিনা বলতে পারি না। সেদিন প্রেমেন যে দলের পক্ষ নিয়েছিল সেই দলের খেলা সেদিন চমৎকার হওয়া সত্ত্বেও এমনি দুর্ভাগ্য যে, বার বার গোল দেওয়ার সুযোগ পেয়েও তাঁরা কেমন যেন বানচাল করে ফেলছিলেন ঠিক গোলের মুখটাতে গিয়ে। প্রেমেনের আর্ত কণ্ঠের বিকৃত আফ্‌শোষ ধ্বনি সেদিন শোনা গিয়েছিল বারম্বার। খেলা শেষ হতে বোধ হয় তখন আর মিনিট দুই বাকি; এমন সময় ঐ দলের বল এসে লুটোপুটি খাচ্ছিল বিপক্ষ দলের গোলের মুখে; প্রেমেন আর আত্মসম্বরণ করতে পারে নি। মুখে তার একটা আর্তনাদ শোনা গেলো—অ—র্—র্—র্—ই—জ্—জ্—জাঃ! আমাদের সঙ্গ ছেড়ে প্রেমেন একেবারে মাঠের মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। আমাদের কাছে সে ফিরে এলে যখন সব একসঙ্গে আবার অফিস অভিমুখে যাত্রা করছি, এমন সময় হঠাৎ তার মুখে করুণ

আওয়াজ শোনা গেলো—ওইজ-জাঃ! আমার ওয়াটারপ্রুফ! এইবার সে আত্ম-সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে।

মাঠ শূন্য হয়ে গেলো। সেই সঙ্গে ওয়াটাপ্রুফও শূন্যে মিলিয়ে গেছে। দোদুল্যমান ওয়াটারপ্রুফটি কাঁধে বহন করেই সে ছুটে গিয়েছিল মাঠের মধ্যে। কখন তা স্খলিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেছে তা সে টের পায়নি—পাবার কথাও নয়, এমন অবস্থায় কারই বা খেয়াল থাকে?

প্রেমেনের এই মূল্যবান বর্ষাতি হারাবার করুণ সংবাদটি শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত হয়েছিল প্রেমেনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্যে নয়, রসের খোরাক হিসাবে।

এখানে আসবার পর বছরখানেক কেটে গেছে, তখন এক দিন শুনলাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর শরৎ বোস আর পেরে উঠছেন না এই শ্বেতহস্তির খোরাক জোগাতে। তাঁর নিজস্ব আয় থেকে প্রায় সত্তর হাজার টাকা ঢেলেও আর তিনি একে চাঙ্গা করে তুলতে পারছিলেন না। দুর্দিন হলেও কাগজের চাহিদা দেখে ধরতে পারতাম না কোথায় আমাদের গলদ! দত্ত সাহেব ও তারানাথ রায় আমাদের কাগজের প্রচারসংখ্যা কেবলই কমাতে পরামর্শ দিতে থাকেন, কেননা তাঁদের মতে কাগজ বেশি বিক্রি হলেই ক্ষতির পরিমাণ বেশি। মাত্র দু'পয়সা ছিল আমাদের বাংলা কাগজের দাম। কাগজ বিক্রির দাম আর কতটুকু? আসল দাম যাঁরা দেবেন অর্থাৎ সেই বিজ্ঞাপন-দাতারা তাঁরা ক্রমে ক্রমে হাত গুটিয়ে আনছিলেন। আমাদের অপরাধ কোথায়,' তা ধরবার ক্ষমতা আমাদের ছিল না। শরৎ বোস হাল ছেড়ে দিলেন নলিনীরঞ্জনের হাতে।

নলিনীরঞ্জন সুচতুর লোক। পাকা ব্যবসাদারী বুদ্ধিতে তিনি অত বড় হয়ে উঠেছেন। আদর্শের খেয়ালে সর্বস্বান্ত হবার দুর্বুদ্ধি তাঁর ছিল না সুতরাং ব্যবসাবুদ্ধি জলাঞ্জলি দিতে তিনি রাজি হন নি। কিছুকাল হাল ধরে তিনি বুঝতে পারলেন নৌকা ফুটা হয়েছে, সলিল-সমাধি হবার পূর্বেই তিনি তাই ছেড়ে দিলেন হাল।

অতঃপর এলেন বিধানচন্দ্র রায়। নিদানে যদি কিছু বিধান দিতে

পারেন তিনি—এই ছিল আমাদের আশা। বিধান রায় যদি সমস্ত ব্যাপারের কর্তৃত্ব স্বয়ং নিতেন তবে কি হতো বলা যায় না। কিন্তু তাঁর সে সময় কই? আর প্রবৃত্তিও ছিল না। কাজেই তাঁর হয়ে দেখা দিতে লাগলেন তাঁর দুই অগ্রজ সাধন রায় আর সুবোধ রায়—এক জন এঞ্জিনিয়ার, অপর জন ব্যারিস্টার। আরো এক জনের আগমন হতে লাগলো এ সময় ঘন ঘন—তিনি ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত। প্রথম মহাযুদ্ধে ডাক্তার হয়ে সেবাকার্য করায় ইংরেজের দেওয়া পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন—ক্যাপ্টেন। যুদ্ধের পর আর ডাক্তারি করেন নি, কিন্তু ক্যাপ্টেনগিরিও ছাড়েন নি। 'বেঙ্গল ইমিউনিটি' নামে একটা বড় ওষুধের কারখানা গড়ে তোলায় তাঁর কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছিল এবং এই জন্যেই তিনি হয়েছিলেন বিধান রায়ের প্রিয়পাত্র। তিনি তাঁর বেঙ্গল ইমিউনিটির টীম নিয়ে এসে নানারকম সদুপদেশ দিতে লাগলেন। দুই অগ্রজের সঙ্গে ক্যাপ্টেন এবং তাঁর-টীম। অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট—এই প্রবাদ বাক্যের নির্মম সত্যতা উপলব্ধি করতে লাগলাম দিনের পর দিন।

বিধান রায় কর্ণধার হবার পর স্বয়ং কিছুদিন এলেন বিকালের দিকটায়। নলিনীরঞ্জনকেও তিনি সঙ্গে করে আনতেন। কিছুক্ষণের জন্যে গুরুগম্ভীর স্বরে চারি দিক প্রকম্পিত করে তিনি চলে যেতেন। তারপর তাঁর আগমনও বিরল হয়ে এলো।

সুবোধ রায় ব্যারিস্টার সুতরাং তাঁর লেখবার অধিকার আছে নিশ্চয়; সেই অধিকার বলে তিনিও সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা শুরু করলেন। ইংরেজী কাগজে সুপার-এডিটরের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো। আমাদের বাংলা কাগজেও এক সুপার-এডিটরের লেখা আসতো পিত্তন মারফত সে কথা আগেই বলেছি।

যাক সে কথা। ওদিকে বিজ্ঞাপন বৃদ্ধির জন্যে অগ্রজেরা "ইণ্ডাষ্ট্রি ডেভেলপমেণ্ট" না কি যেন ঐ রকম একটা কোম্পানী করে তার মারফত আমাদের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করবার চেষ্টা করলেন প্রাণপণে। ডেভেলপ্‌মেণ্ট কোন্ দিকে হলো তা বুঝতে পারলাম না। তবে আমরা যে একদম কৃশ

হয়ে নাভিশ্বাস ছাড়তে লাগলাম তা বিচক্ষণ ডাক্তার বিধান রায় বুঝতে পারলেন। তিনিও অনেক টাকা ঢেলেছিলেন। শেষটায় রোগীর আর বাঁচার আশা না দেখে তিনি গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দিলেন।

আমাদের সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের আয়ু শেষ হয়ে গেলো ১৯৩৩ সালে।

ফরওয়ার্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বয়ং হয়েছিলেন তার সারথি; তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন তাঁর পঞ্চ শিষ্য বাংলার পঞ্চপাণ্ডব। দেশবন্ধুর মৃত্যুর আট বৎসর পরে এই কোম্পানীর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটলো।

এই কয়েক বৎসরে সংবাদপত্র সম্পাদনায়ই কেবল যে নবতর নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল তা নয়; সংগঠন ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল একটা ব্যাপকতর সংযোগ। এই সংযোগ সাধনের প্রায় ষোল আনা কৃতিত্বই ছিল সুভাষচন্দ্রের। সুভাষচন্দ্রই ফরওয়ার্ড প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব মহাদেশ ছাড়িয়ে পশ্চিম মহাদেশে পরিচিত করেছিলেন। তাঁর সংগঠন-সৌষ্ঠবের ধারাটি ছিল সত্যই অননুকরণীয়।

আমাদের সাংবাদিক জীবনে পঞ্চপাণ্ডবের এক পাণ্ডবের শুধু ছবি দেখেছি, চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য খুব কমই হয়েছিল। তিনি নির্মলচন্দ্র। তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে আলবোলার নল মুখে পূরে ধূমপান করছেন তিনি—এ ছবি ছিল তখনকার দিনে সকলের পরিচিত। ধূমায়মান কল্পনায় তিনি যে রাজ্যে বিলাস-ভ্রমণে যেতেন সে রাজ্য থেকে কোলাহলমুখর রাজ্যে ফিরে আসতে বোধ করি তিনি পীড়িত হতেন। কাজেই তিনি ছিলেন আমাদের কাছে দুর্লভ। অনেকে তাঁকে বলতেন আলবোলা-রাজ।

বাকি চার জনকে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের কিছু কিছু হয়েছিল; এঁদের মধ্যে শরৎ বোস ছিলেন প্রথিতযশা ব্যারিস্টার। অতি সূক্ষ্ম আইনের মধ্যে সূক্ষ্মতর আইনের ফাঁকে আশ্রয় নিয়ে প্রখর বুদ্ধি ও প্রচণ্ড বাগ্মিতার জোরে তিনি প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে জানতেন। কিন্তু সাধারণ কথাবার্তায় তাঁর এই অসাধারণত্ব ধরা পড়তো না। বরং মনে করা স্বাভাবিক ছিল যে,

লোকটি দাম্ভিক এবং তাঁর ভারী চেহারার মতো বুদ্ধিটাও বুঝি বা ভারী। একটা বিষয়ে আত্মপ্রত্যয় হলে তার অন্ত দেখবার প্রবৃত্তি তাঁর হতো প্রবল। এক্ষেত্রে যাকে বলে এক বগগা তিনি ছিলেন তাই। খাঁটি বিলাতী ধরনের পোষাকে বিলাতী চাল-চলনের আড়ালে বসে থাকতো একটি দেশী মন যা ছিল 'মা ভবানী'র উপাসক, যা পাকা মোটর-বিলাসী ব্যারিস্টারকে টেনে নিয়ে যেতো নেবুতলাবাসী উড়িয়া জ্যোতিষীর কাছে ভাগ্যগণনায়।

মামা বি. এন. ডাটের সাম্‌নে ভাগ্‌নে শরৎ বোসকে যেদিন অবলীলায়, অসঙ্কোচে বর্মা চুরুটের ধোঁয়া ছাড়তে দেখলাম সেদিন গ্রাম্য, অনভ্যস্ত মনে বিস্ময় জেগেছিল। বিলাত-ফেরতা সমাজে এই চালের যে চলন ছিল, তা তখন জানতাম না। সেদিন শরৎ বোসের ছিল দিলখুশ্‌। সেই দিনই তিনি মামাকে দিয়েছিলেন 'বি-এন-জি-এস' রূপী অভিনব উপাধিটি। ভারী লোকটিও মাঝে মাঝে হাল্‌কা হতে পারতেন।

মনে আছে একবার আমার ছেলের অসুখ হলে ছুটির দরখাস্ত করেছিলাম। ম্যানেজিং ডিরেক্টর শরৎ বোস সেই দরখাস্তখানি না-মঞ্জুর করেছিলেন এই মন্তব্য করে—**Son's illness is not the just cause for which leave should be granted.** পোড়া কপাল! তখন কি ছাই জানতাম যে, একমাত্র সহধর্মিণী ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন আত্মীয় থাকতে নেই! এ-হেন সাহেবী মেজাজের লোকেরও যে বিরাট হৃদয় ছিল তার বহু প্রমাণ পেয়েছিলাম। বহু দুঃস্থ লোকের দুঃখে তাঁর হৃদয় বিগলিত হতে দেখেছি। গোপনে তিনি মাসিক সাহায্য করতেন অনেককে।

রাশ-ভারী, গুরু-গম্ভীর লোক বিধান রায়। ঘরে এসে ঢুকলে মনে হতো যেন ঝড় বয়ে গেলো। অনেক সময় আসতেন নলিনীরঞ্জনকে সঙ্গে করে।

নলিনীরঞ্জন হয়তো সম্পাদকদের ঘরে। বিধান রায়ের ইচ্ছা নীচে একবার ছাপাখানা পরিদর্শন করবেন। সিঁড়ির মুখটায় এসে বজ্রনাদ ছাড়লেন—"নলিনী! নলিনী!" শশক-শিশুর মতো নলিনী চম্‌কে উঠলেন!

দীর্ঘাকৃতি লোকটির ঠোঁটে একটা কাঠিন্য বঙ্কিম রেখায় দৃঢ়তা ধরে রাখতো, তা সহজে নমনীয় হতে দেখা যেতো না।

বিধান রায়ের মুখে 'আপনি' সম্বোধন শুনেছি বলে তো মনে পড়ে না। লোকটি যেন জন্মেছেন আদেশ করতে, আদেশ পালন করতে নয়।

এক সময়ে পাঁচটি লোকের সঙ্গে পাঁচ রকম প্রসঙ্গ তুলে অসাধারণ সঙ্গতি রক্ষা করে চলতে দেখেছি বিধান রায়কে! প্রবল স্মৃতিশক্তির সঙ্গে বুদ্ধির প্রাখর্য মিলে তাঁকে সহজেই স্বতন্ত্র করে ধরতো আর দশ জনের কাছ থেকে। বয়সের তুলনায় উদ্যম ছাড়িয়ে যেতো অনেক সময়। ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে যাঁরা তাঁকে জেনারেল সেক্রেটারীরূপে দেখেছেন তাঁদের কাছে মনে হয়েছে বিধান রায় বুঝি বা সাগর সাঁত্‌রে পার হতে পারেন।

সুচতুর, অধ্যবসায়ী, উচ্চাভিলাষী নলিনীরঞ্জন প্রচ্ছন্ন হলেও হয়েছিলেন প্রখ্যাত। অর্থশালী হবার আধুনিক অর্থনীতিতে তিনি পরিপক্ক হয়েছিলেন নিজের জীবনে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা দ্বারা।

আলাপে, আলোচনায় বা সংলাপে তাঁর বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ধরা পড়তো না তেমন, অথচ তিনি যে বুদ্ধিমান তার প্রমাণ দিয়েছেন ভূরি ভূরি।

জীবনের প্রায় সবটাই কাটালেন এই খাশ্‌ কলকাতা শহরে তথাপি তাঁর আঞ্চলিক ভাষাকে ত্যাগ করেন নি কোন দিন—লজ্জার খাতিরেও নয়। পূর্বাঞ্চলের কোন যুবক চাকরির উমেদারি করছিলেন তাঁর সাহায্যে। যথাস্থানে বারম্বার হাঁটাহাঁটি করে ব্যর্থ হয়ে যুবকটি আবার ধরলেন নলিনীরঞ্জনকে—আপনি যদি একটু ভালো কইর‍্যা কইয়্যা দ্যান্‌ ত্যা স্যান্‌। —(অর্থাৎ আপনি যদি একটু ভালো করে বলে দেন তবে না।)

নলিনীরঞ্জনের জবাব হলো—হঃ! দ্যাম্‌নে একটা কড়া কইর‍্যা টেলিফোনোৎ।—(অর্থাৎ আচ্ছা টেলিফোনে একটু জোর করে বলে দেবো'খন।)

বৃটিশের আমলে কংগ্রেসের এক জন বড় সেবক হয়েও সরকারী কর্তৃপক্ষকে তিনি দূরে ঠেলে দেন নি কখনো। শত্রু-মিত্রের মধ্যে তাঁর ছিল সমভাব অর্থাৎ তাঁকে ত্যাগ করতে পারতো না কেউ। মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় বলে লর্ড উইলিংডন তাঁকে ফেলতে পারতেন না। এই যে শত্রু-মিত্রের কাছে সমান প্রিয় হওয়া তার ফরমূলা ছিল তাঁর নিজস্ব।

কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হয়েও সেই কংগ্রেসের ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েছিলেন আবার সুকৌশলে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির যথাযথ প্রয়োগ তিনি করতেও জানতেন।

যেমন—দেশবন্ধুর আমলে স্বরাজ দলের প্রথম নির্বাচন প্রতিযোগিতার কথা ধরা যাক। বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন সেবার। দেশবন্ধুর এই প্রিয় পাণ্ডব দাঁড়ালেন স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর পুত্র এস, এম, বোসের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তাঁর নিজস্ব কেন্দ্র থেকে। সভা-সমিতি করে বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে ভোট আহরণের ব্যবস্থা তিনি করেন নি। গুটিকয়েক ঘাঁটি তিনি বেছে নিয়ে খাঁটি দাওয়াই প্রয়োগ করে চমৎকার ফল পেয়েছিলেন। গেলেন এক প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ জোদ্দারের বাড়িতে, এইখানে ছিল তাঁর আশঙ্কা; কারণ, অনেকগুলি ভোট ছিল এই ব্যক্তির হাতে। কলকাতা থেকে এক দেশমান্য ব্যক্তি গেছেন মফঃস্বলে। এ সব ক্ষেত্রে যেমন হয়—বাড়ির ভিতর পড়ে গেলো সাড়া। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের দল ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো। এমন কি বাড়ির মেয়েরাও দেখতে লাগলেন ঘুলঘুলি দিয়ে এই ধনী নবাগতকে। সকলেরই ঔৎসুক্য সমান।

বৈঠকখানায় আগন্তুককে অভ্যর্থনার জন্যে বাড়ির মালিক স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আগন্তুক নগ্নপদে ঘরে প্রবেশ করে একটি টুল টেনে নিয়ে বসে পড়লেন তারই উপর।

আগন্তুকের কাণ্ড দেখে বাড়ির কর্তা লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। তিনি বারম্বার আগন্তুককে চেয়ারে আসন পরিগ্রহ করতে অনুরোধ করলেন।

বাড়ির কর্তার সামনে তিনি বসবেন চেয়ারে? আগন্তুক একথা ভাবতেও পারেন না—এমনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

—হ্যা কি কর্তা, আপনি ব্রাহ্মণ, বর্ণশ্রেষ্ঠ; আমি তো আপনার চরণের ধূলা; আপনি থাকতে...আগন্তুক কর্তার চরণের ধূলি আগেই নিয়ে প্রথমে জিহ্বাগ্রে ও পরে শিরোপরি গ্রহণ করেছিলেন। কর্তা থাকতে তিনি বসবেন চেয়ারে, একি হয়!

শিশুরা যারা আগন্তুকের দিকে উৎসুক নয়নে চেয়েছিল তাদের পরিচয় নিয়ে আগন্তুক জানতে পারলেন কেউ বা কর্তার নাতি, কেউ বা কর্তার ভাইপো আর কেউ বা কর্তার আর কেউ। আগন্তুক এক এক জনের পরিচয় পান আর অমনি তার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় বিলেপন করেন।

কর্তা হাঁ হাঁ করে চীৎকার করে ওঠেন। ঐ পোলাপানদের পায়ের ধুলো! আগন্তুকের কি মাথা খারাপ হয়েছে নাকি? না, তাঁর মাথা খারাপ আদৌ হয়নি। তিনি পরিষ্কার মাথায়ই এই সব অভিনয় করে যাচ্ছিলেন।

কর্তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—হেইডা কি কন কর্তা! ছুটো হাপ্‌ও হাপ্‌।—(অর্থাৎ সে কি কথা কর্তা, সাপের বাচ্চা সাপই) আগন্তুক যা বললেন তার চূড়ান্ত অর্থ হলো এই যে, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণই সুতরাং যত ক্ষুদ্রই হোক সে নমস্য।

তৃণাদপি সুনীচেন এ-হেন ব্যক্তির সেবার যে নির্বাচনে জয়লাভ হয়েছিল একথা বলাই বাহুল্য।

লজ্জা, নিন্দা, ভয়, নলিনীবাবু কোন দিন গায়ে মাখেন নি। উত্তুঙ্গ বাধাকে তুচ্ছ করে তিনি দাঁড়াতে জানতেন জনসাধারণের কাছে অকুতোভয়ে।

আর একটি গুণ দেখেছি নলিনী সরকারের। বহু গুণী ব্যক্তিকে তিনি পোষণ করতেন নিজের প্রয়োজনে। গুণী ব্যক্তি শত্রু হলে তাঁকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা হতো তাঁর আরো প্রবল।

নলিনী সরকারের মূল্যবান মত বলে বাজারে যা প্রচলিত হতো, তার বাহ্যরূপ অপরের হাতে ফুটলেও তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা যে তাঁরই দ্বারা হতো এটা নিঃসন্দেহ।

তুলসী গোঁসাইয়ের আগম-নিগম হতো নিঃশব্দে আর বোধ হয় খুবই বিরল। মৃদু মিষ্টভাষী হলেও তিনি ছিলেন স্বল্পভাষী। তখনকার দিনে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে স্বরাজ দলের সভ্যরূপে পণ্ডিত মতিলাল ও তিনি যে বিতর্কের উত্তরে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করতেন তা হতো পরম উপভোগ্য।

একান্ত সান্নিধ্যে এই নিরীহ ব্যক্তিটির যে রূপ দেখেছি তাতে তাঁর যোদ্ধরূপ কিন্তু কল্পনা করতে পারিনি।

আমাদের টেবিল উল্টে যাবার আগে বিলাতে বার বার তিন বার গোল টেবিলের বৈঠক বসেছিল। গান্ধীজী গেলেন যেবার, সেবার সারা দুনিয়ায় সাড়া পড়েছে। কত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রিপোর্টার তাঁর সহযাত্রী হলো নিত্যকর্ম-পদ্ধতির যথাযথ বিবরণ দিতে। বিরল-পরিচ্ছদ, তুহিন-শীতল দেশের এই যাত্রীর ক্রিয়া-কলাপ জানবার কৌতূহল কার না হয়? দেশী-বিদেশী, ধনী-নির্ধন, বড়-ছোট, সবারই কৌতূহল ছিল সমান দুর্নিবার। তুলসী গোঁসাইকে এই সময় আসতে দেখেছি প্রায় নিত্য।

সেদিন ছিল রবিবার। আমাদের ইংরাজী দৈনিকের সহকর্মীদের ছুটি সেদিন। আমাদের বাংলা বিভাগে সেদিন বিলাতী রয়টারের তারগুলি ছিল আমার হাতে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেগুলির সদ্ব্যবহার করছিলাম। ইতিমধ্যে প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড সাহেবের বিপক্ষ দলের সভ্য মিঃ চার্চিল গান্ধীজীকে নব বিশেষণে বিশেষিত করেছিলেন—"**Half naked seditious Fakir**"—(অর্ধনগ্ন রাজদ্রোহী) এবং বোধ করি এই নেংটা ফকিরের লণ্ডনে অশুভগমনের পূর্বেই তিনি লণ্ডন ছেড়ে পালিয়েছিলেন অন্যত্র। খবরটা বেশ জমে উঠেছিল, কাজেই ঘটনার পারম্পর্যের দিকে ঔৎসুক্য হওয়া স্বাভাবিক। তুলসী গোঁসাই কখন এসে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে বসেছিলেন তা লক্ষ্য করি নি। তিনি সতৃষ্ণ নয়নে আমার হাতে টেলিগ্রাম গুচ্ছের দিকে চেয়েছিলেন। এক গোছা শেষ হতেই সেগুলি টেবিলের উপর রেখে আমি অপর গোছায় হাত দিয়েছি এমন সময় তিনি ওঘর থেকে উঠে এসে আমার কাছে দাঁড়িয়ে অতি বিনীত ভাবে বললেন—আমি এগুলি দেখতে পারি কি? আপনার হলে আমি বাকিগুলো নিয়ে যাবো, কেমন?

আমিও বিনীত ভাবে সম্মতি জানালাম। আমাদেরই একজন কর্তার এই রকম নমনীয় ভাব দেখে সঙ্কুচিত হলেও খুশি হয়েছিলাম। ধনীর দুলাল, বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারীর এইরূপ বিনয় অন্তত আমার কাছে তখন অসাধারণ বলে বোধ হয়েছিল।

ইংরাজী প্রবন্ধে তাঁর চিন্তাশীল মনের ঋজু ভাবপ্রকাশের পরিচয় মিলতো মাঝে মাঝে। তিনি আমাদের ইংরাজী দৈনিকে স্বনামে প্রবন্ধ লিখতেন। এ-হেন বিনয়ী, শিক্ষিত, চিন্তাশীল ব্যক্তির "রোলস্‌রইস্‌" কেন যে সোজা পথ ছেড়ে উদ্দাম গতিতে বিপথগামী হয়ে যেতো তা বুঝতে পারতাম না।

আবার ভেসে চলেছি। কোথাও কূল-কিনারা নেই। যৌবনের আদর্শ-মত্ততায় একটি কূল আশ্রয় করেছিলাম পরম নিশ্চিন্ত মনে। পিছনে তাকাবার অবসর ছিল না; সামনে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনার বিচিত্র ছবির কল্পনায় বিভোর হয়ে ছিলাম। একটা প্রচণ্ড ঝড় ক্রমে কূলে আঘাত করে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো সব জলে!

এই বিপর্যয়ের তাড়নায় অকূলে পড়েও ভেবেছি অতীত দিনের কথা। ছায়াচিত্রের ছবির ন্যায় বিদ্যুৎবেগে এসেছে আমারে। মনের পর্দায় কত ছবি। কেন এমন হলো? ন্যায়-শাস্ত্রের কার্য-কারণ সম্পর্কের কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু আলোড়িত মনের শক্তি ছিল না সে সম্পর্ক তখন আবিষ্কার করা।

তারপর শান্ত, নিশ্চল মুহূর্তে একদিন পেয়েছি এই বিপর্যয়ের হেতু। হয়তো এইটাই একমাত্র হেতু নয় তবু এটা যে প্রধান সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

হেতুটির সূত্র ধরে পেয়েছিলাম একখানি মূল্যবান চিঠি যা তখনকার দিনের বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতার রাজনৈতিক মত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে ধরেছে! চিঠিখানি লিখেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর স্নেহভাজন বাংলার পঞ্চপাণ্ডবের এক পাণ্ডবের কাছে তাঁর মৃত্যুর ঠিক পাঁচ দিন আগে। চিঠিখানি এই—

Step Aside, Darjeeling
11. 6. 25

Dear Nalini,

I was thinking of sending for you for giving you some suggestions about our work—you have probably heard from

Protap. But you need not come here just now as I see from the papers that Satkari has called a meeting of B. P. C. C. to consider the Faridpur resolution. This is most important and you must strain every nerve to have the Faridpur resolution passed in the B. P. C. C. I want you, Satkari, Kiron and everybody to see that we get an overwhelming majority. This you can easily do if you work from beforehand. Necessary expenses must be met. I offer the following suggestions :—

(1) Send for Satish Chakravorty from Mymensing or wherever he may be and work the Mymensingh group through him. He is a clever man and probably he will succeed in influencing the others.

(2) Work Sarat Chatterjee of Howrah through Nirmal and you will most probably get the Howrah members to side with us.

(3) If necessasy, work through Monoranjan of Dacca and you will get Mohini and others of Dacca. Kiran can manage this if he exerts himself. The rest of the Dacca members Srish may influence. If you try you can get Srish to do this.

(4) Find out some way of getting Dinajpur and Rajshahi — my idea is they are against us. But if steps are taken at once you may succeed.

Show this letter to Satkari, Kiron and Protap and no one else. You must sit together and manage the whole thing.

Possibly you don't realise the importance of this but trust to me. Every attempt should be made to keep Gandhi with us—any breach between Mahatma and ourselves will be fatal to the programme of both parties.

I have read the article in the *London Times* on my Faridpur speech. The short summary which was published in Indian Newspapers was misleading I take the *Times* article to be very helpful. My reading of the whole situation is :—

(1) They are willing to let off the political prisoners.

(2) They cannot afford to say that they will alter the Act before 1929, but they are willing to extend the reforms by excercising the powers without the Act. If we know how to play our cards well we can get practically provincial autonomy without altering the Act.

(3) Reading will send for some of us in England and and if my workable plan can be carried out some of us may be sent for to discuss the whole situation in England.

(4) If the above course is not adopted they will order a dissolution of the legislative bodies and if some of this country back up the Swaraj Party and if the result is favourable to us then the above course will be adopted.

The situation is big with fate. Our position is that we have said our last word. The onus is on the Government now.

I will offer no further statement or explanation, you people should watch the press and only correct misstatements, if serious.

Our defeat in the B. P C. C. will ruin the whole thing.

I expect money to-morrow as you say in your wire. That will do. I hope you are keeping all right. With love to you.

Yours affly,

C. R. Das*

গান্ধীজীর নীতি ছিল বিদেশী শাসকদের সঙ্গে সর্বতোভাবে অসহযোগ করা। এই অসহযোগ আন্দোলন বছর তিনেক ধরে চলবার পর জনসাধারণের মনে যখন এসেছে নৈরাশ্য সেই সময় দেশবন্ধু পণ্ডিত মতিলালের সহায়তায় অসহযোগেও আনলেন এক বৈচিত্র্য—তাঁদের আশা ছিল তাঁদের অনুসৃত পন্থায় লোকের মনে আবার ফিরে আসবে উদ্দীপনা। আমাদের শাসকবর্গের মনে স্বরাজ দলের নব-নীতির ফলে যখন বিরক্তির ভাব চূড়ান্ত ভাবে প্রকাশ পেয়েছে সেই সময়ে দেশবন্ধু সেই মনোস্তাত্ত্বিক সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতি রূপে তিনি যে অভিভাষণ দিলেন তাতে তাঁর চিন্তার গতি কোন্ দিকে তা স্পষ্ট বুঝা গেলো। ইংরেজ ভাঙবে তবু মচ্‌কাবে না, কাজেই নমনীয় ভাব প্রকাশে যদি প্রভুদের করুণার উদ্রেক করা যায় মন্দ কি? বলা বাহুল্য এটা সংগ্রামশীল মনের পরিচয় নয়, সংগ্রাম-ক্লিষ্ট মনের প্রতিপক্ষের কাছে দাক্ষিণ্য লাভের আকুলতা—পূর্বতন মডারেট রীতিরই নামান্তর।

দেশবন্ধু ইংরেজের কাছে কী আশা করেন এবং তার জন্যে তাঁর দলের প্রস্তুতি কী ধরণের হওয়া দরকার সে বিষয়েও তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ চিঠিখানিতে প্রকাশ পেয়েছে।

সুভাষচন্দ্র এই সময় বর্মা মুলুকে বন্দীশালায় আবদ্ধ। তিনি যদি এদেশে থাকতেন আর দেশবন্ধুও পরলোকে না যেতেন তবে গুরু-শিষ্যের মধ্যে সংঘর্ষ হতো অনিবার্য। সুভাষ রাষ্ট্রনীতিতে দেশবন্ধুকে গুরু বলে মেনে নিলেও

---

*চিঠিখানি স্বর্গীয় বন্ধু তারানাথ রায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

গুরুর বিরোধিতা করতে দ্বিধা বোধ করতেন না, তাঁর এ মনোভাব পূর্বাহ্নেই প্রকাশ পেয়েছিল কোন কোন ক্ষেত্রে। ইংরেজের সঙ্গে আপোষের বিরোধী ছিলেন তিনি গোড়া থেকেই এবং এই মনোভাবের দরুনই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন যুগান্তর দলের প্রতি।

ঐ চিঠিখানি থেকে এটাও বুঝা যায় যে পঞ্চপাণ্ডবদের মধ্যে কারো কারো প্রতি দেশবন্ধুর ছিল অগাধ বিশ্বাস ও অপার স্নেহ। গুরুর মৃত্যুর পর এঁরাই যে গুরুর আদর্শকে অনুসরণ করবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবেন, সেটা ধরে নেওয়া যায় অনায়াসে।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রের প্রধান কর্ণধার ছিলেন শরৎ বোসই সুতরাং সুভাষের মতবাদের প্রাধান্য তাতে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুভাষ মুক্ত হলে অপোষ-নিষ্পত্তির মনোবৃত্তিকে দিলেন দূরে ঠেলে কাজেই দেখা গেল এককালে যাঁরা ছিলেন তাঁর দলীয় সহযোগী তাঁরা যোগসূত্রে তাঁর সঙ্গে জড়িত থাকলেও প্রাণ ঢেলে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন নি।

আদর্শের প্রতি অত্যধিক নিষ্ঠাই সংবাদপত্রের অর্থকরী দিকটার প্রতি উভয় ভ্রাতাকে করেছিল উদাসীন। কাজেই এত বড় একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাণান্ত ঘটলো অকালে!

সাংবাদিক জীবনের পর্ব এইভাবে শেষ হলেও আমি তখনো একেবারে ভেঙে পড়িনি, কেননা আমার শিকড়টি ছিল আর্য পাবলিশিং হাউসে। কিন্তু সে অতি স্বল্পকাল। বিপদ আসে চারদিক থেকে—এ কথার মর্মার্থ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলাম যেদিন এক প্রবল ঝঞ্ঝা এসে এখান থেকেও আমায় উপড়ে ফেলে দিলে!

আর্য পাবলিশিং হাউসের সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে ছিল আমার আস্তানা; খেতাম নিকটেই গলির ভিতরে একটা মেস্‌বাড়িতে। এইবার সব গুটিয়ে নিয়ে আশ্রয় নিতে হলো ঐ মেস্‌বাড়িতেই। এইখানে প্রায় সটান শুয়ে পড়ে

আকাশ-পাতাল ভাবতে থাকি—অন্ধকারে আচ্ছন্ন সুদূর ভবিষ্যৎ আমার কাছে ভয়াবহ হয়ে উঠে। নতুন পথে পা বাড়াবার উৎসাহ পাই না, সাহসও নেই।

আমার এই ঘোর দুর্দিনে যাঁর নিরন্তর সাহচর্য আমাকে সঞ্জীবিত রেখেছিল তিনি হচ্ছেন বন্ধুবর প্রবোধকুমার সান্যাল। চরম আর্থিক দুরবস্থার কালে যদি তাঁর মতো বন্ধুকেও না পেতাম তবে আমার নিঃসঙ্গতা কতদূর দুঃসহ হতো তা ভাবতেও পারি না।

বন্ধুবর বললেন—গল্প লেখো দিকি তবু দু'পয়সা পাবার সম্ভাবনা আছে। কবিতা-ফবিতায় পয়সা আসে না। অন্য কিছু করবার আগে এই করো। হাতে প্রচুর সময় এখন।

গল্প লিখবো কি? আমি তো গল্পী নই। কবিতা লিখে পয়সা পাবার দুরাশাও আমার নেই। আর, কবিতাই বা আসে কই?

বন্ধুবর জাত-সাহিত্যিক। কল্লোলচক্রের কথা সাহিত্যিকদের হাতে তখন বেশ দু'পয়সা আস্‌ছে। তাঁদের শক্তি তখন রবীন্দ্রনাথের দ্বারাও স্বীকৃত। বন্ধুবর তাঁদেরই একজন। এমন অমূল্য উপদেশ তিনি অবিশ্যি দিতে পারেন অবলীলায় কিন্তু আমি তা গ্রহণ করি কোন্ সাহসে?

তবু অর্থপ্রাপ্তির মোহে চেষ্টা শুরু হলো অলক্ষ্যে। চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয়েছে তাও বলতে পারি না। প্রথম গল্প ছাপা হলে তার দক্ষিণাও পেলাম নগদ দশ টাকা। সাহস এলো মনে, আত্মবিশ্বাসও যেন এসে গেলো। তারপর আরো গুটি কয়েক গল্প লিখেও কিছু অর্থপ্রাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু তিল কুড়িয়ে তাল করবার মতো শক্তি যে আমার নেই তা আমি পরিষ্কার জানতাম; তা ছাড়া নতুন পথের যাত্রী হবার ধাত ও ধৈর্য আমার ছিল না। নতুন পথের সাফল্য কতদিনে আসবে কিংবা আদৌ আসবে কিনা তা ভাবতে গেলে শঙ্কিত হয়ে উঠতাম।

বন্ধু বিজয়ভূষণ ইতিমধ্যে এক ধনী যশোলিপ্সুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। নাম তাঁর হরিদাস মজুমদার—কলকাতার বিখ্যাত শীল পরিবারের একতরফের তিনি ছিলেন ম্যানেজার! তাঁর অর্থ-

সাচ্ছল্যের সঙ্গে বহুবিধ কল্পনা উচ্ছল হয়ে উঠে তখন তাঁকে চঞ্চল করে তুলেছে। হিন্দু সমাজের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বিষয়ে চিন্তারাশি তাঁর মাথায় গিজগিজ করছিল এবং সেই চিন্তারাশিরই তাড়নায় একদিন তিনি পরিকল্পনা করলেন এক নতুন সমাজের—যে সমাজে অমৃতের পুত্রেরা হবে অজর, অমর। এই সমাজের নাম দিলেন "অমৃত-সমাজ!" এখানে ধনী, নির্ধন, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল প্রভৃতি সকলের থাকবে সমান অধিকার—দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম হলেও পুরুষত্ব করায়ত্ত করার অবাধ স্বাধীনতা থাকবে এখানে ইত্যাদি ইত্যাদি।

উক্ত সমাজেরই আদর্শ প্রচারের জন্যে চাই একখানি মুখপত্র, তারও নাম হবে "অমৃত-সমাজ।" আলাপে সংলাপে অতীব মিষ্টভাষী হরিদাস বাবু আমাকে তাঁর কল্পিত সমাজের মুখপত্রের ভার নিতে বললেন। "কুসুমিকা প্রেস" কিনে নিয়ে তিনি বসিয়েছিলেন মুরলীধর সেন লেনে। ঐখানেই অফিস বসলো। ঐখান থেকেই "অমৃত-সমাজ" মাসিক পত্র প্রকাশিত হবে।

মনে আশা হলো আমার তরুণ সাহিত্যিক বন্ধুদের লেখা নিয়ে এই কাগজকে মনের মতন করে তুলবো। ঐ সময়টা মনোজ বসু বেশ লিখছিলেন। তাঁর একটি গল্প গভীর রেখাপাত করেছিল আমার মনে। মাটিতে ফলানো ফসলের সঙ্গে একটি দরিদ্র চাষীর আত্মিক যোগের কাহিনী কী করুণ মধুর হয়েই না ফুটেছিল তাঁর হাতে। যে কোন দেশের সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর পর্যায়ে পড়ে এই গল্পটি। আর একটি কাঁচা তরুণের হাতে তখন টাট্‌কা লেখা। স্বল্প পরিসরের মধ্যে একটি কাহিনীর অমন ঠাসবুনানি খুব কম দেখা যায়। এই লেখকের নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইচ্ছা ছিল আমার লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে এই দুইজন লেখককেও আনবো।

ওহরি! মাত্র কয়েক মাস যাওয়ার পর হরিদাস বাবুর খেয়ালের অন্ত হলো। "অমৃত-সমাজকে"ও মৃত অবস্থায় দেখতে হবে তা ভাবতে পারি নি আগে।

মেস্‌বাড়িতে সারাদিনের অলস সুপ্তির ক্লান্তি নিয়ে এসে বসি কলেজ স্কোয়ারের জলের ধারে একটা পাটাতনের উপর। বন্ধুবর প্রবোধ সান্যালের

সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কত কি যে বলি, কত কি যে ভাবি। সন্ধ্যা গড়িয়ে যায় গভীর রাত্রিতে, তারপর দুই বন্ধু এক সঙ্গে ফিরি আপন আপন আবাসে। কোনদিন বা যাই হাঁটতে হাঁটতে সার্কুলার রোড ধরে জোড়া গীর্জার পাশ দিয়ে সরু একটা গলি পেরিয়ে পার্ক সার্কাসের ট্রাম লাইনের বাঁকের মুখে; সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া পার্কে যখন এসে পড়েছি তখন সন্ধ্যা নেমেছে। ল্যান্সডাউন ও সার্কুলার রোডের যেখানে সংযোগ হয়েছে সেইখান থেকে এই পার্কটি দূরে নয়। হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের গা ঘেঁষে এই পার্কটি অতীব ছায়াচ্ছন্ন। সন্ধ্যার অন্ধকারে একা গেলে গা ছমছম করে। আকাশে আধখানা বাঁকা চাঁদ! পুকুরের ধারে ধারে ছায়াঘেরা প্রায় নির্জন পথ-গুলিতে আলো-আঁধারের এক অপূর্ব মায়া সৃষ্টি করেছে। দু'জনে বসে পড়ি একটা বেঞ্চিতে। সেখানে বসে শুনি প্রবোধের মুখে তার গল্প—দূর সীমান্ত প্রদেশে অপরিচিতা শিখ রমণী সেয়ান্তীর অশ্রুসিক্ত চোখে অতলস্পর্শ হৃদয়ের বেদনা অথবা গভীর অরণ্যপথে নিশীথ রাত্রিতে শিকারীর ভয়ে ভীত চকিত হরিণীর করুণ অসহায় দৃষ্টি। বিচিত্র সে-সব কাহিনী।

সেই সুদীর্ঘ অলস দিনগুলিতে অমৃতের আস্বাদ পেয়েছি কিনা বলতে পারি না তবে তখন যে গরলেও অরুচি ছিল না একথা বলতে পারি দ্বিধাহীন চিত্তে। বাস্তববোধহীন জীবনের এমন সুমধুর আত্ম-বিস্মৃতি বোধ করি আর ফিরবে না কখনো।

কিছুদিনের জন্যে কলকাতা ছেড়ে রইলাম দূরে। দরদী বন্ধু বিজয়ভূষণ সেখানেও আমায় স্মরণ করলেন।

বিজয় প্রবাসী অফিসে প্রুফ-রীডারের চাকরি নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর স্থানে আমাকে বসিয়ে দিয়ে আবার সম্পাদকতা করতে যাবেন অন্যত্র। আমাদের কোম্পানী ডুবে গেলে ক্যাপ্টেন নরেন দত্ত কাগজগুলির নাম অথবা সুনামস্বত্ব কিনে রেখেছিলেন। বিজয় কিন্তু বুদ্ধিবলে নৌকাডুবির সময়েও ক্যাপ্টেনের নজরে পড়েছিলেন ঠিক, কাজেই তাঁর নজরানা পেয়ে তিনি যাচ্ছেন "নবশক্তি" সাপ্তাহিক পত্রের পুনঃ প্রকাশের ভার নিয়ে। বিজয়ভূষণ সম্পাদক, ক্যাপ্টেনের অর্থানুকূল্য।

আমি বললাম—প্রুফ রীডার, প্রুফ রীডারই সই। দক্ষিণা কত ভাই?

বিজয় যে অঙ্কের পরিমাণ জানালে তা মনোহর না হলেও তথাস্তু বলে রাজী হয়ে গেলাম। দুর্দিনে ঐটুকুই বা পাচ্ছি কোথায়?

শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু তখন জীবিত ছিলেন। দু'খানি কাগজের সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখা ছাড়া কারবার থেকে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। কারবার দেখতেন তাঁর পুত্র কেদারনাথ!

কাজে ভর্তি হলাম। কিন্তু হায়! মাস তিনেক যেতে না যেতেই দেখি মাস-মাইনের কিস্তিবন্দী হয়। চাকরী ছেড়ে দিলাম দুত্তোর বলে। 'অভাগা যেখানে যায় সাগর শুকায়ে যায়!'

আবার কড়ি-কাঠ গুনি কিংবা ঘুরে বেড়াই পথে পথে।

"হে ভবেশ, হে শঙ্কর, সবারে দিয়েছ ঘর,
আমারে দিয়েছে শুধু পথ।"

আমার দুরবস্থার কথা শুনে উপেনদা একদিন ডেকে পাঠালেন আমাকে। গেলাম তাঁর কাছে। এদিন আমার সঙ্গী ছিলেন বন্ধুবর প্রবোধ সান্যাল।

উপেনদা তখন ইংরেজী বাংলা দুটি দৈনিক কাগজে লেখেন; উপরন্তু কর্পোরেশনের চাকরি। বললেন—লেখ্ না ভাই, আমার হয়ে। আর পারি না। ক্লান্ত হয়ে পড়ি। লেখ্ বসুমতীতে চালিয়ে দেবোখ'ন।

—গরীবের দুঃখে ইয়ারকি করবেন না উপেনদা।

—মানে?

—মানে, আমার লেখা উপেন বাঁড়ুজ্যের লেখা বলে চলবে? এমন স্পর্ধা আমার নেই। আপনার কি মাথা খারাপ হলো?

—থাক্, ভনিতা রাখ্ দিকি। সোজা কথা সোজা বাংলায় লিখবি, তার অত ভয় কিসের? মনের ভাব সোজা কথায় প্রকাশ কর্ যাতে সবাই বুঝতে পারে। ভাষা নিয়ে ডন-কুস্তির প্যাঁচ করেছ তো মরেছ। অভ্রংলিহ-টিহ বুঝি না বাবা—ও তোমাদের শ্রেষ্ঠ দৈনিকী ঢঙের দিকে ঢলো না।

তারপর বললেন—

শোন্ তবে একটা গল্প বলি। সেবার কার্তিক পূজো হবে, সে যে-সে

কার্তিক নয়, একেবারে লব-কার্তিক ; কারণ, বারবনিতালয়ে কিনা। এ জন্তে নেমতন্ন পত্তর ছাপার আয়োজন চলছিল। কয়েকজন কাপ্তেন মিলে রচনা-কার্যে লেগে গেলেন। কিন্তু বহুক্ষণ ধস্তাধস্তি ও কসরৎ করেও ভাষা আর ঠিক হয় না। বারম্বার কাটছাঁট করেও ভালো রকম পণ্ডিতী বাংলা আর কিছুতেই দাঁড় করানো যায় না। কাপ্তেনরা মহামুস্কিলে পড়ে গেলেন।

পূজার আয়োজন যাঁর আলয়ে, আহ্বায়িকা রূপে যাঁর নাম ছাপা হবে সেই গণিকা-সুন্দরী বিদ্যাধরদের উপর রচনা কার্যের ভার দিয়ে ওদিকে ঢুকেছিলেন স্নানের ঘরে। কাপ্তেনদের আলোচনা ও গবেষণার কথা তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করছিল। কিছুক্ষণ শোনবার পর আর তিনি ধৈর্য ধরতে পারলেন না, তাঁর গা জ্বালা করছিল। সিক্ত বসনেই তিনি কাপ্তেনদের সামনে হন্ হন্ করে ছুটে এসে ফোঁস্ করে উঠলেন—ওরে মুখপোড়ারা! তোদের বিদ্যের দৌড় যা তা বুঝতে পেরেছি, থাম্। এবার আমি যা বলছি তাই লেখ্—

"চিঠি লেখার——আদব কায়দার——থাই।
আমার বাড়ী কার্তিক পূজো,
তোরা সবাই আসিস্ ভাই।"

শুন্‌লি ভাষা কাকে বলে! পরিষ্কার ঝরঝরে কোথাও আড়ষ্টতা আছে, বল্?—জিজ্ঞেস করলেন উপেনদা।

উত্তর দেবো কি! উপেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে বহু দিন মিশেছি কিন্তু তাঁর মুখ থেকে এমন চোস্ত ভাষা শুনতে কোন দিনই অভ্যস্ত ছিলাম না। লজ্জায় আমাদের দুই বন্ধুরই মুখ নিচু হয়ে গিয়েছিল।

উপেনদা বললেন—ওঃ! কচি খোকারা সব, দুধের বাটিটা হাতে ধরে চুমুক দিতে জানো না যেন। লজ্জায় একেবারে অধোবদন হয়ে গেলে যে!

বাস্তবিক আহ্বায়িকার বক্তব্য অতীব সহজ, সরল; শব্দালঙ্কারের কোন বড়াই নেই, পদলালিত্যে তিনি থোড়াই কেয়ার করেন। অথচ বক্তব্য জলের মতো স্বচ্ছ। যে ক্ষেত্রে যেমন বিধি।

কিন্তু দুঃখ এই—গণিকা কবির ঐ অনবদ্য রচনাটি এখানে পূর্ণাঙ্গ রূপে

প্রকাশ করবার সাহস সঞ্চয় করতে পারি নি ; কারণ, তা হলে প্রহারেণ ধনঞ্জয় হবার সম্ভাবনা আছে। তবে ভরসা এই—রসিক জন যারা তারা হয়তো ঐ শূন্য স্থানগুলি পূরণ করে নিয়ে 'আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

এমনি করে তো আর দিন চলে না। মেসবাড়িতে আপনার ঘরে শুয়ে শুয়ে কেবল কড়িকাঠ গুনলে শেষটায় শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে হবে যে।

কল্পনাকে ছেড়ে দিতাম বহুদূরে—সেখানে কত বিচিত্র রং। সেই কল্পিত মাধুর্যের মধ্যে ডুবে যেতে লাগতো বেশ। কিন্তু বাস্তব জীবনের কঠোর সংগ্রামের মধ্যে যে সব ফিকে হয়ে যাচ্ছে। বাঁচার সমস্যাটা সত্যিই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।

সাহিত্যিকপনা করে গ্রাসাচ্ছাদনের চেষ্টা আমার পক্ষে এখন দুরাশা। সে বৃত্তি আগে গ্রহণ করি নি, অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।

আচ্ছা কর্পোরেশনে একটু স্থান হয় না আমার উপেনদার মতো ?

উপেনদার অভিন্নহৃদয় বন্ধু অমর চাটুজ্যের কথা মনে পড়ে গেলো। কর্পোরেশনে তাঁর নাকি হাত-পথ আছে। তাঁকে চিনি এবং চোখেও দেখেছি অনেকবার ; কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিল না। গেলাম একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে উপেনদার চিঠি নিয়ে। তখন তিনি মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোং-র একজন বড় পাণ্ডা। পোলক স্ট্রীটে তাঁহার অফিস ঘরে দেখি লোকে লোকারণ্য—কণ্ট্রোল যুগের যেন মারাত্মক কিউ। এই ব্যোম্ ভোলানাথ সদাহাস্যময় লোকটির মুখে কোন বিরক্তির চিহ্ন নেই। যে যে-আব্দার করছে তিনি তার সেই আব্দারই হাসিমুখে পূরণ করছেন অবারিত লেখনী চালনায়। যাঁর কাছে চিঠি দিচ্ছেন তিনি যদি তাঁর কথা না রাখেন তাতে তাঁর অপমান বোধ নেই ; কারণ সে অভিমানের প্রশ্রয় তিনি জীবনে দেন নি কখনো।

আমি অগণিত লোকের বহুবিধ উপরোধের শ্রোতা হয়ে এক কোণে সঙ্কুচিত হয়ে অপেক্ষা করছিলাম। আমিও যে ঐ দলে। কেমন করে আমার

দীনতাও অত লোকের মধ্যে প্রকাশ করবো? যাক্, সবাই একে একে বিদায় হোক্। আমার পালা শেষকালে।

আমার পালা যখন এলো, তখন পড়ন্ত বেলা! বেলা দুপুরে তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। সেই থেকে বিদায় বেলা পর্যন্ত তাঁকে কেবল আলাপ-আলোচনা ও পত্র রচনাতেই নিমগ্ন দেখলাম। যেন চাকরি-প্রার্থীর মেলা বসেছে। অফিসের কাজ কি ভদ্রলোক এইভাবেই করেন? ঘনিষ্ঠতা না থাকলেও আমাকে তিনি চিনতেন দেখলাম। উপেদনার চিঠিখানি পড়ে আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন—কাল আমি যাচ্ছি 'জে-সি'র ওখানে। তুমি আমাকে কর্পোরেশনেই ধরে নিয়ো। তোমাকে চিঠি দেবো না, আমি নিজেই যাবো। জে-সির অপর নাম রাজা—জে-সি মানে জে, সি মুখার্জী—কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা। অন্তরঙ্গ যাঁরা তাঁরা তাঁকে ঐ নামেই ডাকেন। তিনি কর্পোরেশনের রাজাই বটে—অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তখন এতখানি অনুগ্রহ আমি আশা করিনি। কৃতজ্ঞতায় আমি হতবাক হয়েছিলাম।

পরদিন যথারীতি হাজির হয়েছিলাম কর্পোরেশনে। তিনি জে-সির সঙ্গে আলেচনা করে ফিরে এসে বললেন, তোমার হয়ে গেছে; নিয়োগ-পত্র যথাসময়ে পাবে, বলে প্রসন্ন মুখে আমার দিকে চাইলেন। অমন প্রসন্ন হাসিটি আজও ভাসে আমার চোখের সামনে।

অমরদার মতো ব্যোম ভোলানাথ মানুষ পৃথিবীতে বিরল। যাঁরা তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে না এসেছেন তাঁদের পক্ষে তাঁর বিশাল হৃদয়ের গভীরতার পরিমাপ করা সম্ভব নয়। বোধ হয় এর সপ্তাহ দুই পরে আমি বসে গেলাম কর্পোরেশনের সদর অফিসে।

কর্পোরেশনে চাকরি নেবার পর পাকে-চক্রে আমিও হয়ে গেলাম উপেনদার প্রতিবেশী। টালা ছেড়ে দমদমার সিঁথি অঞ্চলে উপেনদা তাঁর নতুন বাড়ি তৈরী করেছিলেন।

এই বাড়ির পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সর্ব বিষয়ের খুঁটিনাটির রচয়িতা ছিলেন তিনি স্বয়ং। এর জন্যে যে উদ্যম ও পরিশ্রম তিনি করেছেন তা আধুনিক কালের কোন যুবকের পক্ষে সম্ভব কি না তা অন্তত আমি কল্পনা

করতে পারি না। গৃহ রচনা ও সন্তান-সন্ততির পালন ভিন্ন সংসারী জীবের আর কোন কর্তব্য আছে কিনা তা তাঁর জানা ছিল না এই সময়ে। সংবাদ-পত্রে প্রবন্ধ লিখে যদিও তিনি সাংবাদিক-বৃত্তি অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন তথাপি সে বৃত্তি ছিল তাঁর নিছক অর্থকরী। আদর্শবাদকে কিছুকালের জন্যে তিনি সিকেয় তুলে রেখেছিলেন।

সিঁথি অঞ্চলে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ দিনের সাহচর্য কত মধুর হয়েই না আমার স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সব বিষয়কে রসিয়ে তার থেকে সারবস্তু ছেঁকে নেওয়ার এমন অসাধারণ সহজাত শক্তি আর কারো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

কর্পোরেশনের জীবনে আর্থিক সাচ্ছল্য নেই তবু চৈত্রের শেষের দিকে অকস্মাৎ কালবৈশাখীর আবির্ভাবের আশঙ্কাও নেই। যেটুকু আছে সেইটুকু নিয়েই একরকম থাকা যায়।

কিন্তু বৈচিত্র্যহীন একঘেয়ে জীবনে বিরক্তি আসে। মানুষের দেহের অভ্যন্তরে মন নামক যে-বস্তুটি আছে তা যে কখন পীড়িত হয়ে ওঠে তার ঠিক নেই। দেহটা সুস্থ থাকলেই নাকি মনটাও সুস্থ থাকে, কিন্তু এটা আংশিক সত্য ; কেননা সুস্থ শরীরেও মনটা কখন যে অস্থির আবেগে ছুটে যেতে চায় তার স্থিরতা নেই। কী তার প্রয়োজন ? কোন্ রস না পেলে সে স্ব-স্থ হতে পারে না ? এসব দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে বিভ্রান্তি ঘটাবার বাসনা আমার নেই। এ অভিজ্ঞতা হয়তো অনেকেরই আছে, সুতরাং দুর্বোধ্য নয়।

সাংবাদিকের জীবনে পরিচিতির ক্ষেত্র অনেক বড় ; সেখানে বহু বিচিত্র রসের সন্ধান মেলে। এখানকার ক্ষেত্র অপরিসর ; এখানে কোথায় যাই যেখানে মনের খোরাক পাওয়া যায় ?

দেখতাম "মিউনিসিপ্যাল গেজেট" সম্পাদক অমল হোমের ঘরে আমার পরিচিত অপরিচিত বহু ব্যক্তির আনাগোনা হয়। তাঁদের মধ্যে কেউবা শিল্পী, কেউবা সাহিত্যিক, কেউ বা ভাস্কর, আবার কেউ বা অধ্যাপক বা অপর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি। মনটা চঞ্চল হয়ে উঠতো। বিগত দিনের সুখ-স্মৃতি জেগে ওঠে। হারানো দিনের রেশ কি টেনে আনা যাবে না ঐখানে ?

ভাগ্যচক্রে অমল হোমের সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটে গেল। ক্রমে তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হলো নিবিড়। মধুর, মিষ্ট আচরণে তিনি সকলকে সমানভাবে আপ্যায়িত করতেন—যেমন তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা তেমনি বাইরের লোকেরা মনে করতো যেন তিনি একান্ত আপনার জন।

আমি কিন্তু আকৃষ্ট হয়েছিলাম তাঁর চরিত্রের অন্য রকম মাধুর্যে। তাঁর দৈহিক পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে একটা উন্নত রুচি যেন মাখানো থাকতো। মনে হতো কোন শিল্পী তাঁর নিজেরই রচনার সৌন্দর্যে নিজে মুগ্ধ হয়ে আছেন। সুস্থ, সবল, রূপবান এই পুরুষটি দশজনের মধ্যে থেকেও দশজন থেকে আলাদা হবার কায়দাটা এমন নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করেছিলেন যে, দেখলে মনে হতো এটা তাঁর স্বভাবের সহজাত। এই গুণটি থাকার দরুণ তাঁর গতিবিধি ছিল বহু পরিবারে ও সমাজে অব্যাহত। এক কথায় বহুজনপ্রিয় বলতে যা বুঝায় অমল হোম তাই। রবীন্দ্রনাথ বা সরোজিনী নাইডু, পণ্ডিত মতিলাল বা লাজপত রায়, আনি বেশান্ত বা কায়েদে আজাম কিংবা স্যার মির্জা ইসমাইল বা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সবার কাছেই তিনি সমান আদর কুড়িয়েছেন।

সুধীজন সমাজে অমল হোমের জনপ্রিয়তা চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল কর্পোরেশন অফিসেই। পণ্ডিত জহরলাল স্বাধীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী হবার পর প্রথম কলকাতায় এলে কর্পোরেশনের তরফ থেকে তাঁর সম্বর্ধনার আয়োজন হয়েছিল। সেই সময় এইখানে গান্ধীজীর এক আলেখ্যের আবরণ উন্মোচনের ভারও পড়েছিল তাঁর উপর। সমবেত জনতার মধ্যে উপস্থিত হয়ে পণ্ডিতজীর প্রথমেই চোখ পড়লো কিনা অমল হোমের উপর—তিনি "Hallo! Amal!" বলে সহাস্য সম্বোধন করে একরূপ লম্ফপ্রদানপূর্বক অমল হোমকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন। অমল হোমের পরনে ছিল আঁট-সাঁট নবাবী মেরজাই—যা হাঁটুর নীচ থেকে পদ-তলের উপরিভাগ পর্যন্ত অংশকে আবৃত রেখেও তার অনাবৃত সৌন্দর্য প্রকাশ করে ধরে; এরি সঙ্গে খাপ খাওয়ানো নাগরাই জুতো জোড়ার শুঁড় দেখা যাচ্ছিল; গায়ের আজানুলম্বিত কুচকুচে কালো কোটের সম্মুখ ভাগে অসংখ্য বুটিদার বোতাম ঝুলছিল—যেন একগাছি গাঁথা মালার লম্বমান অবস্থান!

মাথায় সযত্ন শুক একরাশ ঘন কালো চুলে স্বশুভ্র গান্ধী টুপিটি এমনিভাবে বসানো যে সহজেই তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পণ্ডিত জহরলালের এ কি পক্ষপাতিত্ব! সভার মধ্যে এত হোমরা-চোমরা ব্যক্তি থাকতেও কারো দিকে দৃষ্টি না দিয়ে প্রথমেই "Hallo Amal!" সব যেন ছোট হয়ে গেলো অমল হোমের কাছে। এ কায়দাটা ছিল অমল হোমের নিজস্ব কপি-রাইট। এ জন্যে কিন্তু অনেকের কাছেই তিনি ছিলেন চক্ষুশূল।

যাই হোক, অমল হোমের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হতে নিবিড়তর হয়েছিল এই কর্পোরেশন-অফিসেই। তাঁর ঘরে নিত্য কিছুক্ষণের জন্যে আড্ডা দিতে না পারলে স্বস্থ বোধ করি নি, শুষ্ক কর্তব্যের মাঝেও এইখানে ছিল কিছু প্রাণের রস। ফরওয়ার্ড অফিসের বৈকালিক বৈঠকের কিছুটাও অন্তত পেয়েছি এই মিউনিসিপ্যাল গেজেট সম্পাদকের কাছে।

তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার আগে তাঁকে বোধ হয় প্রথম দেখেছিলাম আমাদের সম্পাদক-গোষ্ঠীর মাঝে ফরওয়ার্ড অফিসেই। তিনি তাঁর বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র নিয়ে এসেছিলেন। পাণ্ডুর, বিশ্রী তুলোট কাগজকেও সুশ্রী, শোভন অভিজাত পর্যায়ে তুলে ধরা যায়—এটা তাঁর রুচিতে প্রকাশ পেয়েছিল এবং এ বিদ্যাটা বোধ হয় তিনি আয়ত্ত করেছিলেন তাঁর পরম শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের কাছ থেকে শান্তিনিকেতনের শান্ত পরিবেশের মাঝে।

আর একবার দেখেছিলাম তাঁকে রবীন্দ্রনাথের জয়ন্তী-উৎসবের কর্ণধার রূপে। তাঁর অনন্যরুচি কর্মকুশলতার গুণে সর্বদেশবরেণ্য মহাকবির জয়ন্তীর সঙ্গে অমল হোমেরও জয়জয়ন্তী হয়ে গেলো সেবার।

অতি সাধারণ এক পৌরপ্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক মুখপত্রকে দেশে বিদেশে অসাধারণ বলে পরিচিত করবার কৃতিত্ব ছিল তাঁরই। মিউনিসিপ্যাল গেজেটের বিশেষ সংখ্যাগুলির বিশেষ সমাদরের মূলে ছিল অমল হোমের বৈশিষ্ট্য। অতি তুচ্ছ বিষয়বস্তুকে সাজ-সজ্জায় সাজিয়ে গোলাপগুচ্ছ করে তুলতে জানতেন তিনি।

সামান্য এক সাপ্তাহিকের সম্পাদকের এমন খ্যাতি তাঁর সতীর্থদের

অনেকের ঈর্ষা উদ্রেক করতো। "চালিয়াৎ নম্বর ওয়ান"—এই মন্তব্যও শুনেছি অনেকের মুখে। কিন্তু চালটাই যে তাঁর ধর্ম এবং তারই বলে তাঁর কর্মে সাফল্য, সে কথা ভেবে দেখতেন না অনেকে। এরও জন্যে চাই সাধনা।

একবার মিউনিসিপ্যাল গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যা দেখে উপেনদা ভারি খুশি হয়ে অমল হোমের অজস্র প্রশংসা করেছিলেন। আমি যথারীতি সে খবরটি দিয়েছিলাম সম্পাদক মহাশয়কে। নিজের প্রশংসা শুনতে কার না লাগে ভালো, আর সে প্রশংসা যদি হয় বিখ্যাত ব্যক্তি উপেন বাঁড়ুজ্যের? সম্পাদক মশায় এমন উৎসাহিত হয়ে উঠলেন যে, উপেন বাঁড়ুজ্যের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে এসে দেখা করবার বাসনা তাঁর অকস্মাৎ হয়ে উঠলো প্রবল। সম্পাদক মশায় বললেন আমাকে—বলো উপেনদাকে যাবো একদিন তাঁর বাড়িতে চা খেতে।

উপেনদা শুনে বললেন—ওরে বাপ্‌রে! রক্ষা কর্‌। ও-যে বেহ্মোরে! তা ছাড়া রবি ঠাকুরের চেলা। এখানে এলে আমি ওকে বসাবো কোথায়? কোন্ বেশে এসে হাজির হবে তাইবা কে জানে! ওযে বহুরূপী রে। কখনো পাক্কা হোমসাহেব; কখনো উনকুট্টি চৌষট্টি বোতাম-বসানো কোট-গায়ে-দেওয়া খাঁটি ইউ-পি-বালে; কখনো ফারসী বেশ পরে মাথায় পারসী টুপি চড়িয়ে গুরুদেবের উপর টেক্কা মারা; আবার কখনো বা বিস্‌মুল্লাহ্ কিস্‌মিস্‌উদ্দৌলা রংদার খোন্দ্‌কার পটিবরদার!

বাপ! বলো তোমার হোমসাহেবকে যে তাঁর মতো বহুরূপী অতিথিকে গ্রহণ করবার আদব-কায়দা আমি শিখিনি কখনো, তা ছাড়া এ বে-কায়দা বাড়িতে তা সম্ভবও নয়। তার চেয়ে বরং আমিই তাঁর কাছে যাবো একদিন। আমার শ্যালকের বাড়ির কাছেই থাকে যে অমল। ওরে, তার নীচেকার বসবার ঘরে রাশি রাশি বইয়ের সারির উপর একটা তাকে বসানো এক বাল-গোপাল মূর্তি দেখে এসেছি। দিব্যি নধর পুরুষ্টু এই ছোট্ট গোপাল। আঃ! চমৎকার! ঐটির উপর আমার একটু লোভ আছে। জানলার ফাঁক দিয়ে আমার নজরে পড়েছিল। কিন্তু খট্‌কা লেগে আছে ভাই। বেহ্ম বাড়িতে বাল-গোপাল মূর্তি! কি জানি অমল

আর্টিস্ট তো, হয়ত আর্টের সংগ্রহ হিসাবেই রেখেছে ওটা। খোঁজ নিয়ে দেখিস্ তো!

যে বালগোপাল দেখে উপেনদার লোভ হয়েছিল সেটি আমিও দেখেছি। ভক্তির কথা বাদ দিলেও এটাকে সম্পত্তি হিসাবে রাখার লোভ অনেকেরই হওয়া স্বাভাবিক। সুন্দর এই মূর্তি, আর এই মূর্তির বিশেষত্ব এই যে, দর্শক যেদিক থেকেই দেখুক না কেন, গোপালের সহাস্য দৃষ্টি তার দিকে পড়বেই।

গোপালের এমন দিন ছিল যখন এই গোপালের জন্যে পাগল হয়েছিলেন এক ব্যক্তি, যিনি গোপালের খাওয়া না হলে নিজে কিছু মুখে দিতে পারতেন না; গোপাল ঘুমিয়েছে মনে করে যিনি নিশীথ রাত্রিতে চোখের পাতা দুটি মুদ্রিত করতেন। সেই ব্যক্তি ছিলেন অমল হোমের মাতৃকুলের একজন। সেই বাল-গোপালের স্বভাবপ্রাপ্ত শিশুসরল ব্যক্তিটির নাম রামহরি দত্ত, যাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণা স্বামীর চিতায় সহমরণে গিয়েছিলেন। জয়নগর-মজিলপুরের বিখ্যাত দত্তবংশে গোপালের এককালে খাতির ছিল প্রচুর। গোপালের নামে সম্পত্তির আয় থেকে গোপালের ভোগ হতো তখন নিত্য ঘটা করে আর সেই ভোগের প্রসাদ পেতো কত দীন-দুঃখী।

তারপর এলেন এই বংশে এক ব্যক্তি যিনি গোপালের উপর অভিমান করে গোপালকে দিলেন দূরে ঠেলে। বললেন—তোমার ভার তুমিই নাও ঠাকুর, আমার ঘাড়ে তোমার ভার চাপিয়ো না। এই ব্যক্তি অরূপ রতনের সন্ধানী ছিলেন—ভক্তের বিদ্রোহী রূপ দেখা গেলো তাঁর মাঝে।

সেই থেকে গোপালকে আর কেউ ভোগ জোগায় না। নিশ্চল গোপালের সহাস্য দৃষ্টি কিন্তু নিষ্প্রভ হয়নি আজো। মজিলপুরে গোপালের হাট হয়তো আজো বসে, কিন্তু সেই সে-কালের ঠাট আর নেই।

১৯৪২ সালে কলকাতায় বোমা পড়লে অমল হোম তাঁর মূল্যবান গ্রন্থরাজি স্থানান্তরিত করেছিলেন মজিলপুরে মামার বাড়িতে। তারপর যুদ্ধাবসানে যখন তিনি বইগুলি আবার নিয়ে এলেন নিজের কাছে সেই সঙ্গে এলেন ঐ অনাদৃত গোপাল। গোপাল উপবাসীই থাকেন, তাঁকে কেউ ভোগ জোগায় না, কিন্তু তাঁর দিকে চেয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করেন অনেকেই।

গোপাল আজ প্রাণহীন, নিশ্চল, স্থাণু। অথচ এই পাথরের গোপালেরও একদিন প্রাণ ছিল। উড়িষ্যার কোন বিখ্যাত ভাস্করের নিপুণ হাতে ফুটেছিল এই সুঠাম, সুন্দর, বালখিল্য গোপাল, পাথরের দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামহরি। কল্পনা নয়, মনের নিভৃত স্তরে যে রসোপলব্ধির ধারা, তাতে সিঞ্চিত হয়েছিল গোপাল। গোপালের মুখের ফুটন্ত হাসিতে সেদিন কোন্ অলক্ষ্য পুরীর মা-যশোদা রামহরির বাৎসল্য রসে ঈর্ষান্বিত হতেন। গোপালের নাওয়া-খাওয়ার শেষে গোপালের চোখে ঘুম আনতেন একদিন রামহরি; গোপালের দুষ্টুমিতে একদিন কৃত্রিম কোপ ফুটতো রামহরির মুখে। গোপালের তখন প্রাণ ছিল।

তারপর রামহরির উত্তরপুরুষ কালিনাথ একদিন শুনলেন উপনিষদের বাণী। অন্তরে তিনি উপলব্ধি করলেন—সারা বিশ্বে গোপাল যে ছড়িয়ে রয়েছেন! গোপালের বাহ্য রূপ মহীয়ান হয়ে উঠলো তাঁর অন্তরের আলোকে, তিনি সেই আন্তর সৌন্দর্যে পাগল হয়ে পাথরের গোপালের দিক থেকে দৃষ্টি দিলেন অন্যত্র সরিয়ে।

নিশ্চল পাথরের গোপালের মাঝে সাধনার ঐ দুই বিভিন্নমুখী ধারা আজো স্তব্ধ হয়ে আছে।

আদর্শের প্রতি অচলা নিষ্ঠা নেই অথচ মোহ আছে এমন ব্যক্তি না পায় এ-কূল, না পায় ও-কূল। আদর্শে নিষ্ঠাও নেই, মোহও নেই, কিন্তু শাণিত বুদ্ধিকে নিষ্ঠা বলে চালিয়ে দেওয়ার শক্তি আছে এমন ব্যক্তি ছিলেন উপেন বাঁড়ুজ্যে। বাস্তব ক্ষেত্রে তাই তাঁকে সাফল্য অর্জন করতে দেখেছি—অবিশ্যি সাফল্য বলতে আমরা সাংসারিক ব্যক্তি যা বুঝি।

সাংবাদিক বৃত্তির প্রতি উপেন বাঁড়ুজ্যের নিষ্ঠা না থাকলেও সংবাদ জগতের পরিচালকরা তাঁকে ছাড়তে চাইতেন না, তাই আমরণ তিনি সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

আমার বিশুষ্ক মুখের দিকে চেয়ে বলতেন—হ্যাঁরে, আণ্ডা-বাচ্চা বুঝি

অনেকগুলো হলো। কবিতে-টবিতে বুঝি সব শুকিয়ে গেছে, কেমন? কাগজে আবার আস্‌বি? বাড়তি সময় কিছু হাতে নেই তোর?

কাগজের অবস্থা আগেকার চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। বন্ধু-বান্ধবদের অনেককেই দেখি মোটামুটি ভালো। অনিশ্চয়তার বানে ভেসে যাওয়ার দুর্ভাবনা যেন আর নেই। তবু ও-প্রসঙ্গটা চাপা দিয়ে দিই, কারণ ও-পথের পথিক যাঁরা ছিলেন আমার সঙ্গে, তাঁরা গেছেন অনেক দূরে, তাঁদের আর নাগাল পাবো না বলে। তাঁদের প্রায় সকলেই আছেন আজ বিভিন্ন সংবাদপত্রে, তাঁদের মধ্যে কারো কারো প্রতিষ্ঠাও হয়েছে বেশ।

এই সময়ে উপেনদার কর্পোরেশনের কর্মজীবনের অবসান হয়েছে। আবার তিনি নিরঙ্কুশ সাংবাদিক—অমৃতবাজারের সহযোগী সম্পাদক। নিরঙ্কুশ মানে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখা ছাড়া তাঁর হাতে তখন আর অন্য কাজ নেই যাতে অর্থাগম হতে পারে। পরিষ্কার স্বীকার করতেন যে তিনি দাসত্ব করছেন,তুষার দুটো খেতে দেন তাই সকাল হলেই এক কলম বা আধ কলম কলমবাজি করে তিনি দায় থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা করেন। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম স্থতরাং দাসত্ব তো বটেই তবু তাঁর দাসত্বের একটা বিশেষ জাত ছিল; সেটা যাঁরা তাঁকে ভালো করে দেখেছেন তাঁরাই জানতেন। তিনি পত্রিকা অফিসে যেতেন বা যেতেন না; না গেলে অফিসের বেয়ারা এসে তাঁর প্রবন্ধ নিয়ে যেতো।

কাগজের স্বত্বাধিকারী-সম্পাদকের মোটর এসে ভিড়তো কখনো কখনো। বুঝিবা ঘোর দুর্যোগ সমুপস্থিত, অধম-তারণের প্রয়োজন হয়েছে। সেদিন সন্ধ্যা অনেকটা গড়িয়ে গেছে, তখনো আড্ডা দিচ্ছিলাম উপেনদার ওখানে। অকস্মাৎ মোটরের বাঁশীর আওয়াজ পাওয়া গেলো, তারপরই মোটরের দরজাটি খুলে আবার ঝপাং করে বন্ধ করে দিয়ে যিনি গড্‌ গড্‌ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন তিনি স্বয়ং পত্রিকাধ্যক্ষ। উপেনদা বললেন—কি বাবা, রাতের অতিথি! মতলব তো ভালো বোধ হচ্ছে না। পত্রিকাধ্যক্ষ কোন জবাব দেবার আগে আধখানা হাসি হেসে আমার দিকে যে দৃষ্টি হানলেন তাতে বুঝলাম আমি এখানে এখন অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি। চুপটি করে গা

টাকা দিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লাম। মতলব যে খারাপ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পরের দিন সকালে পত্রিকা খুলে দেখি সম্পাদকীয় স্তম্ভে কোন ব্যক্তি-বিশেষকে তুলো ধুনা হয়েছে। বুঝলাম বেঁটে বামুনের কর্ম। পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বী কোন কাগজের পরিচালকদের মধ্যে এক ধুরন্ধর ব্যক্তির প্রতি ইঙ্গিত। চরম কশাঘাতও হানা হয়েছে কোন বিলাতী হোটেলখানায় এক খানা-পিনার আসরের বর্ণনা দিয়ে। এই আসরটি নাকি হাস্যে লাস্যে উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন ঐ ধুরন্ধর ব্যক্তিটি সুরা প্রসাদাৎ। উপেনদা লিখেছিলেন—
"He quaffed bottle after bottle of champagne and proved himself the most hilarious of the whole lot."

সুরাপায়ী সম্বন্ধে আমাদের সামাজিক সংস্কার অনুযায়ী যে ধারণা তা আদৌ সুখকর নয়। উক্ত ব্যক্তি শ্যাম্পেন সুরা গলাধঃকরণ করে মহাপাতক করেন নি নিশ্চয়ই তথাপি আমাদের সংস্কারবশে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করা সহজ। উপেনদা সেই সুযোগ নিয়েছিলেন। এমন মুখরোচক খবরটি পাঠকসমাজকে অনেক দিন ধরে চঞ্চল রেখেছিল। পত্রিকাধ্যক্ষের উদ্দেশ্য তাতে সফল হয়ে গেলো।

ঝোপ বুঝে কোপ মারবার ওস্তাদ ছিলেন এই পাকা সাংবাদিক। কোন বিখ্যাত ব্যারিস্টার নেতা ইংরেজের বাপান্ত করতে ছাড়তেন না কিন্তু ব্যরিস্টারী ব্যবসা ছাড়েন নি কখনো। ইংরেজের কয়েদখানায় বন্দী হলে আবার মুক্তির পর তিনি এসে ঢুকতেন হাইকোর্টে। উপেনদা সেইদিকে ইঙ্গিত করে লিখলেন—ইংরেজ চুলোয় যায় যাক, কিন্তু হাইকোর্টটা যেন রেখে যায়; তা হলে এই ব্যক্তি তাঁর ইংরাজী ইডিয়ম চালিয়ে ব্যবসাটা বজায় রাখতে পারবেন।

ঐ সব উক্তির মধ্যে উপেনদার ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল না আদৌ। সবটাই তিনি যেন খেলাচ্ছলে ঢিল ছুঁড়তেন। নিজস্ব মত বলে যা তাঁর ছিল তা থাকতো নিজেরই কাছে, আলাপ আলোচনায় তা প্রকাশ পেতো। মানুষটা আর সাংবাদিক যেন দুটো আলাদা ব্যক্তি। আপাত সুখী বলে

বোধ হলেও এই ব্যক্তির আত্মায় কোথায় যে পীড়া ছিল তার খোঁজ কে রাখতো? শেষ বয়সে অমৃতবাজারের সংশ্রব ত্যাগ করে তিনি দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক হয়েছিলেন কিন্তু তাঁর পীড়িত আত্মার সংশয় দূর হলো না কোনদিন।

প্রায়ই আমার বাসা থেকে উপেনদা আমায় টানতে টানতে নিয়ে যেতেন আর বলতেন—বল্ দুটো ভালো কথা বল্।

ভালো কথার ইঙ্গিতটা আমি বুঝতাম। অর্থাৎ পণ্ডিচেরীর কোন খবর আছে কিনা। শ্রীঅরবিন্দের কাছ থেকে এই পোড়া মানবজীবনের দিব্য রূপান্তর হওয়ার আশু সম্ভাবনার আভাস কিছু আছে কিনা।

শ্রীঅরবিন্দের ওখানে যাঁরা পড়ে আছেন তাঁরা কিসের আশায় থাকেন? তাঁদের উপর একটা আক্রোশ দেখিয়ে তিনি প্রসঙ্গটা তুলতে চাইতেন। আসলের উপর তাঁর হাত পড়তো না, সুদ নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসতেন। কিন্তু অমি দিতাম ঐ আসলটার উপরই হাত। উপেনদা দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলতেন—বাপরে! ও অতলস্পর্শ! বুঝি না বাপু কিছুই, একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। উপেনদাকে মারতে হলে ঐ ছিল আমার পাশুপত অস্ত্র। বাস্, একেবারে চুপ।

বুঝতাম শ্রদ্ধার অপর দিক। নিছক অভিমান করে প্রিয়জনের কাছ থেকে তাঁর দূরে আসা ছাড়া আর কিছুই তো নয়। এককালে যাঁর পিছনে ছুটেছিলেন তিনি পাগলের মতো—সেই মহাপুরুষ কোন্ এক সাগর-সীমায় নিশ্চল স্থাণুর ন্যায় বসে আছেন?

উপেনদার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল শ্রীঅরবিন্দের জীবনে। তাঁর নিরাশার জন্ম সেই দিন থেকে, যে দিন তিনি সেই কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হলেন। মানুষ মানুষই—গুণরাজির সঙ্গে দোষ-ত্রুটি মিশিয়ে তবেই তার সংজ্ঞা। পার্থিব যাবতীয় দুঃখ-দৈন্যের মূলে রয়েছে মানুষের মনের ঐ উভচর বৃত্তির সংঘাত। পৃথিবীর বিবর্তনের ধারায় মানুষ এমন একটি স্থানে এসে পৌছেচে যেটা তার মনোরাজ্য। এই মনোরাজ্যে চিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের নিগূঢ় অর্থটি কেবলমাত্র বুদ্ধিদ্বারা গ্রাহ্য নয়; মনেরও উপরে

উঠতে হবে এক স্তরে যেখানে পরম প্রশান্তি বিরাজমান—সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাতের যেখানে পরিসমাপ্তি। শ্রীঅরবিন্দ সেই নব সম্ভাবনার অগ্রদূত কিন্তু সেতো গেলো আত্মদর্শন বা সমীক্ষার কথা। উপেনদার সংশয়-সঙ্কুল মনে তার কোন আভাস আসেনি।

দেখতে দেখতে স্বাধীনতা এলো। কে বলে স্বাধীনতা? এই কৃত্রিম স্বাধীনতা তো কোন কালেই কাম্য ছিল না। দ্বিধাবিভক্ত ভারতের এই রূপ কে কল্পনা করেছিল? এই রূপ দেখবার আগে তাঁর মৃত্যুই ছিল ভালো।

সাংবাদিক হওয়ার বড় বিপদ এই যে নিজেকে বিমুক্ত না রাখতে পারলে মানসিক দৈন্যে হয়ে পড়তে হয় অবসন্ন। আমাদের এই চলমান পৃথিবীর বহু ব্যক্তি ও বিষয়ের যে দিকটায় থাকে মালিন্যের দাগ তা সাংবাদিকের চোখে পড়ে। খ্যাতনামা এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় সাধারণের মাথা নত হয়ে আসে কিন্তু সে সব ব্যক্তিরও চরিত্রে থাকে তুচ্ছতার আবিলতা; সাংবাদিক তা দেখতে পান বলে যদি পৃথিবীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশায় শ্রদ্ধা হারান তবেই হয় বিপদ।

সাংবাদিক জীবনে ভূয়োদর্শনের ক্ষেত্র যেমন আছে, তেমনি আছে ভূয়া দর্শনের প্রবল সম্ভাবনা। মানুষের স্বভাবের অসম্পূর্ণতা ও দৌর্বল্যের দিকে নিত্য ইঙ্গিত করতে গেলে নিজের চিত্তও দুর্বল হয়ে পড়ে। সাংবাদিকের কারবার প্রতি দিনকার ঘটনা নিয়ে, কাজেই শান্ত স্থৈর্যে চিন্তাশীল মনকে বেঁধে নেওয়া সাংবাদিকের পক্ষে কঠিন। যিনি তা পারেন তিনি অনন্যসাধারণ সন্দেহ নেই। সাধারণ ক্ষেত্রে অনেক সময় তা সম্ভব নয়।

দুঃখ, বেদনা, উচ্ছ্বাস, সাহসিকতা ইত্যাদির প্রকাশে মাত্রাহীন হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে সাংবাদিকের, কেননা দৈনন্দিন দায়িত্ব পালনের সময়টা কলের চাকায় বাঁধা।

যে যুগের কথা আমি বললাম সে যুগে সাংবাদিকদের ভাগ্য জড়িত ছিল কোন-না-কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে। কিছুটা আদর্শ, কিছুটা যশোলিপ্সা

আর সেই সঙ্গে কিছুটা অর্থাগম সেই সময় সাংবাদিকের জীবনকে প্রভাবান্বিত করতো। বৃত্তির অর্থকরী দিকটা তখন তত বেশি নজরে পড়তো না, তার কারণ জীবন-সমস্যা তখন এখনকার মতো এত জটিল হয়ে ওঠেনি। লেখনী চালনার শক্তি থাকলে সাংবাদিক প্রভাবশালী হতে পারতেন এবং সে হেতু সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠালাভও সহজ হতো।

সব কিছুর মতো সংবাদপত্রেরও বিবর্তন হয়ে চলেছে। আমরা যখন সংবাদ-জগতে প্রবেশ করি তখন ক্ষেত্র ব্যাপকতর হয়ে এসেছে। বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন উড়ে যেতে চায় নিজের সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনী ছাড়িয়ে দূরে দূরান্তরে সীমাহীন বহির্জগতে। নতুন সে কোন্ দেশ, নতুন সেখানকার লোকাচারের মধ্যে আছে কি কোন নতুনত্ব? আছে কি সেখানে জনসাধারণের জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য? সেখানকার মানুষের অনুসন্ধিৎসার ফলে লব্ধ জ্ঞানের আলোক কি এখানেও ফেলবেনা কোন রশ্মি? এ সব খবর সংগ্রহ করার দায়িত্ব এসে পড়েছে তখন। বহু দেশের বহুবিধ ঘটনার যথাযথ সমাবেশে খবরের কাগজের সজ্জা না হলে তা প্রগতির প্রতিযোগিতায় পেতো পিছনকার আসন।

অথচ এমন একদিন ছিল যখন একখানি খবরের কাগজের পরিচয় ছিল একটি বিশেষ ব্যক্তির নামাঙ্কিত গৌরবের সঙ্গে জড়িত। তখন ছিল মতের প্রাধান্য, খবরের প্রাধান্য তখন মতকে ছাড়িয়ে উঠতে পারতো না। সীমা পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ খবরের প্রকাশে বিলম্ব হলে তাতে আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না, কারণ যান-বাহনের কল্যাণে পথ তখনো এখনকার মতো এত সুগম হয় নি। দু'দিন বাদে যে খবরটা এসে পৌঁছলো তাতে মন পীড়িত হতো না আদৌ।

যেকালে কোন সংবাদপত্রের উল্লেখ করলে একটি বিশেষ ব্যক্তিকে স্মরণ করে আমরা গর্বিত হয়ে উঠি সেকালে কিন্তু সেই সঙ্গে বিশেষ পরিবেশ ও বিশেষ চাহিদার কথা আমরা ভুলে যাই, তাই তুলনায় আমাদের সত্যদৃষ্টির অভাব ঘটে।

বাংলাদেশে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস পাল, গিরিশচন্দ্র ঘোষ,

শিশিরকুমার এবং মতিলাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বা সুরেশ সমাজপতি প্রভৃতি প্রখ্যাত সাংবাদিকদের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। এমনি স্মরণীয় ব্যক্তিদের নাম বাংলার বাহিরেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও আছে। যেমন—মাদ্রাজের "হিন্দু" পত্রিকার কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার অথবা পাঞ্জাবের "কেশরী"র লালা লাজপত রায়। এঁদের সংবাদপত্র পরিচালনায় মুখ্যত ক্রিয়া করতো কোন না কোন নীতি—রাজনীতি, সমাজনীতি বা ধর্মনীতি। লোকশিক্ষাটাই ছিল মুখ্য আর ব্যবসাটা গৌণ কিম্বা অতীব নগণ্য। ভারতবর্ষের অধিকাংশ সংবাদপত্রের জন্ম-ইতিহাসে পাই রাজনীতি, কারণ পরাধীন দেশের আত্মপ্রকাশের একমাত্র পথই ছিল ঐ। আর, এই পরাধীনতার সঙ্গে জড়িত বহুবিধ বাধাবিপত্তিই কোন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসার দিক দিয়ে তেমন সাফল্য আনতে দেয় নি।

সম্প্রতি কিছুকাল থেকে আমাদের দেশেও সংবাদপত্র পরিচালনায় ব্যবসার দিকটা বড় হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্য দেশের অভাবনীয় সাফল্যের কথা যদিও এখনো আমাদের ধারণার অতীত, তবু সে-দেশের পন্থা অনুসরণের চেষ্টা চলেছে, এটা আশার কথা। লণ্ডনের "নিউজ-লেটার" কিম্বা শ্রীরামপুরের "সংবাদ-প্রভাকর"-এর যুগ থেকে আমরা এসে পড়েছি অনেক দূরে। আধুনিক যান্ত্রিক যুগের সংবাদপত্র বলতে যা বুঝায় তার থেকে কিছুমাত্র বিচ্যুতি ঘটলে আমরা প্রগতির পর্যায়ে স্থান পেতে পারি না। একটি বিশিষ্ট ব্যক্তির মতের প্রাধান্য নিয়ে যে সংবাদপত্র এককালে বহুজনের প্রিয় হতে পারতো আজকের যুগে তা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

কেবলমাত্র সম্পাদক নয়, তাঁর সঙ্গে তাঁর সহ-সম্পাদকদল, রিপোর্টার, কম্পোজিটর, প্রুফরিডার, প্রিণ্টার প্রভৃতি সকলের সমবেত দক্ষতা নিয়ে আজকের দিনের সংবাদপত্রের আসল পরিচয়। সম্পাদক মশায়ের প্রবন্ধে প্রসাদগুণ থাকা সত্ত্বেও যদি কাগজে থাকে ভুলের সংখ্যা বেশি, রিপোর্টারের বিবরণীতে না থাকে ঘটনার যথাযথ উল্লেখের সঙ্গে বর্ণনার মনোহারিত্ব, মুদ্রণ-

যন্ত্রের দাক্ষিণ্যের ফলে যদি কাগজের বুকে কোথাও পড়ে অতিরিক্ত কালির ছাপ আর কোথাও থাকে অশোভন অস্পষ্টতা, বিচারবুদ্ধির অভাবে সংবাদ-সজ্জায় যদি তুচ্ছ ঘটনা প্রাধান্যের জৌলুস নিয়ে ফুটে উঠেছে দেখতে পাই অথবা যদি দেখি বিভিন্ন টাইপ নির্বাচনে রুচির দৈন্য, তবে মন পীড়িত হয়ে ওঠে এবং সেই সংবাদপত্রকে গ্রহণ করতে সঙ্কুচিত হই।

আধুনিক যুগের সংবাদপত্রে ছবির বাহুল্য এসে পড়েছে সংবাদেরই অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে। দেহের সঙ্গে প্রাণের যে সম্পর্ক সংবাদের সঙ্গে ছবিরও যেন তাই। কিন্তু এখানেও থাকে সর্বদা আশঙ্কা। জহরলাল সানফ্রান্সিস্কোতে কোন কৃষক পরিবারে নিমন্ত্রিত হয়ে সেখানে সেই পরিবারের গিন্নীর হাতে তৈরী সব্জীর ঝোল খাচ্ছেন—এই সংবাদটার সঙ্গে যদি আহার-রত অতিথির ছবিটি না ছাপিয়ে শুধু সংবাদটি দিলাম আর সেই সঙ্গে জহরলালের যে-কোন একটা ছবি সংযোগ করে দিলাম তবে তা আধুনিক সাংবাদিকতার পরীক্ষায় নম্বর পাবে অনেক কম।

আধুনিক সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন সাজাবার রীতি হওয়া দরকার অনেক উন্নত রুচির। এজন্যে সংবাদপত্রের কর্মিসংঘের মাঝে শিল্পীরও স্থান হয়ে পড়েছে অনিবার্য। ছবি এবং আক্ষরিক সজ্জায় বিজ্ঞাপনকে মনোহর করে তুলে ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হলো এখনকার কালের সংবাদপত্রের একটা অবশ্য করণীয় কাজ।

কাজেই দেখা যাচ্ছে বর্তমানে সংবাদ-জগতে একা সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতা নিয়েই আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। পূর্বে যাঁদের উল্লেখ করেছি তাঁদের সকলের সমগ্রতা নিয়েই এখন সংবাদপত্রের বৈশিষ্ট্য। এবং এই বৈশিষ্ট্যের উপরই তার বহুল প্রচার নির্ভর করছে।

বর্তমান সভ্যতার আসল রূপ শিল্প-বাণিজ্যে। নানা পণ্য-সম্ভারের সঙ্গে খবরের কাগজকেও পণ্যহিসাবে সকলের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করতে হলে যে ব্যবসা-বুদ্ধির দরকার তা বোধ হয় প্রথম দেখিয়েছিলেন বিলাতের লর্ড নর্থক্লিফ। তারপর বহুযুগ কেটে গেছে কিন্তু সেই আদর্শের সঙ্গে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তা নষ্ট হয়নি আজো। সেই আদর্শ অনুসরণে আমাদের

দেশেও যে কথঞ্চিৎ চেষ্টা হয়নি তা নয়। এদেশেও "হিন্দু" বা "অমৃতবাজার পত্রিকা"র ঐতিহ্যে পাই অমনি একটা আদর্শনিষ্ঠা।

একথা মনে রাখা দরকার যে, বিজ্ঞাপনই সংবাদপত্রের প্রাণে শক্তি সঞ্চার করে, তাকে দীর্ঘায়ু করে। প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রেরও প্রচার-সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না বা বিজ্ঞাপনের মারফৎ সমৃদ্ধি আসে না যদি না দেশ শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত হয়।

আজ আমেরিকার কোন সংবাদপত্রের প্রচার সংখ্যা আটের অঙ্কে পৌঁছেচে শুনলে আমরা অবাক হই। শুধু তাই নয়, একই খবরের কাগজের পূর্বাহ্নিক, মাধ্যাহ্নিক, আপরাহ্নিক সংস্করণের কথা শুনলেও আমরা তেমনি হতবাক হই। ভাবি, তাও কি সম্ভব? শিল্প-বাণিজ্যে সর্বাপেক্ষা অগ্রসর আমেরিকায় তাও সম্ভব হয়েছে।

অনুন্নত আমাদের এই দেশ সবে স্বাধীনতা লাভ করেছে। শিল্প-বাণিজ্যের অনন্ত সম্ভাবনার দিকে চেয়ে আমরাও ছুটে যেতে চাইছি। হয়তো আমাদেরও দিন আসবে একদিন যখন আমরাও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য অঞ্চল বা আমেরিকার ন্যায় তুল্যমূল্য আশা করতে পারি।

কিন্তু একথাটাও যেন ভুলে না যাই যে, অর্থকরী সফলতাই সংবাদপত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। মানুষের নীচ প্রকৃতির ক্ষুধার জোগান দিতে রুচিভ্রষ্ট হওয়াটা সংবাদপত্রের আদর্শ নয়। আমেরিকায় এই শ্রেণীর কাগজেরও অর্থাগম হয় প্রচুর। ব্যবসার পথ তাতে সুগম হতে পারে কিন্তু সভ্যতার মাপকাঠিতে নেমে যেতে হবে অনেক নীচে।

সংবাদপত্রের নিত্যকার খোরাক অনেক। আমাদের পরাধীন অবস্থায় এই খোরাক জোগাবার ব্যাপারেও আমরা ছিলাম পরনির্ভর। দেশ-বিদেশের খবর যে সব প্রতিষ্ঠান থেকে সরবরাহ করা হতো তাদের উপর একান্ত নির্ভর করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর ছিল না। বিদেশী খবর আমরা যা পেতাম তা আসতো 'রয়টার' মারফৎ আর দেশী খবর দিতেন 'এসোসিয়েটেড প্রেস'। প্রথমটি খাঁটি বিলাতী ওরফে সরকারী ছায়া-প্রতিষ্ঠান, অপরটি ছিল আধা সরকারী। বিলাতী খবর আমরা যা-কিছু

পেতাম তাতে ইংরেজ প্রভুদের প্রতি আমাদের ভয় ও ভক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু পেতাম বলে মনে হয় না। উপরন্তু এশিয়া মহাদেশে ভারতবর্ষ নামধেয় যে দেশটি আছে তার একটুখানি ক্ষীণ পরিচয় ইংরেজ যেমন পরিবেশন করতেন তা-ই পেতো ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা। আর ঘরে বসে 'এসোসিয়েটেড প্রেস' থেকে আমরা যা হাত পেতে নিতাম তা খাঁটি ভারতবর্ষীয় গয়লার দুধ। এই পরনির্ভরতার ফলে আমাদের যে চরম দুরবস্থা হতো তার প্রতিকার কল্পে সুভাষচন্দ্র লণ্ডনে 'ওরিয়েণ্ট প্রেস সার্ভিস' আর স্বদেশে 'ফ্রী প্রেস' নামে দুইটি সংবাদ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেছিলেন। বহু বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও এই দুই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা আমাদের তখন কিছুটা কাজ হয়েছিল। 'ফ্রী প্রেস' প্রতিষ্ঠার গোড়ার দিকে অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং মাদ্রাজের সদানন্দ সুভাষ চন্দ্রকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। পরে বিধু সেনগুপ্ত এসে যোগ দেন। উত্তরকালে এই 'ফ্রী প্রেস' 'ইউনাইটেড প্রেস' রূপে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং বিধু সেনগুপ্তই হন এর মুখ্য কর্ণধার।

আমাদের স্বাধীনতালাভের পর কিন্তু চেহারা গেছে বদলে। বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দেশীয় প্রতিষ্ঠানের যে নিরন্তর সংগ্রাম ছিল তাতে যতি পড়েছে। সারা পৃথিবীতে 'রয়টার'-এর যে একচেটিয়া ব্যবসা ছিল তাতে 'পি-টি-আই' অর্থাৎ প্রেস ট্রাষ্ট অফ ইণ্ডিয়ার যোগাযোগ সাধিত হওয়ায় আমরা এখন পরমুখাপেক্ষিতার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয়েছি। রুদ্ধদ্বার ভেঙে এখন আমরা বিশাল পৃথিবীর যে কোন স্থান থেকে সংবাদ আহরণে স্বাধীনতা পেয়েছি। বিভিন্ন দেশে আমাদের দূতাবাস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলেও সে সব নিহিতং গুহায়াম্ সেগুলিও উদ্ঘাটন করবার সুযোগ ও সুবিধা আমাদের হয়েছে, সুতরাং সংবাদ-জগতে আমাদের অগ্রগতির বাধা দূরীভূত হয়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি।

দৈনিক সংবাদপত্র ছাড়া আমাদের দেশে যে সব সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক পত্র আছে সেগুলিকে বলা যেতে পারে প্রধানত সাহিত্যপত্র। এই সাহিত্যপত্রের সঙ্গে সংবাদের সঙ্কলন থাকে সামান্যই, তবু থাকে।

আবার, সংবাদপত্রেও দেখি সাহিত্যের প্রভাব এসে পড়েছে আধুনিক কালে। সপ্তাহের একটি দিনে বা বিশেষ বিশেষ সংখ্যায় সংবাদপত্রকে জোগাতে হয় এখন সাহিত্যিক মনের খোরাক। সংবাদপত্রের বিবর্তনে আমরা এসে পড়েছি এখন এইখানে।

অতঃপর আসে সাংবাদিক বৃত্তির কথা। সাংবাদিকের কর্তব্য কঠিন, দায়িত্ব অপরিসীম। এই ব্রতধারীদের জীবন নির্বাধ ও স্বচ্ছন্দ হওয়া একান্ত প্রয়োজন নতুবা জাতীয় জীবনের সুষ্ঠু স্ফুরণ ব্যাহত হয়। আমাদের সাংবাদিকেরা কি সেই পর্যায়ে উঠতে পেরেছেন ?

বিবর্তনের গোড়ার দিকে সাংবাদিকদের অশেষ লাঞ্ছনা ও চরম স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অপ্রচুর নয়। কিন্তু দেশ তখন পরাধীন; আদর্শে নিষ্ঠা ও দুঃখভোগের প্রয়োজন ছিল তখন অন্য কারণে। বর্তমান স্বাধীন দেশে সেই সব অন্তরায় দূরীভূত হয়েছে। এখনো কি আমাদের সাংবাদিকদের কর্মক্ষেত্রে অনিশ্চিত জীবনযাত্রার বিড়ম্বনা আশা করবো? কর্মক্ষেত্রের পরিসর এখন অনেক বড়, ব্যাপকতর ক্ষেত্রে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করে সাংবাদিক এখন চায় তার স্বচ্ছন্দ গতি। এইদিকে আমাদের উন্নয়ন কতটা হয়েছে, কতদিকে আমাদের চিন্তার তরঙ্গ গিয়ে আঘাত করছে—এই সব বিষয় এখন তৌল করে দেখা দরকার।

পিছনের দিকে তাকালে যে চিত্র পাই তাতে আমাদের গৌরব করবার বিশেষ কিছু নেই, সাংবাদিকের জীবন তখন হতো পরের করুণায় পুষ্ট কিংবা রাজশক্তির কোপানলে দগ্ধ! সেই বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে সরে এসে আমরা এখন উঠেছি কতকটা উপরে যেখানে হিমশীতল বায়ুর কিছুটা স্পর্শ পাওয়া যায়। সোজা কথায় বলা যায়, সাংবাদিকের বৃত্তি গ্রহণে বর্তমানে দ্বিধা সঙ্কোচ কম, কারণ কর্মক্ষেত্রে এখন দায়িত্বের সঙ্গে স্থায়িত্বের উপরও বিশ্বাস হয়েছে দৃঢ়তর।

সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানে এখন কর্মচারীদের সঙ্ঘ আইনের দ্বারা বৈধ বলে স্বীকৃত, কাজেই কর্মীদের ঐক্যবন্ধন এখন দৃঢ়তর। ফলে সাংবাদিকদের অনেক সুযোগসুবিধা লাভের সম্ভাবনা হয়েছে এবং সাংবাদিকদের জীবন-

যাত্রার মান উন্নততর হওয়ায় সংবাদ-জগতে আজ আমরা পাই অনেককে যাঁরা শিক্ষিত, দক্ষ এবং আধুনিক যুগের রুচি ও দাবি সম্বন্ধে সচেতন।

বর্তমান সভ্যজগতে সংবাদপত্রের ক্ষমতা হয়েছে অপরিসীম। রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক সর্ববিধ বিধানে যদি আজ সংবাদপত্রের সহযোগিতা না থাকে তবে শৃঙ্খলা রক্ষা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। দেশের শাসক-শক্তিকেও তাই নত হতে হয়েছে আজ সংবাদপত্রের সংহত শক্তির কাছে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে একটা জাতির উত্থান-পতনের সঙ্গে সংবাদপত্রের সম্বন্ধ আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে অচ্ছেদ্য। ক্ষমতা যেমন বেড়েছে তেমনি ক্ষমতার অপপ্রয়োগের সম্ভাবনাও এখন প্রচুর। শুধু ব্যবসার দিকটা দেখতে গেলে নৈতিক আদর্শ হারাবার লোভ প্রবল হয়, সাংবাদিকের সংযমও বাঁধা পড়েছে আজকের দিনে ব্যবসায়ী পরিচালকের কাছে। এই উভয়ের আদর্শ-নিষ্ঠার যদি হয় সুষ্ঠু সংযোগ, উভয়ের সহযোগিতায় যদি থাকে শ্রেয়ের প্রতি সত্যিকার আকর্ষণ তবেই সংবাদপত্র হয়ে উঠবে একদিন মহতো মহীয়ান।

এই প্রসঙ্গে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রের সম্পাদক স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ না করে পারি না। ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক, সত্যে অচল-প্রতিষ্ঠ এই ব্যক্তিটি ছিলেন সাংবাদিকদের আদর্শস্থানীয়। কোনরূপ মিথ্যাচার বা অন্যায় তিনি জীবনে সহ্য করেন নি; দুর্বল, নিপীড়িতের তিনি ছিলেন পরম বন্ধু; অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর অকাট্য যুক্তিই ছিল তাঁর শাণিত অস্ত্র। দেশের সামাজিক কল্যাণকে যেমন তিনি উদ্ঘাটিত করে দেখাতেন তেমনি রাষ্ট্রিক অশুভ বুদ্ধি-প্রণোদিত অনাচারের প্রতিও তিনি হানতেন নির্মম কশাঘাত। সভ্যভাষণে তাঁর সাহসিকতা ছিল অদম্য, রাজশক্তি কুপিত হয়ে তাঁকে রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী করবার চেষ্টা করেও হার মেনেছিলেন তাঁর কাছে বারম্বার। যুক্তির সঙ্গে চিন্তাশীলতার অপরূপ সামঞ্জস্য তিনি যেমন দেখিয়েছেন তেমনটি সত্যিই বিরল। কিন্তু এর পেছনে তাঁর যে তপস্যা ছিল তার খোঁজ কয়জনে রাখতো? যাঁরা রামানন্দবাবুর একান্ত সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁরা জানতেন কী কঠোর পরিশ্রম তিনি করতেন, কতখানি সত্যনিষ্ঠা তাঁর ছিল সম্পাদকীয় কর্তব্য

পালনে। "বিবিধ প্রসঙ্গ"-এর বিবিধ বিষয়বস্তুর নির্বাচনে থাকতো তাঁর সজাগ মনের পরিচয়; উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ তুলে ভাষার মনোহারিত্ব সৃষ্টির চেষ্টা তাঁর ছিল না আদৌ; তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা পেতাম নির্ভুল পরিসংখ্যান—যা তাঁর যুক্তিকে করে তুলতো নিঃসংশয়।

কোন বিষয়বস্তুকে ধরে সে বিষয়ে মন্তব্য করতে হলে রামানন্দবাবু পা বাড়াতেন তাঁর নিজস্ব পথে। অপর সম্পাদকদের পায়ে-চলা পথে কখনো তিনি চলতে চাইতেন না। তিনি বলতেন একথা—অপরে এ-বিষয়টি যে-ভাবে দেখেছেন তার থেকে তাঁর দৃষ্টি-কোণ যদি স্বতন্ত্র না হলো তবে তাঁর বক্তব্যের আকর্ষণ কোথায়? অপরের দেওয়া যুক্তিকে এড়িয়ে যেতে তাই তাঁকে পড়তে হতো দেশ-বিদেশের বহু সাময়িকপত্র। সম্পাদকের দায়িত্ব চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য সাধন নয়; তার জন্য চাই কঠিন পরিশ্রম, কঠোর সাধনা। রামানন্দবাবু ছিলেন এ-সাধনায় সিদ্ধ। অথচ তাঁর ব্যবসা-বুদ্ধি কম ছিল বলে তো মানতে পারি না। একক এক ব্যক্তি একটি প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলে তাতে এনেছিলেন অর্থনৈতিক সাফল্য—এজন্যে কখনো কোথাও তিনি আত্মবিক্রয় করেন নি, অর্থাৎ আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা জেনেও নিজস্ব মত জলাঞ্জলি দেওয়ার দৈন্য তাঁর কখনো প্রকাশ পায়নি। তিনি ছিলেন চিরনির্ভীক। আদর্শ নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যবসাবুদ্ধির চমৎকার মিল দেখেছি আমরা রামানন্দবাবুর চরিত্রে।

এককের ক্ষেত্রে যে সত্যনিষ্ঠার প্রকাশ দেখেছি, বহুর ক্ষেত্রেও কি তা-ই প্রতিভাত হবে না একদিন?